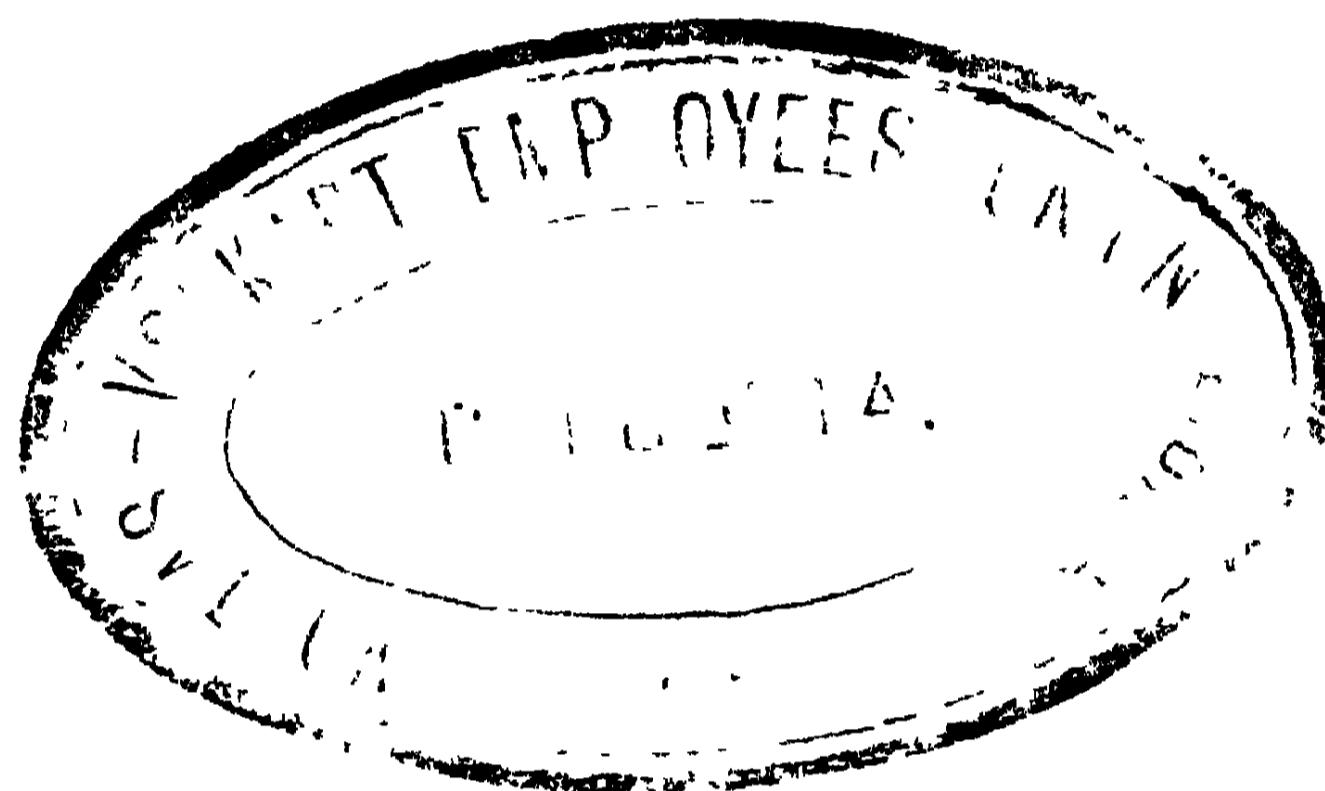


প্রোগ্রাম সম্পর্কে
গান্ধি-সংক্ষিপ্ত
১৯৭৮

GB8984



শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :

শ্রীভূবনমোহন মজুমদার, বি. এস. সি.
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট
কলিকাতা—৬

RR
টেল. ৪৪৩০৮
প্রেস/স্ল

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫—আষাঢ়

মূল্য : চারটাকা মাত্র

STATE CENTRAL LIBRARY: WEST BENGAL
ACCESSION NO... ৮৭৬-২৬৮
DATE. 28.8.০৬

প্রিষ্ঠার :

ডি. পি. সুব্রাহ্মণ্য

শ্রীক বঙ্গ লিমিটেড

১৭/১, বিজু পালিত সেন

কলিকাতা—৬

তাসের ঘৰ

বিহারের কোনো একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে সেবার অনেকগুলি পরিবারের আবিভাব ঘটেছিল। সকলেই বাঙালী এমন নয়, বেশি দামের বাড়ী ভাড়া নিয়ে দুই এক ঘর ভজ্জ হিন্দুস্থানী পরিবারও আশেপাশে এসে উঠেছিলেন। শহরটি ছোট, কিন্তু নাম ডাক আছে। এখানকার ইদারার জলে নাকি ধাতব পদ্মাৰ্থ অনেক বেশি, বিশেষ চূন আৱ লোহা, বাঙালীৰ অঞ্জে তঙ্গে এ দুটোৱ দৱকাৱ নাকি প্ৰচুৱ ! দ্বিতীয় কাৱণ হোলো, শহৱেৱ বাড়ীগুলো পৱন্পৱ বিচ্ছিন্ন এবং একটিৱ থেকে আৱ একটি অনেক দূৱে—মাৰ্বথানে মহণ প্ৰান্তৱ, দূৱে দূৱে পথগুলি আৰাবাঁকা। আৱো দূৱে বনময় উপত্যকা। বাতাসটি লঘু, স্বাস্থ্যকৱ এবং অগ্ৰি উদ্বেককাৰী। আসল কথা, অন্ন অজীৰ্ণ না থাকায় বাঙালীৰ কাছে এ অঞ্চল খুবই প্ৰিয়, এবং এখানকার নিৱিবিলি অবকাশ যথেষ্টই আৱামদায়ক।

শোন নদী এখান থেকে বেশি দূৱে নয়। পাটনা, কিউল, ভাগলপুৱ ইত্যাদি শহৱ থেকে প্ৰায়ই এদিকে বড় বড় বজৱা আসে; মহাদেওগঞ্জেৱ মন্দিৱ দৰ্শনে, শোনপুৱ মেলায় এই পথ দিয়ে 'ঘাতীৱা চলাচল কৱে। মাৰপথে হাটতলা, হনুমানপুৱ, দৱিয়াগঞ্জ প্ৰভৃতি নানা জায়গা আছে।

এই জলপথ দিয়েই কয়েকদিন পূৰ্বে চৌধুৱী সাহেব একধানা বড় দৱেৱ বজৱা ভাড়া ক'ৱে সন্তুষ্টি এসে এখানে একটি বাড়ীভাড়া নিয়েছিলেন। স্তুৰ স্বাস্থ্যও ভালো, শৱীৱও ভালো, কিন্তু মাৰে মাৰে মাৰাধৱাৱ ব্যারাম আছে। ডাক্তাৱ বলেন, নদীৱ খোলা বাতাস রোগীৱ পক্ষে খুবই স্বাস্থ্যকৱ হবে।

আভাৰতী প্ৰতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, কলকাতা ছেড়ে গেলে মাৰাধৱাৰও ছেড়ে যাবে। অত টাকা খৱচ ক'ৱে নোকা ভাড়া ক'ৱে কাজ নেই।

সে কথনো হয়, তুমি বলো কি ?—চৌধুৱী সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাৰাধৱ সঙ্গে সমস্ত দেহেৱ যোগ। মাৰাই ত সব। টাকা সামান্য, কিন্তু শৱীৱটা সামান্য নয়, আভা।

আভা বললে, এখানকার জঙ্গ হিও়াতেই সব সারতে পাৰতো। টেনে এলে এতো খৱচ মোটেই হোতোনা।

কথাটা সত্য, কিন্তু চৌধুরী সাহেব সেকথায় কান দেননি। স্তুর স্বাস্থ্যের সংবাদ স্তুর অপেক্ষা তিনিই বেশি জানেন, স্তুরা স্বামীর ব্যয় সঙ্কোচ করতে চায় নিজের অমূল্যবিধা সত্ত্বেও।

চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, তোমার মন প্রফুল্ল থাকার উপর আমার অমণের আনন্দ নির্ভর করছে। আমার অস্বস্তি তোমাকে বোঝাতে পারবোন আভা,—তোমার শরীর আর মন ভালো থাকাটাই হোলো আমার সব কাজের উৎসাহ।

তাদের ছোট বাড়ীটি মাঠের মাঝখানে হোলোও আশেপাশে প্রতিবেশীদের বাগানের সীমানা। পূর্বদিকে দূরে শোন নদী, স্বতরাং ভোর হ'তে ন হ'তেই রাঙা সূর্যের আলো এসে একেবারে শোবার ঘরের মধ্যে পড়ে অক্টোবরের প্রথম কিন্তু এরই মধ্যে মাঠে মাঠে শিশিরবিন্দু ঝলমল করে নদীর বালুচরের উপর প্রভাত সূর্যের দীপ্তি এখান থেকেই চোখে পড়ে। প্রাতঃভ্রমণ শেষ ক'রে স্বামী-স্তুর যথন ফিরে আসে, তখন আশেপাশে পল্লীবাসীরা জেগে ওঠে।

কলকাতা থেকে সেন পরিবাররা এসেছিল। কিন্তু বিদেশে এসেও ওরা কলকাতার অভ্যাসগুলো ভুলতে পারেনি! সকাল সক্ষ্যা বারান্দাতেই বৈঠক বসায়, অমণের কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে না। মেঘেরা অভ্যাস মতো ঘরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পুরুষদের ফাই ফরমাস থাটে, সেবাই করে,—কিন্তু শরীরের দিকে তাদের কোনো নজর নেই। স্বাস্থ্য ফেরাতে এসেও অভ্যাসের দাসত্ব করতে ওরা ভোলেনি। সেই রাত্রি আর বাসন মাজা, সেই সাবাদিন গৃহস্থালীর চক্রান্তে ঘুরপাক খাওয়া,—আনন্দ করবার কোনো অবকাশ নেই।

আভা বললে, কি করবে বলো, খাওয়া দাওয়া ত সঙ্গে সঙ্গেই থায়।

বায় জানি—চৌধুরী বললেন, কিন্তু কেন? কেন ওই ষোড়শ উপচারে ভোজনের আঘোজন। একথা জানা উচিঃ, বিদেশে আহারের ব্যবস্থা সরল হওয়া দরকার,—তোমাকে যদি ওই সব নিয়ে ব্যস্তই থাকতে হোলো, তোমার রিলিফ কোথায়? তোমার শরীরের উন্নতি হবে কেমন ক'রে? ছিছি, ওরা কী অত্যাচার করে বলো ত ওদের মেঘেদের উপর? নিজেরা স্ফুর্তি করে, তাস খেলে,—আর মেঘেরা থাটে ঝিয়ের মতন! ঘর থেকে

বেরিয়ে ঘরেই এসে চুকলো,—মেয়েদের ওপর কথখানি অবিচার হচ্ছে;
তুমই বলো ত আভা ?

চৌধুরী সাহেব একটু খুঁতখুঁতে সন্দেহ নেই। শ্রীর স্ববিধার জন্ম তিনি
আগেই তাঁর পাচককে ট্রেন ঘোগে পাঠিয়েছেন, হ'জন চাকর এসেছে তাঁর
সঙ্গে। এখানে এসে ফুলবাগান রক্ষা করার জন্ম তিনি এক স্থানীয় মালীকে
মোতায়েন রেখেছেন। আহাৰাদি আয়োজন ব্যাপারে আভাকে বিন্দুমাত্র
পরিষ্কার করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাতের কাছে তিনি
সমস্তই পান, অভিজ্ঞ পাচক আৱ চাকর কোনো ত্রুটি অথবা অভাব রাখেন।
এখানে এসে কেবল মৃগ-মৃগ, স্বচ্ছ জীবনধারা, নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ আৱ
আকে,—শ্রীর প্রতি এই হোলো প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। বাঙলা দেশের
মেঘে চিৰকাল স্বামীদের হাতে অনেক উৎপীড়ন সহ ক'রে এসেছে, অন্ততঃ
এই শরীর রক্ষার ব্যাপারে,—তার হাতে অন্ততঃ সে-সব লাঙ্ছনা আৱ না
ঘটে। এ সম্বন্ধে চৌধুরী সাহেবের যথেষ্ট আত্মপ্ৰসাদ ছিল। তিনি, আৱ
যাই হোক, নিৱানৰহ জন স্বামীৰ একজন নয়।

আচ্ছা, দেখেছ তুমি লক্ষ্য ক'রে—তিনি একদিন বললেন, ওই যে
চাটুয়ের শ্রী, কি রকম যা তা কাপড় প'রে রাস্তায় বেরোৱ। আমাৰ শ্রী
হ'লে আমি স্বইসাইড কৰতুম। আৱ চাটুয়েও তেমনি, বিন্দু মাত্র স্বৰূপ
বোধ নেই, সংশিক্ষা নেই,—যাকে বলে কিন্তু তকিমাকাৰ।

আভা হাসিমুখে বললে, তোমাৰ চোখ যদি কিছুতে এড়ায়! হংত
বেচাৰীদেৱ তেমন অবস্থা নেই?

নেই?—চৌধুরী সাহেব বললেন, সেকেও ক্লামে ওৱা এসেছে, তা জানো?
আমাৰ ওপৱ টেক্কা দিবো। চাটুয়ে ত টিন-টিন সিগাৱেট ওড়ায় দেখি।
শ্রীৰ জন্মে একখানা শাড়ী কিনতে পাৱেনা? কেবল কি চাটুয়ে,—ওই
স্থাদো না কল্কাতাৰ বিখ্যাত বোস পৰিবাৰ! বড় মেয়েটা হিল্টোলা
জুতোৱ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, আচ্ছা—দে না বাপু একজোড়া স্থানো
কিনে! এতই যদি বড় মানুষী, মেয়েৰ জন্মে আৱ দুটো টাকা থৰচ কৰতে
পাৱিসনে? ছেলে দুটোৱ ত একজোড়া হাফপ্যাণ্টও জোটেনা! বনেৰী
বংশ বললে কি হবে, নজৰ বড় ছোট।

স্বামীৰ মুখ থেকে অন্তেৱ প্রতি ক'রু যন্তব্য এবং সমালোচনা এইভাৱে
আভাকে শুনতেহ হয়। একথা যিথে নয়, তাৱা একটি স্থৰী পৱিবাৱ।

বাস্তবিক, অভাব তাদের কোথাও কিছু নেই। সঙ্গে তাদের একটা সামীক্ষা গ্রামফোন আছে। চৌধুরী সাহেবের নির্দেশ অশুষায়ী প্রত্যহ প্রভাতে চাকর সেটা বাজায়। ভজন অথবা কীর্তন গানের স্বরে আভার ঘূম ভাঙে। সকালে পাথীর কলকুজনে মাঠ ভ'রে ওঠে। মালী এসে ফুলদানীতে টাটকা সূর্যমুখী অথবা চন্দ্রমণিকা রেখে যায়। কয়েকটা গাছে গোলাপ ধরতে আর দেরী নেই।

কাছাকাছি কয়েকটি পরিবার থাকা সঙ্গেও চৌধুরী সাহেব এখানে এসে অবধি কারো সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন নি। সকলের সঙ্গে গলাপগলি করা তাঁর প্রকৃতি-বিকুন্দ। তাঁর মেলেনা, স্বতরাং দূরত্ব একটু রেখে উপায় কি? মহৎ আভিজ্ঞাত্য সব সে যদি না নেমে আসে তবে তাকে দোষ দেওয়া চলেনা, তার রীতিনীতিই আলাদা।

সেদিন উদের এই আলাপই চলছিল। ইঁটতে ইঁটতে অনেক দূর অবধি ওরা চলে এসেছে। সন্ধ্যা হ'তে আর বিলম্ব নেই, শোন নদীর জল রাঙ্গা হয়ে এসেছে। কয়েকটা মহাজনী নৌকার ছইয়ের মধ্যে ছোট ছোট কেরোসিনের ডিবেজলে উঠেছে। শরতের আকাশ দেখতে দেখতে ঝান হ'য়ে এলো। এদিকটা চৌধুরীর ভালো লাগে না। তাঁর বিবাহিত জীবনের চার বছরে স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালো লাগে। সন্তানাদি এখনো হয়নি। একটা বটগাছের নীচে নরম ও ঘন ঘাসের উপর দুজনে এসে বসলো। আজ অনেকটা পথ ইঁটা হয়েছে। যদি তাঁদের ফিরতে দেরী হয় তবে চাকর একটা টাঙ্গা এনে হাজির করবে, বলা আছে।

দিগন্ত বিস্তৃত নদীর ওপার থেকে শুল্পক্ষের চন্দ্র উপরে উঠে এসেছে। বাতাসটি লঘু, চোখে মুখে কেমন যেন নেশার রঙ বুলিয়ে চ'লে যায়। আজ আভাকে খুব ভালো লাগছে। নির্জন নদীর তীরে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিয়ে এলে স্ত্রীও যেন কেমন ঘোহিনীর বেশ ধরে। কাছে থাকলেও যেন তার সর্বাঙ্গে একটা স্বদূর রহস্যের ছায়া নেমে আসে, মাদক রসে মন টলমল করে।

আভা উচ্ছিক্ষিত না হ'লেও তার কোনো ক্ষতি ছিলনা। লেখা পড়ার ভালো ছাত্রী ব'লে তিনি আভাকে বিবাহ করেননি, করেছেন তাঁর ক্ষপ দেখে। বিলাতের ঘোহ তাঁর মনে ছিল, স্বাধীন স্বদূরীদের সম্পর্কে তাঁর

অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই তা —কিন্তু তাদের মোহ থেকে তিনি উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন কেবল মাত্র তার পরিচয়ে। আর যাই হোক, আভা তার জীবনে কোনো অভাব নাথেনি। বয়সকালের যে ঐশ্বর্যভাব ছিল আভার সর্বাঙ্গে, তার সম্পদ অপরিমেয়। অর্থচ তার চাঞ্চল্য নেই। ভাস্ত্রের নদী ভরো-ভরো, কিন্তু দুরস্ত শ্রোতে সে মাতিয়ে তোলেন,—কেমন একটি প্রশান্ত আবেদন ছিল তার চেহারায়। চৌধুরীর মন নিবিড় আনন্দে অবগাহন করতে।

আভা ?

আভা উত্তর দিল, কি গো ?

চৌধুরী একখানা হাতে স্ত্রীর গলা জড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এখান থেকে তুমি আর কোথায় যেতে চাও বলো।

আভা বললে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।

ইয়া, আমার এখনো অনেক দিন ছুটি। আরো প্রায় দেড় মাস তোমাকে নিয়ে বেড়াতে পারি। আমরা দিল্লী আগ্রা হয়ে রাজপুতানায় যুরে আসবো, কেমন ?

বেশ ত।

তুমি যে বলেছিলে, সব দেশের শাড়ী এক একখান কিনবে, মনে নেই ?

হাসি মুখে আভা বললে, পাগল আর কি, বলেছিলুম ব'লেই কি আর কিনবো ? অত খরচ ক'রে দরকার নেই।

না, না সে হবে না। তুমি কেবল আমার অস্তুবিধের কথাই ভাবো, আনন্দের কথা ভাব না।—চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, তুমি যদি জানতে তোমার নতুন নতুন সাজ-সজ্জায় আমার কত উল্লাস, তবে তুমি একথা বলতে না।

আভা তার উত্তরে কেবল তার কোমল একখানি হাতে স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর মধুর মৃদুকণ্ঠে বললে, শাড়ী না থাকলে তোমাকে বলতুম,—কিন্তু আমার অনেক আছে।

তুমি কি ভাবছো, আভা ?

ভাবছি আসবাব সময় তোমার ছোট বোন ছুটো পশমের গোলা চেয়েছিল, কিন্তু ভুলে দিয়ে আসতে পারিনি। ভারি লজ্জার কথা।

চৌধুরী উভেজিত হয়ে বললে, তার জগে কিছু লজ্জা নেই। তুমি
কেন দেবে? কেন তুমি বেপরোয়া হওয়াৎ করবে?

আভা বললে, সামান্য জিনিস ত!

না সামান্য নয়, আভা। তোমার যদি কখনো অভাব হয়, কেউ দেবে
না তোমাকে। তোমাকে দোহন করাই সকলের কাজ। ওরা সবাই
তোমার সৎব্যবহার আর যথুর স্বভাবের স্ববিধে নিয়ে তোমাকে শোষণ
করে। একটুও অন্তায় তুমি করোনি, কান্দকে কিছু দিয়ো না; মানুষকে
হাতে রাখতে যদি চাও তাহলে তার লোভের উপকরণ হাতের মধ্যে রেখে—
তবেই কাজ হবে। বরং দানের ভান ভালো, কিন্তু দান ক'রে ফতুর হওয়া
কাজের কথা নয়।

স্বামীর সঙ্গে তার চার বছরের পরিচয়, স্বতরাং এই অস্তুত যুক্তি শোনা
আভার পক্ষে নতুন নয়। সে চৃপ ক'রে রইলো।

কতক্ষণ উভয়ে নীরব। চাঁদের আলো নিবিড় হোলো, জ্যোৎস্না হোলো
ঘন। চৌধুরী তার নিজের কোলের উপর আভার মাথা টেনে নিলেন।
তারপর তার গায়ের উপর একখানা হাত রেখে বললেন, বিদেশে নির্জন
জায়গায় তোমাকে আনলে কী যে ভালো লাগে! তুমি শুয়ে আছ, এই
গাছের তলাটাই যেন আমার স্বর্গ। চাঁদের আলো পড়েছে তোমার
শরীরে, যেন ঝুক-কথার পরীর মতন মনে হচ্ছে। নিজের সৌভাগ্য দেখে
মনে হয়, বাস্তু দেশের আর সব স্বামীই দুর্ভাগ। আচ্ছা আভা—?

কি বলো?

তোমাকে কি আমি স্মর্থী করতে পেরেছি?

সুন্দর হাসি হেসে আভা বললে, এতদিন পরে এ কথা কি বলতে আছে?

চৌধুরী বললেন, আমাকে কি তুমি সত্যই ভালোবাসতে পেরেছ, আভা?

আভা কেবল তাঁর দেহালিঙ্গন ক'রে বললে, মুখে কি জানাতে আছে?

চৌধুরী সাহেব কেবল হেঁট হয়ে স্ত্রীর অধরে একটি চুম্বন করলেন।
আভা কেবল চোখ বুজে রইলো।

জ্যোৎস্নার আলোয় দূর থেকে একখানা টমটম আসতে দেখা গেল।
চাকরঁটা গাড়ী এনেছে সন্দেহ নেই। আভা তাড়াতাড়ি উঠে বসলো।
হাসিমুখে বললে, ইস, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এর পর তুমি চা খাবে
কখন?

চৌধুরী ক্ষেদোক্তি করে বললেন, চাকর বেটা সব মাটি ক'রে দিল।
এমন স্বন্দর রাত।

বাসায় যখন দুজনে ফিরলো তখন বেশ রাত হয়েছে। সন্ধ্যার দেওয়া
ধূপের গন্ধ তখনো ঘর থেকে সব মিলোয়নি। ঘরে আলো জ্বলছে। তাদের
ফিরতে দেখে চাকরটা গ্রামোফোনে একটি আশাবরী গানের রেকর্ড ধরে
দিল। পাচক চা তৈরী করতে গেল।

বিকালের ডাকে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না খোজ নেবার জন্য
চৌধুরী টেবিলের কাছে গিয়ে দাঢ়ালেন। না, চিঠিপত্র তাঁর নেই। কিন্তু
সহসা আর একটি চিঠির দিকে চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। এই
চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর আফিসের বড় সাহেবকে। কিন্তু চিঠিটি
ডাকে দেওয়া হয়নি দেখে ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে এলো। সাহেব
যাচ্ছেন টুরে, আজকে চিঠি ডাকে না দেবার জন্য যথাসময়ে এ চিঠি
সাহেবের হাতে আর পৌছবে না। সর্বনাশ!

তিনি উচ্চ কঠো ডাকলেন, রামবিরিজ ?

হজুর।—ব'লে চাকর এসে দাঢ়ালো।

শুয়োর, আজকের ডাকে এ চিঠি যায়নি কেন ?

মাইজী নেহি দিয়া, হজুর।

বোলাও মাইজীকো, হারামি কাহেকা।

মাইজীকে খবর দিয়ে রামবিরিজ গা ঢাকা দিল।

আভা এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, কি হোলো গো ?

চৌধুরীর মুখখানা তখন দপদপ করছিল। বললেন, এ চিঠি ডাকে
দেওয়া হয়নি কেন, আভা ?

ও মা, তাইতো, যা—ভুলে গেছি !

কিন্তু তোমার ভুল করার মানে জানো ? মিছে কথা ব'লে চলে
গেছেছি, সাহেবকে জানাচ্ছি খুব আমার অস্থথ,—সঙ্গে পাঠাচ্ছিলুম ডাঙ্গারের
সাটিফিকেট।

আভা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ভারি ভুল হয়ে গেছে !

তোমার এই ভুলের মানে হোলো এই, এখনকার বাসা উঠিয়ে
ত্রুদিনের মধ্যেই আমাদের চ'লে যেতে হবে। কত আশা ক'রে
এসেছিলুম !

আভা বললে, আমার শরীর ত এখন ভালই আছে। বেশ ত, চল ফিরে যাই।

কিন্তু তোমার ভুল আজ নৃতন নয়, আভা—চৌধুরী একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, সে'বার তোমার সামান্য ভুলের জন্য আমার কি ক্ষতি হয়েছিল, মনে পড়ে?

আভা মুখ তুলে বললে, ক্ষতি তোমার হয় নি, কিছু অস্থবিধা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু অস্থবিধাই বা হবে কেন তোমার জন্যে?

সংসার করতে গেলে ভুলচুক একটু-আধটু হয়েই থাকে। তোমার এ চিঠি যে বিশেষ দরকারী—কই, আমাকে ত সকালে বলনি?

বলিনি, সে আমার খুশি। তোমাকে সব কথাই বলতে আমি বাধ্য নই। চিঠি তোমাকে ফেলতে বলেছিলুম, এই ঘন্থেষ্ট। সেই কর্তব্য তুমি পালন করোনি, এই হোলো অভিযোগ।

আভা বললে, বাজে ধমক দিও না, চিঠি ফেলা হয়নি, এটা দৈবাং। তুমি নিজেই কোন্ চিঠি ফেলার ব্যবস্থা করলে?

চৌধুরী উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি নিজে? তুমি তবে আছ কি জন্যে?

আমি কি জন্যে আছি তা তুমি বেশ জানো। এ নিয়ে খোঁটা শুনিওনা।

আমার ক্ষতি হোক এই কি তুমি চাও?

আভাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, আমি কি চাই না চাই সে কথা শুনে লাভ নেই তোমার।

চৌধুরী বললেন, কেন লাভ নেই শুনি? তোমার মতলব কি? কী না করেছি তোমার জন্যে?

যা কিছু করেছ, নিজের জন্যই সব! নিজেকেই খুশী করবার জন্যে, নিজেরই স্বার্থের জন্যে। বেশী কথা ব'লোনা—থামো।

টেবিলটা চাপড়ে চৌধুরী চীৎকার ক'রে বললেন, এমন নির্ণজ মেঘে-মাহুষকে আমি বিয়ে করেছিলুম,—তুমি অতি নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক।

তুমি তার চেয়েও নীচ,—আভাও চেঁচিয়ে উঠলো—ভদ্রতা কাকে বলে তা তুমিও জাননা। সামান্য ভুলের জন্যে কোনো স্বামী এই ভাবে ঝগড়া করে না।

সামান্য তোমার কাছে, আমার কাছে নয়। আমার প্রতি তোমার ঘোর
উপেক্ষা, গভীর অশ্রদ্ধা।

আভা বললে, বেশ, এর বেশী শ্রদ্ধা আমার নেই। তুমি যা খুশী তাই
করতে পারো।

চৌধুরী পায়চারী করতে করতে বললেন, জানি তোমার এই স্পর্ধাকে
কেমন ক'রে শাসন করতে হয়!

আভা বললে, জব্ব করতে তুমি কম চেষ্টা করোনি। আমিও তোমার
সব চাতুরী জানি। তোমার কোনো তোষামোদে আমি ভুলিনে।

চৌধুরী বললেন, সাবধান আভা, সাবধান ব'লে দিচ্ছি!

ভয় দেখিয়োনা, যথেষ্ট সাবধানে আছি! চোখ-লাল করতে হয়, চাকরদের
কাছে করোগে।

তোমাকেও তাদের চেয়ে বড় ক'রে দেখিনে।—চৌধুরী চীৎকার করতে
করতে বললেন, পায়ের জুতোকে কখনো মাথায় তুলতে নেই। ঝপের অহঙ্কার,
কেমন? অমন ঝপ দ্রু'টাকা খরচ করলে কল্কাতায় কিনতে পাওয়া যায়।
ইতর মেয়ে মানুষ! পারিনে? খুব পারি। খুব পারি তোমাকে সাম্রেষ্টা
করতে। দয়া করতে নেই তোমাদের,—সাপকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

পাড়ার লোক কয়েকজন বাগানের ফটকের কাছে এসে জড়ে হয়েছিল।
জানালা দিয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেব বেরিয়ে এলেন। গলাবাজি
ক'রে তখনো তিনি খুব ইঁপাছিলেন।

গেটের কাছে এসে তিনি উভেজিত কর্ণে প্রশ্ন করলেন, কী চান
আপনারা?

একটি ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমরা পাশেই থাকি। বিদেশ
জায়গা, গলার আওয়াজ শুনে ভাবলুম, বুঝি কোনো বিপদ আপন ঘটেছে
আপনার এখানে। তাই ছুটে এলুম।

মিছে কথা আপনাদের!—চৌধুরী সাহেব চড়াও হয়ে বললেন, এটা
আপনাদের বাজালীপনা। স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তাই আপনারা
তামাসা দেখতে এসেছেন। আপনাদের লজ্জা করেনা? আপনারা না
ভদ্রলোক?

ভদ্রলোকেরা বিমৃঢ় স্তন্ত্রিত হয়ে বললেন, আচ্ছা, আমাদের ক্ষমা করুন।
আমরা যাচ্ছি।

যান, নিজেদের ঘর সামলানগে।—এই ব'লে ক্ষতপদে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে দেখলেন, আভা শ্রান্ত হয়ে বিছানায় আড় হয়ে পড়েছে। চৌধুরী বললেন, শালাদের দিয়েছি ঠাণ্ডা ক'রে,—অভস্তুর ইতর কোথাকার। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি ঝগড়া কববোনা, তবে কি তোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো?—ও কি, কি হোলো তোমার?

চৌধুরী স্ত্রীর কাছে গিয়ে হেঁট হলেন। আভা তখন চোখ বুজে চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে! তাড়াতাড়ি একটু জল এনে স্ত্রীর কপালে বুলিয়ে তিনি বললেন, মাথাটা বুঝি আবার ধরেছে, আভা?

আভা বললে, হ্যাঁ।

দেখলে ত, আমি জানি তোমার শরীর খারাপ। এই জগ্নেই ত ছুটি নিতে চাইছিলুম।—এই ব'লে একহাতে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে অন্ধ হাতে চৌধুরী সাহেব তাকে বাতাস করতে বসলেন।

ইংগ্রামের ফলা

শহুরতলীর রেলপথটি চ'লে গেছে পুলের উপর দিয়ে, তা'র নৌচেটা অবারিত রাজপথ। ট্রাম লাইন ধ'রে দক্ষিণ দিকে অনেকটা চ'লে যেতে হয়। তারপর বাঁ-হাতি একটি সরু পায়ে চলা গলি। সেই সঙ্গীর্ণ গলিটিতে দু'একটি তেলের আলো জলে, কিন্তু সেই আলোয় কোথাও কিছু ঠাহর করা যায় না। নগরের বিস্তার তখনও অতদূর অবধি পৌছয়নি।

সন্ধ্যার পর সমগ্র বস্তিপল্লীটি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।—একটা অস্পষ্ট চাপা জীবন, ছায়া ঢাকা আলোর রেখা, স্তুপুরুষের রহস্যময় গতিবিধি, অবাঙ্গনীয় বেকারদের গোয়েন্দাস্তুলভ গোপন-চারণা,—সবটা মিলিয়ে দেখতে গেলে কেমন যেন কঠরোধ হয়ে আসে। আশেপাশে এলোমেলো বিশৃঙ্খল একটা জনসমাজ,—সেটা ফেরিওলা, বিড়িওলা, পানওলা ইত্যাদি এদের নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে।

ট্রামগাড়ীটি যখন পেরিয়ে যায়, তারই চকিত আলোয় ওই গলিয়ে ভিতরকার একটুখানি অংশ পলকের জন্ত চোখে পড়ে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার আগে বিনু ওই ট্রামের আলোটা এড়াবার জন্ত একবারটি থমকে দাঢ়ায়। চোখছটি তার সংশয়-চকিত, সতর্ক। নিঃসাড় অরণ্য সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হ'লে হরিণী যেমন অরণ্যকোটির থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে,—বিনু তেমনি ক'রে এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। তাকে ট্রাম ধরতে হবে।

ঠিক এই সময়টিতে নিয়মিত সে ট্রামে উঠে,—প্রায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বলা যেতে পারে। বিনু গরীব, পরিচ্ছদে তা'র গরীবানা, চেহারায় চাকচিক্য কর্ম,—শাদামাটা, শ্বামবর্ণ। ঘোমটার নৌচে ললাটের সঙ্কিন্তলে এয়োতিরি সিঁহুর,—ঘাকে বলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। এত সাধারণ যে, তা'কে হারালে খুঁজে পাওয়া কঠিন, মনে ক'রে রাখার মতন তা'র মুখে একটি রেখাও নেই, মুখের কাটুনিতে স্থষ্টির কোন শিল্পকলা নেই।

তবু একটুখানি সন্দেহজনক বৈকি! বস্তির পাড়াটা ভালো নয়,—ওর ভিতর থেকে গা ঢাকা দিয়ে একা বিনু চট্ট ক'রে বেরিয়ে আসে,—এবং সে

একা, এবং সঙ্ক্ষ্যার পর,—এরপর খানিকটা পরিচয় আর না দিলেও চলে বৈকি ! বিহুকে একই সময় নিয়মিতভাবে বেরোতেই হয়, না বেরোলে তা’র নিজেরও চলেনা, তা’র ঘরও অচল ।

ট্রামের আগেই আসছে মোটর বাস । সেই ভালো, আজ সে মোটর বাসেই চড়বে । ঠিক সেই সময়ে কারখানার ওপাশ থেকে একটি ছোকরা ক্রৃত এসে পাশে দাঢ়ায়, চক্ষের পলকে এবং অলঙ্ক্ষে উভয়ের হাতে হাতে কি যেন একটা বিনিময় হয়ে যায়, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে বিহু বাস-এ উঠে পড়ে । ছোকরাটি পথ পেরিয়ে অন্তদিকে চলে যায় । এই আচরণটাও প্রায় নিয়মিত ।

বাস-এর সীটে ব’সে অভিনিবেশ সহকারে বিহু ঘোমটার ভিতর থেকে সমস্তটা লক্ষ্য করে । প্রত্যেকটি আরোহীর মুখ, ও তাদের প্রকৃতি । যদি কেউ তা’র দিকে তাকায় তখনই সে নিজের সঙ্কুচিত সশঙ্খ মুখ অন্তদিকে ফিরিয়ে নেয় । তা’র চেহারায় প্রসাধনে কোথাও দৃষ্টি আকর্ষণের মতো কিছু থাকলে সে ভয় পায় । পুরুষমাত্রকে, অর্থাৎ অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে সে সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে । বিহু কোথায় যায় বলা কঠিন, সঙ্ক্ষ্যার পর সে বাইরে আসে কেন, কেন সে একা, কেন বা নিয়মিত একটি ছোকরার সঙ্গে তা’র চক্ষের নিমেষে ঘোগাঘোগ ঘটে,—এগুলি বিচার করতে গেলে বিহুর চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত হওয়া স্বাভাবিক । তা ছাড়া তা’র মাথায় সিঁদুর, —এজন্ত তা’র দায়িত্বও কম নয় । বিশ্বয়ের কথা এই, কয়েকবার কয়েকটি ভ্রান্ত পথচারী ভুল ক’রে তা’র পিছু নিয়েছে, কিন্তু নিয়ে ঠকেছে ! অর্থাৎ তা’র গাঞ্জীর্যটা ঘেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তা’র নির্মোহ নিরাসক ও নিষ্পত্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা । হায়রান হয়েছে অনেকেই । মেঝেটা কেবল যে হৃদয়হীন তা নয়, যেনবোধশক্তিহীন ব’লে অনেকেই সন্দেহ ক’রে গেছে । পুরুষমাত্রকেই সে একসময় অকর্মণ্য ও নির্বোধ বানিয়ে তোলে ।

বিহু যখন ফিরে আসে, রাত তখন কম নয় । হঘত শেষ ট্রামেই তাকে ফিরতে হবে । একদিন হঠাতে বেলাদি তার পাশে এসে বসলেন । বললেন, ‘ওমা, বিহু যে ? এত রাঙ্গিরে ?

সহান্তে বিহু বললে, ফিরছি !

সিনেমা থেকে বুঝি ?

সিনেমা !—বিহু আবার হাসলো,—সিনেমা দেখার সময় পাইনে ।

বেলাদি বললেন, বিয়ে করলে কবে ?

এই সম্পত্তি !—বিহু যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ।

বিহুর হাতে ছিল একটা ঝোলা । বেলাদি সেদিকে চেয়ে বললেন, ওর মধ্যে কি ?

বিহু জবাব দিল, থাবার জিনিসপত্র.....তরী তরকারী.....

তোমার স্বামী ?

বিহু বললে, আমার কপাল !

কেন ?

তাকে দিয়ে কিছু হ্বার ঘো নেই ।

সহাপ্তে বেলাদি বললেন, খুব আল্সে, না খুব কাজে ব্যস্ত !

বিহু বললে, না । তিনি বাতে পঙ্গু ।

বেলাদি চুপ ক'রে গেলেন । ট্রাম এসে একটা মোড়ে থামলো । নেমে যাবার আগে বেলাদি ব'লে গেলেন, আহা, তোমার কথা শুনে ভারি দুঃখিত হলুম, বিহু ।

বিহু একপ্রকার রহস্যময় হাসিলো । কিন্তু বিহু বাঁচলো । কোন প্রশ্ন তা'র প্রিয় নয়, কেননা কোন উত্তর তা'র সত্য নয় । সে খুশী, যদি কেউ তাকে না চেনে, অথবা না দেখে । কোথাও কোনো কোতুহলী চোখ, বিহু অমনি আড়ষ্ট । কেউ তিন সেকেণ্ডের বেশী তা'র দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অমনি বিহুর উদ্বিগ্ন মন ভীরু শাবকের মতো শক্তাতুর হয়ে ওঠে । সে চায় ভীড়, জনতার প্রবাহ, অপরিচয়ের শূন্ততা,—কেননা তা'র মধ্যে আঘাতগোপন করা সহজ, সেখানে অসীম স্বত্ত্ব, নিরন্দেগ বিশ্রাম । দিনের বেলা তা'র কোনো অশান্তি নেই, কেননা দিবাভাগে সে বেরোয় না । গাড়ীতে ওঠে সে ভয়ে ভয়ে ; অনেক জানা অনেক চেনা মুখ । অনেক মুখে সে অস্পষ্ট পরিচয়ের স্মৃতি খুঁজে পায় । সেজন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে সে বাইরের অঙ্ককারের দিকে মুখ পেতে রাখে । এক সময় ঘোমটায় কোনমতে মুখ লুকিয়ে সে নেমে পড়ে । তারপর পলকের মধ্যে সেই সকল গলির ভিতর অদৃশ হয়ে যায় ।

আর একদিন বিহু হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেল । বিহু ছিল অন্তর্মনস্ত, ছিল অসতর্ক । তা'র ঠিক নাকের কাছে এসে দাঢ়ালো একটি উদ্রলোক । ভয়ে বিহু চমকে উঠেছিল আর কি,—প্রায় চেচিয়ে উঠেছিল । কিন্তু সে পলকের

জন্ম। আত্মীয় বলে চেনামাত্রই বিহু মাথার ঘোমটা ফেলে সোজা হয়ে দাঢ়ালো।

গিরীন বললে, তোকে দেখে ট্রাম থেকে নামলুম রে। প্রথমটা চিনতে পারিনি, কৈ বদলে গেছিস् !

বিহু হেসে উঠলো,—বদলেছি নাকি ?

গিরীন বললে, প্রায় বছর চারেক বাদে তোকে দেখলুম। এখানে দাঢ়িয়ে যে ?

বিহু বললে, বাস ধরবো।

গিরীন তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বিয়ে হয়নি দেখছি। খুব স্বাধীনতা, কেমন ?

সলজ্জমুখে বিহু বললে, বিয়ে হলেই কি পরাধীন হতুম ?

গিরীন বললে, তা বটে, তুই যে মেয়ে—বাগ মানায় কা'র সাধ্য !

বিহু হেসে উঠলো।—পরে বললে, তারপর ? তোমাদের খবর কি ? বড়মাসীমা ? বৌদিরা ?

গিরীন বললে, ওই মোটামুটি।—যাক, যে অবাধ্য ছিলি তুই...এবার দেখছি একটু শান্ত।

বিহু বললে, তোমাদের ঠিকানা কি, গিরীনদা ?

গিরীন ঠিকানা জানিয়ে বললে, একদিন আসিস আমাদের ওখানে। গল্প করা যাবে। একলা কেন ? এদিকে কোথায় এসেছিলি ?

বিহু মিছে কথা বললে। অনায়াসে অকৃষ্ণ অনর্গল মিথ্যা বললে, এই কাছাকাছি...মানে ঠনঠনের ওদিকে আমার এক বন্ধু থাকে—তার ওখানে গিয়েছিলুম—

গিরীন বললে, যাবি ত' আমাদের ওখানে ?

নিশ্চয়ই,—বিহু সহসা কঠিনে একটু আগ্রহ মিশিয়ে বললে, আচ্ছা গিরীনদা, তুমি ত' পুলিশের দারোগা, কত বড়লোক ! কিছু টাকা দাওনা আমাকে ?

টাকা ! টাকা কি হবে রে ?

বিহু জবাব দেয়, টাকায় যা হয়ে থাকে।

কত ?

বেশী না,—গোটা পঁচিশেক।

পঁচিশ ? আমি ভাবলুম দু'শো চারশো । দাঢ়া দেখি,—এই ব'লে গিরীন
পকেট থেকে মণিব্যাগ বা'র ক'রে পঁচিশ টাকা মিলিয়ে বিহুর হাতে দেয় ।

বিহুর হাত কাপে না, ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে না । কিন্তু টাকা পাবার পর আর
সে দাঢ়াতে চাইলো না । সে একটু অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলো ।
কে যেন দূরের থেকে ভাইবোন দুজনকে লক্ষ্য করছে,—মনে হলো লোকটি
যেন রাস্তার ওপারে থমকে দাঢ়ালো । বিহুর গলার আওয়াজ কেপে উঠলো ।

ওকে চেনো তুমি, গিরীনদা ?...ওই যে লোকটা...চেয়ে আছে আমাদের
দিকে ?

গিরীন জবাব দেয়, কই না ? তয় পাস কেন তুই ?

লোকটা ভারি অভদ্র । আচ্ছা, আমি চললুম, ভাই । বিহু তৎক্ষণাৎ
পিছন ফিরে হন্হন্হ ক'রে ইঠিতে থাকে । অভদ্র ব্যক্তিকে এক মিনিটও সে
বরদাস্ত করতে পারে না ।

কেমন একটা অসামাজিক অস্বাভাবিক দ্রুততা বিহুর পদক্ষেপে ।—গিরীন
যেন অনুভব করে, এতদিন পরে মাসতুতো ভগিকে দেখে নিজে সে উচ্ছ্বসিত
হয়ে উঠলেও বিহুর দিক থেকে কোনো আন্তরিকতা দেখা গেল না । বিহুকে
দুর্বোধ্য মনে হোলো,—মনে হোলো দুন্তর ব্যবধানের ওপারে এতক্ষণ সে
দাঢ়িয়েছিল । বিহু হঠাৎ টাকা চেয়ে মিল, এটা যেন কেমন অভিনব
প্রতারণা, কেননা তা'র ভাবভঙ্গী আর চলাফেরা নিশ্চিত সন্দেহজনক ।
বিহুর আচরণে নিজের মনে তা'র মানি জমে ওঠে,—একটা বিসদৃশ অনুভূতি ।
বিহুর ঠিকানা কি, কিভাবে তা'রা থাকে, বর্তমানে তাদের অবস্থা কি প্রকার,
—এসব কিছুই জানবার স্বয়েগ গিরীন পেলো না ।

মূঢ়ের মতো সে দাঢ়িয়ে রইলো ! বিহু তখন অদৃশ ।

তুতিনটে গলি ঘুরে বিহু আবার বড় রাস্তায় এসে দাঢ়ায় । একখানা
দোতলা বাস্ গর্জন ক'রে এগিয়ে আসে, বিহু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে । বাস্
ছেড়ে দেয়,—মাত্র কিছু দূর ছোটে,—এমন সময় অস্পষ্ট লক্ষ্য করে, সেই
লোকটি, সেই পথে-দাঢ়ানো ছায়ামূর্তিটি বাসে ওঠে, এবং বিহুর সামনে দিয়ে
আগের সিট-এ গিয়ে বসে । বিহু কেপে ওঠে, চমকে ওঠে, এবং তা'র
উপস্থিত বুদ্ধির দুরন্ত তাড়নায় এক সময় নিঃশব্দে উঠে ছায়াঙ্ককারে বাস্
থেকে নেমে যায় ! বুঝতে পারে লোকটা তা'কে লক্ষ্য করেনি । অতি
বুদ্ধিমানকে হঠাৎ প্রতারিত করা বিহুর পক্ষে খুব কঠিন নয় ।

বড় রাস্তায় তখন একটা জন প্রবাহ দেখা যায়, কোথায় যেন একটা মন্ত্ৰ-
রাজনীতিক সভা ভেঙেছে। বিহু স্বত্ত্বোধ করে। অহিংস জনপ্রবাহ
ত্যাগ ও সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত,—বিহু আনন্দিত হয়ে উঠে। সে লক্ষ্য করে
মুখে চোখে হিংসা নেই, কেউ অসংযত নয়, কেউ দুরভিসংজ্ঞি পোষণ করে
না। বিহু ভৌড়ের ভিতর দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হেঁটে চলে যায়।

অনেক দোকান পথের দুইধারে। প্রত্যেক দোকানে বিহুর দরকার।
কিন্তু কোনো দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে বিহু সেখানকার আলোটা
বাঁচাবার চেষ্টা করে। রাত্রির অঙ্ককারে যত আলোই থাক, তা'র একটি
নিজস্ব ছায়াবরণ আছে। বিহুর পক্ষে সেই শুবিধাটুকু কম নয়। সে
যথাসম্ভব কাছে এগিয়ে আসে, এবং আলো বাঁচিয়ে ঘোমটা একটু টেনে
জিনিসপত্র কেনে। দাড়ি কামাবার সাজ সরঞ্জাম, গায়ে মাথা সাবান আৱ
তেল, খানচুই চামচে, এক টিন বিস্কুট, এক প্যাকেট চা, হয়ত বা কিনলো
এক কোটা মাথন। তার টাকা খরচের পক্ষতি আৱ সওদা কেনার ভঙ্গী
লক্ষ্য কৱলেই বুঝতে পারা যায়, তা'র গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা কিছু নেই, স্থায়ী
কোনো ব্যবস্থায় তা'র বিশ্বাস নেই, নিজের ব্যবস্থাপনায় নিজেই সে নির্ভর-
শীল নয়। কোনো জিনিসের দাম সে যাচাই করে না, ভালোমন্দ বিচার
তা'র নেই,—জিনিসটি তা'র বোলার মধ্যে নিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত।
কোনো প্রকারে কাজ সেৱে তা'কে চলে যেতে হ'বে।

এক দোকান থেকে আৱ এক দোকানে। সেখানে একটু অঙ্ককার।
বিহু নিশ্চিন্ত হয়। কি যেন তা'কে কিনতে হবে। সহসা পিছন ফিরে সে
তাকায়,—কোনু লোকটাকে ঘোমটাৰ আড়ালে তৌক্ষ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য
করে। হঠাৎ সে দোকানের সামনে থেকে স'রে যায়। আৱ কোন সওদাৰ
প্ৰয়োজন নেই। ক্রত ব্যন্ত হয়ে সে ছোটে। দোকানী অবাক হয়ে থাকে।

পৰদিন এ অঞ্চলে আৱ সে আসে না। অন্ত কোথাও, সম্পূৰ্ণ অপৱিচিত
পাড়ায়, অজ্ঞানা জনতাৰ মাৰ্বথানে। পদে পদে সংশয়, পদে পদে সে যেন
পথের কাঁটা এড়িয়ে চলে। নিজেকে সে বিশ্বাস কৱে না, বিশ্বাস কৱে না।
কোনো লোককে, ফিরে তাকায় না কোনো দিকে। অতি সন্তর্পণে, অতিশয়
সংশয়ের সঙ্গে পথ পেরিয়ে সে চ'লে যায়। ফিরতি পথে টামে উঠে, তখন
ৱাত কম নয়। তা হোক, রাত তা'র প্ৰিয়, অঙ্ককার প্ৰিয়তৰ। অঙ্ককারে
তাৰ চোখ খোলে।

টালীগঞ্জে যেখানে নামবাব কথা, সেখানে পৌছবাব আগেই সে এক জায়গায় নেমে পড়ে। একটু পাশ কাটিয়ে গা বাঁচিয়ে একজায়গায় চুপ করে সে দাঢ়ায়। ইংসা, ভুল হয়নি তা'র সেই লোকটা নিশাচরের মতো দাঢ়িয়ে রয়েছে ওই বিড়ির দোকানের পাশে। বিশু দুদিন ওকে লক্ষ্য করেছে। লোকটাৰ মতলব ভালো নয়। ওকে এড়িয়ে যাওয়া চাই, ওৱা সামনে দিয়ে বিশুৰ আৱ কোনোদিন গলিৰ মধ্যে চোকা চলবে না। অনেকে অনেকবাব বিশুৰ পিছু নিয়েছে, অনেকবাব বিশু অনেকেৰ চোখে ধুলো দিয়েছে। তা'র সমগ্ৰ বৰ্তমান জীবনযাত্রাটা অখণ্ড প্ৰতাৱণাৰ উপৰ দাঢ়িয়ে।

বিশু চক্ষেৰ নিমেষে ঢুকলো। এক বস্তিৰ থানা পথ দিয়ে। পাশে কি একটা ছোট কাৱখানা, ভিতৱে তখনও কলৱ চলছে। বিশু কিছুদূৰ গেল, একবাব পিছন ফিৱে ঘন অঙ্ককাৰে সে তাকালো। না, কেউ কোথাও নেই, কেউ তাকে দেখেনি, কেউ তাকে অনুসৱণ কৱেনি। বিশু স্বত্তিৰ নিশ্চাস ফেলে তা'র পৱিচিত চোৱা গলি পথ ধ'ৱে চললো। আজকেৰ মতো তা'র আৱ কোনো দুৰ্ভাৱনা নেই। সে বাঁচলো, বাঁ হাতে আঁচল তুলে অত ঠাণ্ডাতেও সে কপালেৰ ঘাম মুছলো।

নিজেৰ বাসায় বাৱান্দায় এসে বিশু একবাব দাঢ়ালো। আলো নেই কোথাও, সাড়া নেই কোনোদিকে,—ভিতৱটা নিঃসাড়, প্ৰেতপুৱীৰ মতো।

ঠিক সেই মুহূৰ্তে প্ৰেতেৰ মতোই একজন পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো—
সে সেই ছোকৱা যে নিয়মিত সন্ধ্যাৰ পৱে আসে।

পলকেৰ জন্তু ছেলেটি এসে তা'র পাশে দাঢ়ায়,—কি যেন বিনিময় কৱে।
চাপা কঠে ছোকৱা বললে, আজ টাকা যোগাড় কৱতে পাৱিনি।

নতু অস্পষ্ট কঠে বিশু বলে, থাক টাকা পেয়েছি, তুমি যাও। সাত দিন
পৱে আবাৱ দিয়ো। সাবধান...

ছোকৱা নিঃশব্দে অঙ্ককাৰে মিলিয়ে যায়।

বিশু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'ৱে দাঢ়িয়ে থাকে। নিকটে দূৰে মাছুৰেৰ কোনো
সাড়া নেই। সকল গলিৰ সেই মিটমিটে তেলেৰ আলো এতদূৰে এসে
পৌছয় না। এবাৱ সে নিশ্চিন্ত হয়ে ভিতৱে চুক্তে পাৱে। আন্দাজে এগিয়ে
এসে বিশু বক্ষ দৱজাৱ উপৰ ছইটি আঙুল দিয়ে একটি সাক্ষেতিক আওয়াজ
কৱে। তখনই দৱজা খুলে যায়।

কে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল সেটা জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাহিরের মত ভিতরটাও অঙ্ককার। বিশু ভিতরে ঢুকে পুনরায় দরজা বন্ধ ক'রে দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন কাছাকাছি কোথাও আছে, কিন্তু তা'র জন্ম বিশুর কোনো উদ্বেগ নেই। বিশু ঠিক জানে সেই অঙ্ককার ঘরে কোথায় কি আছে,—অঙ্কের নিভূল হিসাবের মতো সমস্তটাই তা'র জানা। সমস্তই নথনপর্ণে। বিশু দেশলাই নিয়ে আলো জাললো।

এ বাসাটা অস্তুত। এর সঙ্গে তা'র মনের কোনো ধোগ নেই ব'লেই এটা বিস্ময়কর। এখানে আছে সে মাসতিনেক, কিন্তু কোনো মোহবন্ধন কোথাও নেই। গৃহস্থালীর চিঙ এখানে খুঁজে পাওয়া কঠিন, গৃহসজ্জার উপকরণ সম্পূর্ণ নিরন্দেশ,—অথচ এখানে থাকতেই হয়, না থাকলেই তা'র চলবেন।

মৃছ আলোটায় দেখা গেল, বিশুর অধরের কোণে হাসির ঈষৎ আভাস। বেলাদ্বিরা জানে সে বিবাহিত, তার স্বামী বাতে পঙ্ক, সে নিজের হাতে বাজার-হাট করে। ওদিকে আঙ্গুয়স্তজন যার, তা'র আবাল্য ইতিহাস জানে, তাদের কাছে অবিবাহিত সে নিশ্চয়ই। এ এক ভয়ানক খেলা, জীবনের ভীষণতর বিপ্লব, নিজের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি। নিজেকে সে কোনো প্রশ্ন করবে না, নিজের কাছে জবাবও সে দেবে না কিন্তু এ ব্যবস্থা তাকে মেনে নিতে হবেই। সে বিবাহিত এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে, একথা প্রকাশ করতে সে বাধ্য ; অপরদিকে, সে অবিবাহিত অঙ্কুষ-কৌমার্দ—এটা অপ্রকাশিত রাখাও তা'র চলবেন। এই বিপ্লব তা'র জীবনের উপর দিয়ে চলেছে প্রতিদিন। অঙ্ককারে, সুড়ঙ্গে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, মাটির নীচে, সমাজ জীবন থেকে পালিয়ে,—এই সর্বনাশ বিপ্লববুদ্ধিকে সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু চিন্তানি কি আছে তা'র কোথাও ! কেরোসিনের মৃছ আলোয় তা'র প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখখানা লক্ষ্য করলে বিদ্যুমাত্র সংশয় থাকে না যে, সে আনন্দিত। স্বথের আর তৃপ্তির অবধি নেই তা'র মুখে, নালিশের রেখামাত্র নেই সেই মুখখানিতে। সিঁথির ভিতর থেকে এয়োতির চিঙ্গুকু সামান্য দেখা যায়—কিন্তু কেশরাশির অরণ্যপথে সেটাকু যেন অগ্নিশিখা,—যেন অরণ্যের ভিতরকার হোমাশি আভা,—পবিত্রতা এবং আদর্শবাদে উজ্জ্বলস্ত। আশ্চর্য, ওকে সমগ্রভাবে দেখলে শুন্ধাই জাগে।

আলোটার দিকে চেয়ে এক সময় বিহুর আয়ত দীর্ঘ চোখে তঙ্গা নেমে আসে। বাইরের দরজাটা বন্ধ, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, নিশ্চিন্ত তঙ্গাটা ঘূর্জিহীন নয়।

কিন্তু তবু আচমকা সে জেগে ওঠে। অঙ্ককারে এদিক ওদিক তাকায়, কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করে। না, কেউ নয়, কিছু নয়, হেমন্ত বাতাসের ঈষৎ আবেগে জানালাটা একটু ন'ড়ে ওঠে মাত্র। বিহু উঠে যায় রাঙ্গাঘরের দিকে।

কিম্বৎক্ষণ পরে সে ফিরে আসে। হাতে তা'র খাবারের থালা—সকল বেলাকার রাঙ্গাকরা ঠাণ্ডা ভাত আর তরকারী। পাশের ঘরটির দরজার কাছে এসে পর্দাটা একটু সরায়। ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ আলোহীন, বাহিরের দিকে জানালা সংক্ষেপে বন্ধ,—কিন্তু ওই অঙ্ককারেই পুরুষের অবিশ্রান্ত পদচারণার শব্দটুকু পাওয়া যায়। ভিতরে পুরুষ, নিশাসপ্রশ্নাস পুরুষের—যাকে বিহু ব'লে এসেছে স্বামী, বেলাদিনা যাকে জানে, বাতে পঙ্ক, সকল কাজে অকর্মণ্য।

বিহু পলকের জন্য পর্দাটা সরিয়ে ঢাঢ়ালো। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, এই সঙ্গেতটুকুই যথেষ্ট,—গলার সাড়া দেবার প্রয়োজন নেই। ডেকে নেবার, কাছে যাবার, ভিতরে ঢোকার, অথবা অনুরোধ জানাবার কোন চেষ্টাই উভয়পক্ষ থেকে দেখা যায় না। উভয় পক্ষেরই যেন কঠিন অত, এবং কঠিনতর তপস্তা। এটা সংযম, এটা কুচ্ছসাধনা—বিহু জানে! এটা সহজ ক'রে নিতে হয়েছে, মেনে নিতে হয়েছে, স্বামীস্ত্রীর সর্ববাদীসম্মত সম্পর্ক তুলতে হয়েছে,—এও বিহু জানে। একজন আরেকজনকে চোখে দেখবেনা, ভক্ষণ করবেনা,—কৌ আনন্দ এই সংযমে, কী নিষ্ঠা এই তপস্তায়।

বিহু সহান্ত পরিত্থির সঙ্গে ভাতের থালা আর জলের ঘটা দরজার চৌকাঠের পাশে সংক্ষেপে দেখে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এই পর্যন্ত তা'র প্রত্যহের বিধিবন্ধ কর্মধারা। ঘড়ির কাঁটার মতো, নিয়মের নিখুঁৎ ব্যবস্থার মতো,—এইটুকু, এর বেশী নয়, কম নয়। এরপর এদিককার বারান্দায় এসে বিহুর শোবার ব্যবস্থা। একটি পুরনো মাতুর, এক টুকরো চট্ট, এবং বালিশের নামে কাপড়ের পুঁটলী। কোনো অভিযান তা'র নেই, এই তা'র স্থথশ্যয়া,—এটি তা'র তীর্থ। এই ছিম শৰ্ষায় শুয়ে বৈকুঠলোকের স্থপ দেখা, চোখের কোণে অঞ্চ নিয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা

করা। প্রত্যহ রাত্রির কী বিচিত্র উদ্বেগ, কী মিশ্রিত অস্তুতি,—বিহু হয়ে না জন্মালে সেটি বুঝতে পারা যায় না। সে যেন এখানে সতর্ক জাগ্রত প্রহরী,—ঘরে রইলো পুরুষ, তা'র দরজা অর্গল বঙ্ক, বাইরে রইলো নারী অবারিত অবকাশের মধ্যে। বিচিত্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আনন্দ এই একাকিনী শয়ে থাকায়, এই নিরন্তর মঙ্গল কামনায়,—অসীম তৃপ্তি বিহুর আধ্যাত্মিক হাস্তমুখে। ঘরের মন্দিরে দেবাদিদেব প্রতিষ্ঠিত, বাইরে সেবারতা তা'র নিত্য পূজারিণী। স্বামী,—কিন্তু স্বামীর চেয়েও বড়, মানুষের চেয়েও বড়,—বিহু নিজে অতি তুচ্ছ তা'র কাছে।

তোর বেলায় উঠে বিহুর কাজের আর শেষ নেই। ঘর দোর পরিষ্কার করা, থালা বাসন মাজা, ঘটি আর বালতির আওয়াজ, রান্নাবান্নার আয়োজন করা। তাকে কুঁটনো কুঁটতে হবে, বাটনা বাটতে হবে, স্বানের জল ধ'রে রাখতে হবে। কী লক্ষ্মী মেয়ে সে, পরিশ্রমে তা'র কী আনন্দ ! একা সে করবে সব, কোনো সাহায্য নেই কোনোদিক থেকে। দিনের বেলায় দেখা যায় বাড়ীটির আশে-পাশে জঙ্গল, উপরতলায় থাকে বুড়োবুড়ি,— এবং তাদের কঞ্চা বিধবা প্রোঢ়া মেয়ে। নৌচের তলার সঙ্গে তাদের সংযোগ কিছু নেই। ভাঙা পাঁচিলের পাশে একটা মাঠকোটার বস্তি— এবাড়ীর ছান্দে ওদিক থেকে সহজেই লোক উঠে আসতে পারে। এবাড়ীর খিড়কী দরজা খুললে একটা অগম্য ঝোপ,—তা'র পাশে অঙ্ককার এক ডোবা। এপাড়াটা দিনের বেলাতেও নিরিবিলি। এমন নিঃসঙ্গ এবং সমাজচুত্য ছোট্ট বাসাটি পেয়ে বিহু মহা খুশি।

সকালের দিককার প্রথম চোটের কাজকর্ম সেরে স্বানের পর সে উঠে আসে—বিতীয় ঘরখানায় চুকে দরজাটা বঙ্ক ক'রে দেয়। এতক্ষণ পরে অন্তপক্ষের পালা। স্বামী নামে ফে-ব্যক্তি পরিচিত, সে এবার বাইরে বেরোয়। বিহু ঘরের ভিতর থেকে সাড়াশব্দে বুঝতে পারে, সে ব্যক্তি স্বান করে, কাপড় ক'চে, দাঢ়ি কামায়,—তারপর রান্নাঘরে চুকে যৎকিঞ্চিত জলযোগ সেরে নেয়। এই নিয়মে উভয়ে চলে, এইটিই বিধি—একে লজ্জন করা সম্ভব নয়। ঘটাখানেক পরে সে-ব্যক্তি আবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিহু কৌতুক বেধ করে।

কচিং কোনোদিন উপরতলা থেকে বাড়ীর গৃহিণী বৃক্ষ সাড়া নেন। গলা বাড়িয়ে ডাকেন, বৌমা ?

সিঁথিতে সিঁচুর দিয়ে এক পিঠ চুল এলিয়ে বিহু হাসিমুখে গিয়ে দাঢ়ায়।
উপরদিকে মুখ তুলে উত্তর দেয়, কি বলছেন বড়মা?

দুদিন তোমাদের কোনো সাড়া পাইনি, মা। খবর ভালো ত?

আজ্জে ইয়া—

তোমার স্বামী কি উঠতে পারে একটু?

ওই সামান্য—

বাতের ব্যামো কিনা। আহা বাছারে! জ্বর কি রোজই আসে?

বিহু জবাব দেয় প্রায়ই।

গৃহিণী একটু হেসে থেমে প্রশ্ন করেন, তোমাদের বাজার হাট আনা
নেওয়া কে করেন মা?

বিহু বলে, আমার একটি মাসতুতো ভাই আসে সন্ধ্যের পর—সেই এটা
ওটা এনে দেয়। তার ত' দিনের বেলায় ছুটি নেই.....চাকরি করে
কিনা—

ও, তা'ত হবেই। আমাদের আবার সন্ধ্যে থেকেই সব সারা হয় কিনা,
তাই টের পাইনে।—আচ্ছা বৌমা, তোমাদের জিনিসপত্র, খাট আলমারী
এসব কবে এসে পৌছবে বল দেখি?

বিহু ভৱিত কর্তৃ উত্তর করে, বাবা রয়েছেন ঘফঃস্বলে কিনা...তিনি না
ফিরলে জিনিসপত্র পূর্ণান্বেশ সন্তুষ্ট হচ্ছেন। এটা আবার আদায় তশ্শুলের
সময়.....

গৃহিণী বলেন, তা' আমার বাড়ী তোমাদের পছন্দ হয়েছে ত? উঠে
যাবে না শিগ্গির?

আজ্জে না....সে কি কথা! ঘরদোর আমাদের খুব পছন্দ...বেশ বাড়ী!

গৃহিণী অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে উপরের জানলা থেকে সরে যান। বিহু
ফিরে এসে ইফ ফেলে যেন বাঁচে। সিঁথির সিঁচুরটি তা'র থেকে যায়,
কিন্তু ধাকে না,—সেটা স্ববিধার কথা, প্রয়োজনের কথা। সন্ধ্যার পর
নিজের ছাঁচটা সে বদলায়, অঙ্ককার হয়ে গেলে ভিন্ন পরিচ্ছদে সে প্রকাশ।
সমস্তদিন গৃহস্থালী, সমস্ত দিনের বধু—উৎকর্ণ, সতর্ক, সশঙ্খ, অথচ লক্ষ্মীস্বরূপণী।
কিন্তু সন্ধ্যার হিমেল জ্যোৎস্নায় তাকে চেনা কঠিন,—সে যেন অভিসারিকা।
ঘন অঙ্ককার ঝোপ আৱ ডোবাৱ ধাৱ দিয়ে সাপেৱ-ভয়কে তুচ্ছ ক'ৰে সে
বেৱোয় নগৱেৱ লোক-যাত্রাৱ দিকে। আচৱণে বধুত্ব নেই,—পদক্ষেপে

নেই জড়তা, ভয়ের চিহ্ন নেই দুই চোখে, উদ্বেগ নেই মনে বিদ্যুমাত্র। বিশু পরোয়া করে না কিছু, অকারণে তাকায়না কোনোদিকে,—কেমন যেন নির্দয় স্নেহহীন কাঠিন্তে তা'র মুখখানা গম্ভীর।

কৌজ্যোৎস্না সেদিন রাত্রে। প্রথম শীতের মধুর স্মিন্দতা মাথানো সেই জ্যোৎস্নায়। এমন নিবিড়, এমন সুস্পষ্ট যে, নিজেকে সেই আলোয় প্রকাশ করতে বিশুর ভয় করে। শহরতলীর এদিকে জ্যোৎস্নারাত্রে পাখী ডেকে যায় আকাশ পথে। অনেক দূরের কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসে গানের মৃদু রেশ। বিশু বাসায় ফিরে নাঁচের বারান্দায় চুপ করে শুয়ে থাকে। কাপড়ের পুঁটিলিটি তা'র মাথার তলায়।

শয়া নেই, সজ্জা নেই,—ঘর দুখানা রিত্ত, নিঃস্ব। অবস্থার এই দারিদ্র্য। বুঝতে পারা কঠিন, কেননা দুর্বোধ্য তাদের জীবন, এবং দিন ধাপন। ওরা দুজনে একদিন এখানে এসেছিল শুধু হাতে,—অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন, ওদের না ছিল ঘটিবাটি, না কড়াখুন্তি। ওরা রাঁধতো না, মুড়িমুড়ি চিবিয়ে দিন কাটাতো। অবশ্যে এ বাড়ীর গৃহিণীর অনুগ্রহে ওরা কুল পায়। কোনো-মতে দিন কাটাতে থাকে। সে আজ প্রায় তিন মাস হলো।

কিন্তু এই জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে অভাবের কোনো ক্ষেত্র বিশুর মনে নেই। কোথায় অভাববোধ, কোথায় বা দারিদ্র্য? বাসনার চিহ্ন নেই, অবিকার-চিত্ত, নির্লাভ, মোহরহিত,—এটা অস্তুত জীবন বটে। হাসি খুঁজে পাওয়া যায় না, আগ্রহ নেই কিছুতে, অভিলিপ্তার ধার ধারে না,—এমন ছেলে মেয়ে আশ্চর্ষ।

এটা অস্বাভাবিক, ওরা জানে; এটা অবিশ্বাস্য, ওরা বোঝে। কিন্তু এটা সত্য ওদের জীবনে। ওরা দুয়ে মিলে এক নয়, ওরা একক, পৃথক। ওরা দুজনে গায়েগায়ে লেগে থাকা মাটির কণা নয়, পাশাপাশি ছুঁয়ে থাকা বালুর দানা। কাছে কাছে থাকে, এঘরে ওঘরে—কিন্তু সংযোগ-সেতু নেই, কেননা স্নেহলেশশৃঙ্গ। প্রাণলোকে এত বড় বিপ্লব স্থষ্টি করা, চিত্তবৃত্তির সহজ প্রকাশ-পথে এত বড় বিদ্রোহ ঘোষণা করা,—এ ওদের পক্ষেই সম্ভব।

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে-চেয়ে বিশুর চোখে ঘুম আসে। কৌ আনন্দের ঘুম তা'র। চক্রহাসের নৌকায় সে যেন স্বথের স্বপনলোকে ভেসে যায় তন্ত্রার তরঙ্গে। শিথিল হয়ে আসে তা'র তমলতা হিমানীর মধুর স্পর্শে। বিশু বড় সুন্দর, বড় উদাসিনী।

সেই রাত্রে বিশু অকাতরে ঘুমিয়েছিল।—

তোর রাত্রের দিকে সহসা যেন বিদ্যুতের কশাঘাতে তা'র ঘুম ভাঙলো। বাণবিদ্বার মতো অকস্মাং জেগে উঠে দাঢ়ালো। কেৰাথুৱ একটা শব্দ, কী ঘেন একটা সতর্ক আওয়াজ। দ্বাণশক্তি বিশুর অতি প্রবল। সহসা...একটি পলকে...মুহূর্তের একটি ভগ্নাংশে সে নিখাস নিয়ে জানতে পারলো, এ বাসাৰ বাহিৱের দিকে যেন একটা নিঃশব্দ অতি-সতর্ক ষড়যন্ত্র। বিশু চক্ষেৰ নিমেষে অগ্রসৱ হোলো। বাঘিনীৰ হিংস্র তীক্ষ্ণতা তা'র ছই চোখে।

জ্যোৎস্নাহতা স্বপ্নাতুৱা মায়াবিনী সে নয়, সে সংহারিণী, সর্বনাশিনী। বিশু বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে বাহিৱের বন্ধ দৱজাৰ ছোট্ট ছিদ্ৰ দিয়ে পথেৰ দিকে তাকলো। পোষাকপৱা ঘোন্ধাৰ মতো কতগুলো লোক সশন্ত্র উৎকৰ্ণ-প্ৰহৱীৰ মতো দাঢ়িয়ে। বিশু উদ্ভ্ৰান্ত, ব্যাকুল, দিশাহারা!

সহসা সে আন্দাজ কৱতে পারলো কয়েকটি লোক পাঁচিল বেয়ে উঠে ভিতৱে নামবাৰ চেষ্টা কৱছে, বাকি লোকগুলো ঘৰাও কৱেছে বিশুদেৱ বাসা। আৱ সময় নেই, পালাবাৰ পথ নেই, মুহূৰ্ত বিলম্ব সইবে না—বিশু ছুটে এলো তা'র স্বামীৰ ঘৰে। চাপা কঢ়ে বললে, পালাও!

ভিতৱে কোনো সাড়া নেই। ভয়ত্রস্তা পাগলিনীৰ মতো অন্ধকাৰে হাত বুলিয়ে বিশু আৰ্তকঢ়ে বললে, পালাও শিগগিৰ... .

এদিক ওদিক হাতড়িয়ে এক সময় বিশু থমকে স্বস্তিৰ হাসি হাসলো। কা'কে পালাতে বলছে সে? যে পালাবাৰ, সে যে অনেক আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে,—এ তল্লাটে তা'র চিহ্নমাত্ৰও নেই!

বাড়ীৰ চারিদিক ঘৰাও কৱেছে ওৱা সবাই। ওৱে সহধৰ্মনি, তোৱ পালাবাৰ যে আৱ কোনো পথ নেই! সদৱ দৱজা ভাঙছে, পাঁচিল বেয়ে উঠছে ওৱা, জানালাগুলো কাটছে,—তোৱেৱ প্ৰথম আলো ফুটে উঠছে ওদিকে। পিঞ্জৱাবন্ধা বাঘিনী দাত দিয়ে দাতেৱ পাটি ঘৰণ কৱলো।

বিশু ছুটতে গেল, কিন্তু পথ নেই। খিড়কি খুলে ঝোপ আৱ ডোৰাৰ দিকে যাবাৰ চেষ্টা কৱলো, কিন্তু সেখানে সশন্ত্র দশটি পুলিশেৱ লোক। বিশু খিড়কি বন্ধ ক'ৱে দিল। উপৱেৱ কৰ্তা ও গৃহিণী তখন চৌকাৰ কৱছেন।

শেষ পৰ্যন্ত বিশু দৱজা খোলেনি। কিন্তু দৱজা ও জানালা ভেজে এক সময় সশন্ত্র পুলিশেৱ দল বিভীষিকাৰ মতো ভিতৱে তুকলো। অন্তত দশজনেৱ হাতে রাইফেল, তাদেৱ সঙ্গে বেয়নেট আঁটা; অফিসাৱদেৱ হাতে পিস্তল।

একজন অফিসার একটি ঘরে চুকেই দেখলেন, একটি বউ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলো। ব্যস্তভাবে নতমুখে মুছকঠে বধুবেশিনী বিমু বললে, কে আপনারা ? ক'কে চান् ?

বড় সাহেব আড়চক্ষে নতমুখী বধুবেশিনী বিমুর প্রতি অভিনিবেশমহকারে তাকালেন। পরে বললেন, তুমি মেয়ে মাঝুষ, ভঙ্গ ঘরের মেয়ে, তবু সন্ত্রম হানির ভয় করো না, কেমন ? পুলিশের হাতে পড়েছ, এবার নিজের মান বাঁচাতে পারবে ?

বধু ঘাড় নেড়ে জানালো, সে পারবে ! ছেট সাহেব বললেন, স্তর, আমাদের গোয়েন্দারা বলে, ওরা খুনে বটে, ডাকাত বটে, কিন্তু সন্ধ্যাসী ওরা, ওদের নৈতিক চরিত্র লোহার চেয়েও কঠিন। খবরের কাগজে লেখে, ওরাই নাকি দেশের গোরব।

বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা, আপনারা একটু বাইরে যান, আমি ওকে প্রশ্ন করবো।—ভয় নেই, পিস্তল আছে আমার হাতে।—এই ব'লে তিনি উত্তমক্ষেত্রে পিস্তলটা একবার পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

ওরা সবাই বাইরে গিয়ে দাঢ়ালো ! তারপর বড় সাহেব কঠোর-কঠে প্রশ্ন করলেন, আমাদের এখানে আসবার আগে কি আসামী পালিয়েছে ?

বধু শান্তকঠে জবাব দেয়, হ'তে পারে।

মেয়ে-বিপ্লবীকে পুলিশ ক্ষমা করেনা, জানো ত ? সত্য বললে শান্তি কম পাবে। আসামী কী তোমার স্বামী ?

না।

তোমার বিয়ে হয়েছে ?

না।

তবে মাথায় ঘোমট। দিয়েছ কেন ? সিঁহুর আছে কপালে ?

বধু সম্মতি জানিয়ে বললে, আছে।

বড় সাহেব ডাকলেন, মিস্টার চৌধুরী...

ছেট সাহেব আবার এলেন। বললেন, ও-মেয়েটি কারো বউ নয়, বিয়ে ওর আজ্ঞা হয়নি, স্তর। আমরা সব জানতে পেরেছি—

বড় সাহেব হিংস্র চক্ষে বন্দিনীর দিকে তাকালেন। ছেট সাহেব পুনরায় বললেন, ফাসীর আসামীকে বাঁচিয়ে লুকিয়ে রাখার জন্তেই ও-মেয়েটি তা'র

স্ত্রী সেজেছিল। ওরা ঘরভাড়া নিয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে—আমাদের স্পাইরা বলে—

বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা, আপনারা বাইরে গিয়ে চোখ রাখুন—

ছোট সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

বড় সাহেব গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, সত্য বলো। আসামীর সঙ্গে তুমি একঘরে থেকেছ কোনোদিন ?

বধূ জবাব দিল, না।

আসামীকে ভালোবাসতে তুমি ?

না।

মনে মনে ?

বধূ জবাব দেয় না। বড় সাহেব পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি ?—সাবধান, পালাবার চেষ্টা করো না।

বন্দিনী এতক্ষণ পরে পুর্টলিটি সরিয়ে রেখে উঠে দাঢ়িয়ে মাথার ঘোর্টা খুলে হাসলো। বললে, কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে গিরীনদা ? আমাকে চিনতে পারোনি ত ?

বজ্জ্বাহত বিশ্বায়ে পুলিশের বড় সাহেব ব'লে উঠলেন, তুই...বিহু ? এখানে ?

আঁচল খুলে বিহু বললে, তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও, গিরীনদা। আর দরকার নেই। কিন্তু বড় দুঃসময়ে তুমি টাকা দিয়েছিলে, ভাই।

গিরীন অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলো, কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না, তা জানিস ?

বিহু হাসলো। সহজ, সরল, স্বস্ত হাসি তা'র।

উত্তেজিত উন্মত্ত কঠে গিরীন বললে, তোকে দ্বীপান্তরে যেতে হবে যে !

বিহু হাসলো। বললে, দ্বীপান্তরের আগে দেহান্তর ঘটুক, গিরীনদা !—এই ব'লে চক্ষের পলকে সে কী একটা কাগজ মুখে পুরে দিল।

গিরীন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। তা'র কাপা হাতের অঙ্গুরতায় দড়াম শব্দে পিস্তলের গুলি ছুটে গেল দেওয়ালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সার্জেণ্ট আর অফিসারের দল ছুটে এসে যথন ভিতরে ঢুকলো, গিরীন তখন উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে, এবং ততক্ষণে বিহুর মৃত তহুলতা মেঝের উপর লুটোছে। বলা বাহল্য, বিহুর পুর্টলিতে ধাকতো সাংঘাতিক বিষ।

ধাকতোকে ইস্পাতের ফলাটা ভেঙে গেল, কিন্তু একবারও মচকালো না !

গন্ধ

রোগী দেখার জন্য এ বাড়ীতে ডাক্তারবংশিরা আসে, কিন্তু যে-ব্যক্তি
রোগীর সেবা ও পরিচর্যা করে, তা'কে দেখবার জন্য আসে এপাড়া ওপাড়ার
মেয়েরা। এমন কি বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যে-সকল মুখচেনা ভদ্রলোকরা
আনাগোনা করেন তারাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে যান—যদি কোনও
সময়ে হঠাতে শুক্রবারিগীর দর্শন মিলে যায়।

পাড়ার মেয়েরা বলে, এমন দেখিনি! অনেক পুণ্যে লোকটা এমন স্ত্রী
পেয়েছিল। পাঁচ বছর ধ'রে স্বামীর মাথার পাশে ব'সে রাত জাগছে, একটি
দিনও ঘুমোয়নি—এ ঘটনা কি না দেখলে বিশ্বাস করতো কেউ?

কেউ বা ওরই মধ্যে একটু ব্যঙ্গাত্মক হাসি মিলিয়ে বলে, আদর্শ হিন্দু স্ত্রী।

এমনি বিলেত ফেরতা ডাক্তার ভৌমিকও সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন,
স্বামীর প্রতি অঙ্ক ভালোবাসা দেখে এসেছি লঙ্ঘনের কোনো কোনো
পরিবারে, কিন্তু কুশ স্বামীর মাথার পাশে পনেরো রাত্রি ধ'রে কোনো মেয়ে
ব'সে থেকেছে—একথা শুনলে তারাও বিশ্বাস করবে না। এ কেবল
ইঙ্গিয়াতেই সম্ভব। আপনি কি সত্যই রাত্রে ঘুমোন না, মিসেস রায়?

শিবানীর মুখে চোখে চিন্তাবৈলক্ষণ্যের রেখা মাত্র দেখা গেল না। তিনি
বললেন, সময় পেলে ঘুমোতুম বৈ কি।

পনেরো বছরের মেয়েটি আজ প্রায় পাঁচ মাস শয্যাগত; বারো বছরের
ছেলেটি আশেশব মৃগী রোগে ভুগছে। পারিবারিক অবস্থাটা সচ্ছল।
বাড়ীতে ঠাকুর চাকর বি—সবাই আছে। ওরা থাকে ঘরসংসার নিয়ে,
শিবানী থাকেন রোগীদের নিয়ে। বাড়ীর ভিতরের চারিদিকে অস্তুত রোগের
চক্রান্ত,—বিচিত্র এবং বিভিন্ন ঔষধের সংমিশ্রিত কড়া গন্ধ দিবারাত্রি বাড়ীর
মধ্যে ভেসে বেড়ায়,—এবং এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধির একটা নিত্যনৈমিত্তিক
ষড়যন্ত্র প্রায় পাঁচ বছর থেকে শিবানীকে হিঁর থাকতে দেয়নি। ওই কটু
ও কঠিন গন্ধটাই হুকে সক্রিয় ক'রে রাখে।

সেদিন পাড়ার একটি মহিলা প্রশ্ন করছিলেন, আপনার স্বামীর হাতে
অত্থানি স্থূল ধাঁধা কেন, বৌদ্ধিমি?

আসছি।—ব'লে শিবানী স্বামীর ঘরে গিয়ে চুকলেন। টেবিলের ওপর
থেকে ওষুধ এক দাগ নিয়ে স্বামীর মুখে টেলে দিলেন, পরে কাচের পাত্র থেকে
চারটি বেদানাৰ দানা নিয়ে রোগীকে খাওয়ালেন। উচ্ছিষ্টের পাত্রটা ধরলেন
মুখের কাছে। কাজ সেৱে আবাৰ বেৱিয়ে এলেন।

বাইরে এসে সেই মহিলার দিকে ফিরে বললেন, হ্যা, ওগুলো স্ফুতো।
বাবা তারকনাথের তাগা।

কবে পৱালেন ?

হ'বছুৱ আগে।

মহিলা প্ৰশ্ন কৱলেন, আপনাদেৱ বিশ্বাস আছে বুৰি ?

ৱেখাহীন নিৰ্বিকাৰ মুখে শিবানী বললেন, তাৱকনাথে গিয়ে আমি ধৰ্না
দিয়েছিলুম। তিনদিন পৱে ওষুধ পাই আঁচলে। সেই ওষুধ ওঁৰ গলায়
ৰোলানো।

আপনাৰ মেয়েৰ গলাৰ কৰচথানাও বুৰি তাই ?

না, ওটা শুন্দিবাবাৰ কৰচ। হাতে সিঙ্কেশ্বৰীৰ মাদুলী।—শিবানী চ'লে
গেলেন অন্ত ঘৰে।

সেদিন বৰ্তিশটি টাকা পকেটে পুৱে ডাক্তাৰ ভৌমিক বেৱিয়ে যাচ্ছিলেন।
ৱোগীৰ সামনেই শিবানী বললেন, ডাক্তাৰবাবু, আপনাৰ হাতে রোজ দিতে
আমি লজ্জা পাই। এক কাজ কৰুন, এই টানায় আমাৰ টাকা আছে,
আপনি এৱ থেকে আপনাৰ ফী গুণে নিয়ে যাবেন রোজ।

মুখেৰ চেহাৰায় ও কঠস্বৰে কিছুমাত্ৰ উত্তৃপ নেই, যেন কলেৱ পুতুল
কথা কইলো। যে আজ্ঞে—ব'লে ডাক্তাৰ চ'লে গেলেন। এমন সময়
বারান্দাৰ পূৰ্বদিকেৱ দালানে শোনা গেল মসমসে জুতোৱ আওয়াজ। বুৰতে
পাৱা গেল কল্পাৰ ঘৰে গিয়ে চুকলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তাৰ। ভদ্রলোকেৱ
বয়স কম, চোখে চশমা, কোটপ্যাল্ট পৱা,—মাথায় মন্ত্ৰ টাক। ওই ধাৱ থেকেই
হঠাতে এলো কড়া ফিনাইলেৱ গঙ্ক। বাড়ী এতক্ষণে ফিনাইল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে।

স্বামীৰ ঘৰে এলেন শিবানী। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টা ঘড়িতে। গৱাম
জলে তোয়ালে ডুবিয়ে নিংড়ে স্বামীৰ মাথা ও গা মুছিয়ে দিলেন। স্বামী
যেন কী বলছিলেন বিজ বিজ ক'ৱে—কিন্তু শিবানী নিজেৰ মনে কাজ ক'ৱে
গেলেন। ৱোগীৰ মুখে পথ্য দিয়ে এক সময়ে তিনি ঘড়িৰ দিকে তাকিয়ে
ডাকলেন, মালী ?

চাকর এসে দাঢ়ালো। শিবানী বললেন, দিদি মণির ঘরে দুধ দাও।

মালী চলে গেল। একটা ছোট শিশির ছিপি খুলে শিবানী একবার স্বামীর নাকের কাছে ধরলেন, তারপর শিশির যথাস্থানে আবার রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন। গঙ্কটা শোকানো দরকার।

বারান্দা পেরিয়ে শিবানী কোণের ঘরে এসে ঢুকলেন। সামনে যে-দৃশ্য দেখা গেল, সন্তানের জননী ছাড়া আর যে-কেউ দেখলে শিউরে উঠতো। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে একতাল মাংসপিণ্ডের মতো বেঁকেচুরে পড়ে রয়েছে। বাঁকা পা দুটো ঢুকেছে পেটের মধ্যে, বাঁকা মুখের পাশ দিয়ে চোখ দুটো নাকের পাশে কোথায় হারিয়ে গেছে। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে রয়েছে দেখে শিবানী কয়েক মুহূর্তে থমকে দাঢ়ালেন। তারপর তাকের উপর থেকে সরুধের তেলের বাটি নিয়ে এসে সেই অচেতন ছেলেটাকে তেল মাখাতে বসে গেলেন। চাকর এক বালতি জল দিয়ে গেল, যি এনে দিল গামছা আর সাবান। শিবানী নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে ছেলেটাকে স্নান করাতে বসে গেলেন। মৃগীবিকার সারবে একটু বাদে—শিবানী জানেন। অতএব তাকে স্নান করিয়ে সেই কদাকার বিকারের মধ্যে রেখে তিনি গেলেন কন্তার ঘরে। হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ততক্ষণে চলে গেছেন। শিবানী গিয়ে দুধের গেলাসটা ধরলেন মেয়ের মুখে। তিনি হলেন যন্ত্র। তাঁর ক্রিয়া আছে, চালনা আছে, উত্তমও আছে। তাঁর ক্লান্তি নেই, অবসাদও নেই।

বাইরে কার গলার আওয়াজে তিনি একসময়ে আবার বেরিয়ে এলেন। একটি ছোকরাকে দেখে বললেন, কি রে দেবেন ?

দেবেন বললে, কবিরাজমশাই এই ওষুধগুলো পাঠালেন। এর মধ্যেই নিয়ম আর অনুপানের ফর্দ আছে, পিসিমা। আর শুন, আপনার ছোড়দার ওখানে গিয়েছিলুম।

শিবানী তার দিকে তাকালেন। দেবেন বললে, তাঁর স্তুর অবস্থা খুব খারাপ। বৌধ হয় বাঁচবেন না।

ইয়া জানি। বলে কবিরাজী ওষুধের মস্ত মোড়কটা তুলে নিয়ে শিবানী ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কর্ণে কাপন নেই, ব্যথা-বেদনা অথবা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। দেবেন তাঁর পথের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

ঘড়ির দিকে একসময় তাকিয়ে শিবানী গেলেন রাস্তারে। সেখান থেকে কাচের পিটে ভাত আর সিঁদু তরকারি নিয়ে এলেন কোণের ঘরে ছেলেটার কাছে। খাত্তের চেহারা দেখে শৃঙ্খলাবন্ধ জন্মে গতে বিকলাঙ্গ ছেলেটা আনন্দে কিলবিল করে উঠলো। শিবানী তাকে খাওয়াতে বসে গেলেন। পোড়াকাঠের মতো কালো জন্মটা!

কিন্তু মেয়েটা তেমন নয়। এই সেদিন পর্যন্ত মেয়েটা ছিল সুন্দী। পনেরো বছর বয়সে সবেমাত্র সর্বাঙ্গে তাঙ্গণ্যের নধর স্বরূপ ছন্দ এসে পৌছেছিল, এমন সময়ে এলো জর। দেখতে দেখতে চোখের কোণে কালি, দেখতে দেখতে মাথার চুলের রাশি বিবর্ণ—মেয়েটাই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এসে বিছানা নিল। পাঁচ মাস হোলো শুয়েই আছে। বিছানাটা যদি আর না ছাড়ে তবে বিশ্বয়ের কারণ নেই।

পাশের বাড়ীর গিন্ধী বলেন, বোৰা সয়, যে বোৰা বয়! কী ধৈর্য, আমরা অবাক হয়ে যাই। মুখে একটি কথা নেই সারাদিন। একালে এমন মেয়ে দেখা যায় না কোথায়ও! পাঁচ বছর হোলো, মা!

আরেক জন বলেন, পাঁচ বছর হোলো ওই চারখানা ঘরের মধ্যে শিবানী যুৱছে। আমরা কত বলি বাছা বিকেলের দিকে ছাদে উঠেও ত' একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারো? কিন্তু কিছুতেই আমাদের কথা শোনে না।

ও বাড়ীর পিসি বলেন, আজকাল কলকাতায় কত সিনেমা হয়েছে, কত লোক বেড়ায় কত দিকে,—কিন্তু শিবানী এক পা দেয়না বাড়ীর বাইরে। নিজের শরীর বাঁচলে তবেই ত' স্বামী-সন্তানের সেবা করবি, মা?

কে যেন চাপা গলায় বলে, স্বামী যে বাঁচবে না এ সবাই জানে। যাৰ থেকে নিজের শরীরটাই অয়ত্নে নষ্ট কৱা বৈ ত' নয়!

সেদিন ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, শিবানী এলেন পিছনে পিছনে! ডাক শনে ডাক্তার থামকে দাঢ়ালেন। শিবানী বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস কৰতে পারি কি?

কি বলুন?

আমার স্বামীকে কেমন দেখলেন আজ?

ঠিক বলা কঠিন, মিসেস রায়।

শিবানী প্রশ্ন কৱলেন, পাঁচ বছরে কি ওঁর কোনো উন্নতি হয় নি?

ডাক্তার ভৌমিক বললেন, আপনারা মাঝখানে আমাকে প্রায় বছর খানেক ডাকেন নি। এই পাঁচ বছরে প্রায় কুড়িবার আপনারা ডাক্তার বদল করেছেন।

শিবানী বললেন, ফল না পেলেই ডাক্তার বদলাতে হয়। কিন্তু আর ক'বছর আমাকে রাত জাগতে হবে, ডাক্তার ভৌমিক?

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলেন। শিবানীর কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায় সমগ্র চিকিৎসক সমাজের প্রতি অনুযোগ। ডাক্তার আড়ষ্ট কঢ়ে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, ওঁর শরীরে আছে চাপা পক্ষাঘাত, তার ওপর বাত, ব্রেণের দোষ, হাট্টের গোলমাল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ওঁর চিকিৎসা-বিভাট হয়েছে। মাঝখানে আপনারা হোমিওপ্যাথী করতে গিয়ে অনেকদিন সময় নষ্ট করেছেন।

শিবানী নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন, ওঁর বাঁচবার আশা কি একেবারেই নেই।

ডাক্তার একবার তাকালেন তাঁর দিকে! পরে বললেন, আজ আপনাকে একটু বেশী চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। এ আলোচনা আজ থাক মিসেস রায়। নমস্কার।

ডাক্তার ভৌমিক বাইরে গিয়ে নিজের মোটরে উঠলেন। কিন্তু অত্যন্ত ভুল ক'রে গেলেন তিনি। শিবানী একেবারেই চঞ্চল নন! চাঞ্চল্যটা তাঁর প্রকৃতিবিকল্প। তিনি কেবল জানতে চেয়েছিলেন স্বামীর জীবনের আশা আছে কিনা। যদি মোটামুটি একটা হাদিস পাওয়া যেতো যে, বেঁচে উঠতে এতদিন সময় লাগবে, অথবা মৃত্যুর আর মাত্র এতদিন বাকি,—তাহ'লে রাত্রি জাগরণের হিসাবটাও ওই সঙ্গে পাওয়া যেতে পারতো। এটা স্থিতবুদ্ধির কথা, চাঞ্চল্যের কথা নয়। ডাক্তার নির্বাধের মতো ভুল ক'রে গেল। এটা জীবনমৃত্যুর কথা, হৃদয়াবেগের কথা নয়। স্বামী বাঁচবেন, অথবা বাঁচবেন না—এটা জানবার দরকার শিবানীর আছে বৈকি।

এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঢ়ালো। গাড়ী থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক এবং বছর চারেকের একটি ছোট ছেলে। ভদ্রলোক নেমে এসে ডাকলেন, শিবানী, কই রে?

শিবানী বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বললেন, তোম বৌদ্ধিম মারা গেছে কাল ছপুরে। শেষকালটা ভারি কষ্ট পেয়েছিল।

শিবানী প্রশ্ন করলো, শশান থেকে ফিরলে কখন ছোড়দা ?

ছোড়দা বললেন, ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা । কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, আমাদের সাহেব টেলিগ্রাম করেছে । আজ আমাকে বোষে যেতেই হবে । আমার ওখানে আর ত' কেউ নেই, ছেলেটাকে কোথায় রেখে যাই ।

শিবানী বললেন, আমার এখানে রাখবে, কিন্তু এবাড়ী ত' দিনরাত ওষুধের গন্ধ ভরা । যদি তোমার ছেলে স্বস্ত না থাকে, ছোড়দা ?

ছোড়দা বললেন, যা কপালে আছে তাই হবে । কিন্তু একে আমি নিয়ে যাবো কোথায় ? তোর এখানে ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাখতে আমি ভরসা পাইনে । রায় মশাই কেমন আছেন ?

শিবানী জবাব দিল, একই রকম ।

নৌলিমা !

বুঝতেই পারো !

ছোড়দা বললেন, হঁ । তোর ছেলেটারও ত' ওই দশা । কবে যে তুই মুক্তি পাবি !

মুক্তি ! শিবানীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইলো । যাবার সময় ছোড়দা বললেন, আমার ওখানকার চাটি-বাটি সব তুলে দিয়ে গেলুম । এবার যাচ্ছি অনেকদিনের জগ্নে । কাহু তোর এখানে রইলো, তোর এখানেই থাকবে ।

ছোড়দা চ'লে গেলেন । একটি সমবেদনার কথাও শিবানীর মুখে এলো না । কাহুর মা মুক্তি পেয়ে গেছে রোগ থেকে,—দুঃখ কিছু নেই ।

সমস্ত বাড়ীখানা নিবিড় শান্ত । চুপ ক'রে থাকো, বাতাসের শব্দ কান পেতে শোনো । মানুষ আছে অনেকগুলি, কিন্তু শব্দ নেই । শব্দটাই জীবন, শব্দহীনতাই মৃত্যু । মাঝে মাঝে হয়ত কোনো রোগীর আর্তকণ্ঠের পোঙানি, হয়ত বা ওই মৃগীরোগী ছেলেটার একপ্রকার বিক্রিত আওয়াজ,—তারপরে সব চুপ । বাইরে হয়ত কোনো মধ্যাহ্নকালের পাথীর এক টুকরো কলকুজনের আওয়াজ । আর কিছু নেই । এক ঘরে গিয়ে শিবানী ওষুধ খাওয়ায়, অন্ত ঘরে গিয়ে মাথা ধোয়ায়, পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা বদলে দেয় । এক গন্ধ থেকে আরেক গন্ধে ; এ গন্ধ থেকে ও গন্ধে !

সমস্ত ঘরগুলি মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত, মেঝেগুলি আরসির মতো ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন । ধুলো-বালি-ময়লা-নোংরা কোথাও বিদ্যুমাত্র নেই ।

কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্র যেন প্রেতের মতো দাঢ়িয়ে আছে, দেওয়ালের প্রত্যেকটি ছবির যেন কিছু একটা ভাষা আছে, একটা চাপা শব্দহীন চক্রান্ত। একা ঘরে চুক্তে অনেক সময় যেন ভয় করে।

হঠাৎ ওঠে আওয়াজ,—পিসিমা?

ঘরগুলো যেন চমকে ওঠে, আসবাবপত্রগুলো যেন প্রাণ পেয়ে থরথর করতে থাকে। শিবানীর হাত থেকে চামচখানা খ'সে পড়ে। নিঃসাড় প্রেতপুরীর মাঝখানে যেন নবজীবনের ডাক।

শিবানী এসে দাঢ়িয়ে বলেন, কি রে কানু, ভয় করছে, কোলে উঠবি?

কানু ঘাড় নেড়ে বলে, উহুঁ না,—আমাকে যে তুমি বল কিনে দেবে বলেছিলে ?

ভাষাটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই। শিবানী বললেন, আজই তোর বল আনিয়ে দেবো। আর কি চাই বল।

কিছু না।—পিসিমা, আমি পান সেজে দেবো তোমার জন্যে!—কানু কাছে এসে আবদার ধ'রে বসে।

শিবানী হাসতে গিয়ে চমকে উঠলেন। এর নাম কি হাসি? এ তাঁর মনে নেই! নিজের মুখের চেহারা পাছে তাঁর চোখে পড়ে, এজন্ত আয়নার সামনে তিনি চুল বাঁধেন না। এ হাসি তাঁর মুখে কেমন মানালো, একবার দেখলে কেমন হয়?

ছেলেটা কাছে আসতে জানে, ঔদাসীন্তাকে কৌতুহলে পরিণত করতে জানে। শিবানীকে গভীর দেখে সে আঁচলে ধ'রে বললে, পিসিমা আমি কাজ করবো!

কী কাজ করবি তুই?

সব কাজ করবো।

শিবানী হাসলেন। বললেন, আচ্ছা দেখে আয় দেখি বারান্দায় চাদর-খানা শুকিয়েছে কিনা?

কানু অমনি ছুটলো। বারান্দা থেকে শুকনো চাদর তুলে আনলো। কী বিজয়গর্ব ওর মুখে চোখে! কী আশ্র্য সংহত চাঁকল্য ওর নধর স্বাস্থ্যশ্রীতে! শিবানী বললেন, এত কাজ করলে তোর যদি অস্ফুর করে, কানু?

না, অস্ফুর করবে না, তুমি দেখো।—পিসিমা, আমি আজ থেকে তোমার কাছে শোবো।

আমি কি তুই যে, আমার কাছে তুই শুবি ?
 তবে আমি থাকবো তোমার কাছে রাত্তিরে ?
 শিবানী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি যে ঝগীর ঘরে থাকি !
 কানু বললে, আমিও থাকবো !—আচ্ছা পিসিমা, ওরা অত ওষুধ খায়
 কেন ?

আমি যে অনেক পাপ করেছি তাই ওরা ওষুধ খায় !
 কানু অবাক হয়ে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী বলেন,
 আয় কানু, তোকে জামা পরিয়ে দিই !
 না, পরবো না !

ওমা, ঠাণ্ডা পড়েছে যে !

না, ঠাণ্ডা পড়েনি !—কানু ছুটে পালিয়ে যায়। ঝগ্নি জননীর মৃত্যু
 ঘটেছে সেজন্ত ছেলেটার একটুও ভাবান্তর দেখা যায় না। ছেলেটা শৃঙ্খলারে
 গিয়ে দাঢ়িয়ে নিজের মনে কথা কয়। একদিন বাইরের ঘরের বড় আয়নাটার
 সামনে দাঢ়িয়ে সে নেচেই অস্থির। এ বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরেই যেন তা'র
 একজন ক'রে বন্ধু লুকিয়ে আছে, কানু নিজের মনেই কানামাছি খেলতে
 খেলতে সেই বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। খেলতে খেলতে নিজেই সে মেতে ওঠে ;
 নানা কাজের ফাঁকে শিবানী ওকে লক্ষ্য করেন।

ওঘর থেকে স্বামীর ডাক শুনেই শিবানীর মুখখানা গন্তীর হয়ে ওঠে।
 স্বামী অস্থস্থ.হ'লে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। শিবানী তাড়াতাড়ি ওঘরে
 গিয়ে হাজির হন। রোগীর মুখে একটু জল, একটু ফল, একটুখানি গায়ে হাত
 বুলানো, বালিশটা ঠিক ক'রে দেওয়া, গায়ের উপর চাদর টানা, জান্লাটা
 একটু ভেজানো, বেড়প্যান্টা একটু সরানো। শিবানীর হাত অতি নিপুণ,
 সেবায় অতি একাগ্রতা, যত্নে একান্ত আন্তরিকতা। তারপরে তিনি বেরিয়ে
 আসেন, বেসিনের কাছে গিয়ে কটুগঙ্ক কারবলিক্ সাবান দিয়ে হাত ধোন।
 তারপরে যান্ত শ্রীমতী নীলিমার কাছে, সেখান থেকে ঘণ্টির ঘরে। ঘণ্টির
 তখন মৃগীবিকার দেখা দিয়েছে।

ওমা, কানু তুই কি করছিস এখানে রে ?

বি এসে হাসিমুখে অভিযোগ জানালো, ওই দেখুন—এক বালতি জল
 এনেছে, গামছা এনেছে আপনার জন্যে,—আমার কাছে গিয়ে বলে, সৈকুবী,
 তেলের বাটি দাও ! আমি বলি, তেলের বাটি কি হবে, দাদা ? বলে,

পিসিমা বুঝি চান् করবে না? আমি যে পিসিমাকে থাইয়ে দেবো!—শুন
ছেলের কথা!

আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করবেন না শিবানী,—কেননা তাঁর মুখে হাসি
দেখলে ঝি-চাকররা চমকে উঠবে। তিনি বললেন, আচ্ছা না হয় থাইয়েই
দিবি, কিন্তু জল ঘেঁটে যদি অস্থ করে?

কানু মুখ ফিরিয়ে বললে, বললুম যে অস্থ করবে না?

তুই কি পণ্ডিত যে, সবজান্তার বড়াই করিস?

কানু ভাবলো, না, পণ্ডিত সে নয়। স্বতরাং হতাশ হয়ে সে পিসিমার
পাশে এসে দাঢ়ালো। ঝি একেবারে হেসেই অস্থির।

কানু এসেছে, যেন প্রাণ এসেছে বাড়ীতে। তার চলাফেরার মধ্যে
মুক্তির সংবাদ আছে। সে যেন অচল জড়তাকে আঘাত করে। সে যেন
তুষারস্তপের মধ্যে উত্তাপ আনে, সেই উত্তাপে বিগলিত প্রাণধারা নেমে
আসে। তার সারাদিনের কলকষ্ঠ আর কাকলী যেন প্রত্যেকখানা ঘরের
ভিতরকার বহুকালের অসাড়তাকে মুখর ক'রে তোলে। শিবানী চুপ ক'রে
নতুন পাখীর কাকলী উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে
তিনি ডুবে যান्।

কানু স্বাধীন। সে নিজে স্বান করবে, ভাতের ধালা নিয়ে গিয়ে দাঢ়াবে
বামুনঠাকুরের কাছে, নিজে জামা জুতো পরবে, এবং নিজের মাথা নিজেই
ঝাঁচড়াবে। পিসিমার কোনো সাহায্য না নিয়েই সে চলবে,—এবং যতটুকু
হোক, পিসিমার পায়ে-পায়ে ঘুরে তাঁর কাজে কিছু সাহায্য সে করবেই।
ছেলেটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, এবং চেহারাটা সত্যকার সুশ্রী। সঙ্ক্ষ্যার পর
সে যখন যেখানে-সেখানে ঘুমে লুটিয়ে পড়ে, শিবানী এসে কিছুক্ষণ দাঢ়িয়ে
থাকেন তা'র সামনে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাঁর,—কোলে নিয়ে
কিছুক্ষণ কাদতে ইচ্ছে করে। ছেলেটা এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তাঁর
কাজ কিছু বাড়ে নি, বরং কাজ কমেছে, বরং আজকাল তাঁর কপালে একটু
বিশ্রামও জোটে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একদিন বললেন, মিসেস রায়, নৌলিমার
আমি কোনো উন্নতি করতে পারলুম না। আপনি অঙ্গ ব্যবস্থা
করুন।

শিবানী বললেন, আর কতদিন মেঝেটা ছুগবে মনে করেন?

তিনি বললেন, আমাদের ওষুধ হোলো দৌর্ধ-য়েঘোষী,—অনেকদিন পর্যন্ত
ধৈর্য না রাখলে ফলাফল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর অবস্থা
থারাপ হচ্ছে, মিসেস রায়।

পরের দিনে থেকে শিবানী অন্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটা
রাজোচিত এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু সেদিকে শিবানীর জ্ঞানে নেই। এ তিনি
জানেন, এ হবে,—এ হোলো নিয়ন্ত। কিন্তু এর শেষ তিনি দেখতে চান,
দেখতে চান অবগুণ্ঠাবী পরিণাম। মেয়েটা যেন দিন দিন বিছানার সঙ্গে
মিশিয়ে যাচ্ছে। মোমবাতিটা জলছে, নিবেও যাবে এক সময়ে, কিন্তু
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঠিক আন্দাজ করা যায় না,—কাঁটায়-কাঁটায়
মোমবাতিটুকু কখন শেষ হবে। কিন্তু প্রত্যেকটির চরম লগ্ন নিভুলভাবে
জানা গেলে ভালো হोতো। বলা বাহুল্য শিবানীর মুক্তি চাই। শুধু দৈহিক
মুক্তি নয়, মুক্তি চাই মনে, মুক্তি চাই চিন্তায়, কল্পনায়। সমস্ত প্রকার
বিভীষিকার ভিতর দিয়ে যদি সে-মুক্তি আসে, সেও ভালো।

পাড়ার লোকের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে যে, শিবানীর স্বামীর আর
কোনো আশা নেই। যে-কোনো দিন যে-কোন সময়ে বজাঘাত হতে পারে।
পাড়ার লোক থাকে কান পেতে, কতক্ষণে তারা শিবানীর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে
ডুকরে-ডুকরে কান্না শুনতে পাবে। ঝি-চাকর উঠবে চেঁচিয়ে, বাইরের লোক
ছুটেছুটি করবে, শুনবে সম্মিলিত চীৎকার।

এমনি সময়ে এলেন বিধবা ননদ, এলেন মামাশুর, এলেন বড় বড়
ছেলেমেয়ে তিন চারজন। বাড়ী ভরে উঠলো এবার কোলাহলে। কানু
হকচকিয়ে এসে দাঢ়ালো পিসিমার পাশে। শিবানী বললেন, ওদের দেখে
ভয় করছে নাকি রে কানু?

ভয়? না—কানু হাসলো। তারপর ছুটে চলে গেল খেলা করতে।

এর পরে দিন হোলো গোণাঙ্গণতি! কেননা আঘীয়ারা এসেছিলেন মিঃ
রায়ের অন্তিমকালে। তারা সেবা করতে আসেন নি, এসেছেন সৎকার করতে।
তারা জানতেন, পাঁচ বছর ধরে বিনিজ্জ রাজ্জি যাপন করে যে-নারী স্বামীকে
বাঁচিয়ে তুলতে পারে না,—স্বামীর মৃত্যু সে কি বরদান্ত করতে পারবে?

হেমাজিনী—শিবানীর বড় ননদ—শিবানীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,
কখনো যা দেখি নি তাই দেখলুম তোর সেবায়,—অনেক কন্ধলি তুই।
কিন্তু বাঁচা-মরা তোর হাত নয় বো!

শিবানী চুপ করে রইলো। গা তার ঠাণ্ডা। হেমাঙ্গিনী পুনরায়
বললেন, ভাইটির আশা আর নেই, চোখেই দেখছি। কিন্তু তোকে আর
জাগতে হবে না—ছেলেমেয়েরা এসেছে, ওরাই সব করবে।

মামাখণ্ডুর ওধার থেকে ডাকলেন, হেম ?

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিলেন, মামা কিছু বলছেন ?

ইঝা, বৌমাকে বলো,—উনি একটু বিশ্রাম নিন।

শিবানী শিউরে উঠে বললেন, বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি ঘুম আসে, দিদি ?

বেশ ত ঘুম আসে—ঘুমোবি ? হয়েছে কি ?

কিন্তু আপনারা কি পারবেন অত কাজ ?

ওমা, তা কেন পারবো না ? ওরা চারজন, আমি নিজে, মামা রয়েছেন
মাথার ওপর,—তারপর ঝি-চাকর-বামুন—সবাই আছে। কিছু অস্থিধে
হবে না, বৈ !

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই আগে। কিন্তু অনেককাল পরে
এতগুলি মাঝুষ চারিয়িকে দেখে শিবানী যেন অপরিসীম ক্লাস্তিতে অবসন্ন
বোধ করছিলেন। ডাক্তার বলে গেছেন, আজকের রাতটা হয়ত কাটবে,
কিন্তু আসছে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটবে কিনা বলা খুব কঠিন।
মিঃ রায় আছেন হয়ে পড়ে আছেন।

আসছে কাল বেলা বারোটা ?—সে অনেক দেরী। শিবানী সমস্ত
সফতে গুচ্ছিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলেন। দরকার হ'লে
মুহূর্তের মধ্যে তিনি উঠে আসবেন। রোগীর আর কোন আশা নেই, কিন্তু
তাঁরও আর দাঢ়াবার শক্তি নেই। অন্তিম এমন সময় বিশ্রামের কথা
তাঁর কল্পনাতেও আসে না, আজকে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া অন্ত কিছু
তিনি ভাবতেও পারছেন না।

নৌলিমা রইলো একজনের হেপাজতে, ঘণ্টি রইলো আরেক জনের তদ্বিরে।
ওদের জন্য কোনো অস্থিধা নেই। স্বামীর বিছানার চারপাশেও রয়েছে
সবাই। পলকে-পলকে তাঁর তদারক চলছে। বিগত কুড়ি বছরের কথা
আজ তাঁর মনে পড়েছে। একটি দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি
হয় নি ; কথনো কোনো কারণে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক বাধে নি। দুই দেহ
গুরু আলাদা, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ ! কুড়ি বছরের
ইতিহাস সগৌরবে তাঁর সামনে দাঢ়িয়ে।

ক্লান্তিতে শিবানীর দুই পা অবসন্ন, সর্বশরীর টলটল করছে। তিনি বাইরের দিকে এলেন, যেদিকটায় ঔষধপত্রের গন্ধটা কিছু কম। দক্ষিণের ঘরে কানু নিজের বিছানায় এসে শুয়ে থাকে, কিন্তু আজ কানু সেখানে নেই। শিবানী ঘূরতে ফিরতে এলেন বাগানের দিককার কোণের ঘরের দিকে। জানালা দিয়ে সেখানে ঢাকের আলো এসে পড়েছে; সেই আলোর আভায় তিনি দেখলেন, কানু অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে খাটের ওপর। একা ঘরে অঙ্ককারে এসে শুতে ছেলেটার একটুও ভয় করে না।

সন্ধ্যার পরে এদিকটা একটু নিরিবিলি। দূরে কাদের বাড়ীতে যেন রেডিয়ো ঘন্টা খোলা আছে। নারীকঠের মধুর কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। কানুর পাশে এসে শিবানী তাঁর আড়ষ্ট দেহটা ছড়িয়ে দিলেন, এবং আঁচলটা চাপা দিলেন কানুর গায়ে। চোখের পাতা তাঁর ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু কীর্তনের সুরপ্রবাহটাকে ছাড়িয়েও তিনি কান খাড়া ক'রে রাখলেন ভিতর বাড়ীর দিকে,—যেদিকে রোগীর ঘর।

বোধ হয় ঘন্টা দুই পরে হবে। একটি মেঘে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো।—মামীমা, ও মাসীমা,—শিগগির উঠুন, মামা কেমন করছেন! শিগগির আসুন, ও মামীমা—?

শিবানী জেগে উঠলেন, জড়িত কঠে বললেন, চলো যাচ্ছি। কিন্তু আমি আর কৌ করবো, সবিতা?

সবিতা ছুটে চ'লে গেল। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও শিবানী আবার শুলেন কানুর পাশে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবার এলো দুটি ছেলেমেয়ে আর হেমাঙ্গিনী নিজে। শিবানীর শয়নের ভঙ্গী আর নিশাসের অসমতাল লক্ষ্য করে ওরা ধ'রে নিলেন শিবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হেমাঙ্গিনী কাছে এসে শিবানীর মাথায় হাত রেখে বললেন, বড় কষ্ট পাচ্ছিল, তুই আর কাদিস নে বৈ তা'র জন্তে। সে জুড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, তোর আর উঠে কাজ নেই,—ওরাই শুশানে নিয়ে গিয়ে সব কাজ করবে। তোকে আর কিছু দেখতে হবে না!—এই ব'লে ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

শিবানী কিন্তু তখন অঘোর নিজায় নিপ্তি। কোন কথাই তাঁর কানে ওঠে নি।

ঘুম তাঁর ভাঙলো পরের দিন সকাল ন'টায়—ওরা সবাই তখন শুশান থেকে

ফিরেছে। যুম ভাঙালো কাছু। যুম থেকে উঠে টলতে টলতে শিবানী যখন রোগীর ঘরে গেলেন, দেখলেন ঘরে স্বামী নেই! স্বামী মাঝা গেছেন বুরতে বাকি রইলো না,—কিন্তু কখন মাঝা গেছেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিনা কিছুই তাঁর মনে নেই! তাঁর মনে নেই গতরাত্রির কোনো কথা!

শিবানী ঘরের দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঢ়িয়ে রইলেন, এবং দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা ক'রেও তাঁর মাথায় কিছু চুকলো না। শোক সন্তাপের চেতনা তাঁর আসছে না, আসছে শুধু ছই চোখ ভ'রে গাঢ় নিশ্চিন্ত নিজ্ঞা। যত শীঘ্র সম্ভব স্মান সেরে কোরা ধান কাপড় প'রে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচেন!

দিন পনেরো বাদে কাছুকে সঙ্গে নিয়ে শিবানী চ'লে গেলেন দেওয়ারে। ওরা সবাই রইলো বাড়ীতে। রইলো দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে নীলিমা, রইলো বিকলাঙ্গ ছেলেটা একপাশে। কাছুকে নিয়ে তিনি গিয়ে নামলেন সাঁওতাল পরগনার মাঠে। হেমন্তের আকাশ শিউরে উঠেছে তখন নীলবর্ণ সমারোহে। এ মাঠের হাত্তয়ায় ঔষধের গন্ধ নেই, বিকারের প্রলাপ নেই। আর্তের নৈরাশ্য নিখাস নেই। অথগু অনন্ত মুক্তি মাঠে-ময়দানে। পাশে আছে তাঁর এক কুকুর বালক। হাস্তমুখের, চিত্তচঞ্চল, বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যজ্জল! ও যেন ওই উদার মাঠের অপরিসীম মুক্তির মন্ত্রিটি জানে। ও জানে নবজীবনের সংবাদ, নবতাকণ্যের জয়গান। ওকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান् মাঠে মাঠে।

শিবানীর থাকবার কথা ছিল এখানে দিন পনেরো। কিন্তু প্রায় দেড়মাস তিনি থেকে গেলেন। তারপরে এক টেলিগ্রাম এলো, নীলিমার অস্তিম ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্র এসো।

নীলিমা? মনে প'ড়ে গেল বটে বাড়ীতে আছে কুমা নীলিমা আর বিকলাঙ্গ ঘষ্টি। সেইদিনই শিবানী জিনিসপত্র গুচ্ছিয়ে কাছুকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলায় কলকাতার গড়ীতে উঠলেন।

গড়ী যখন ছাড়বে, গার্ডের দাশী যখন বাজলো,—সহসা তাঁর নাকে এলো সেই কঠিন ঔষধের গন্ধ, সেই বাড়ীর ব্যাধি ও বিকারের গন্ধ। তিনি চঢ় ক'রে কাহুর হাত ধ'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলেন, এবং জিনিসপত্র নিজের হাতেই তাড়াতাড়ি টেনে নামালেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

তিনি না গেলে কীই বা ক্ষতি? মৃত্যুর সামনে তিনি আর নাই বা গিয়ে দাঢ়ালেন।

ବାଟକୀଯ

ଶାଢ଼ୀର ଆଁଚଲଟା କ୍ଷାଦେର ଉପର ଦିକେ ଫିରିଯେ ବଡ଼ ଆୟନାର ସାମନେ ଦାଡ଼ିଯେ ସୁମିତ୍ରା ବଲଲେନ, ମେଘେମାହୁଷେର ସରଲତାୟ ଆମି ବିଶ୍ଵାସ କରିଲେ, ଅପର ପକ୍ଷକେ ମୋହଗ୍ରଣ୍ଠ କରିବାର ଏଟା ଏକଟା ଅନ୍ତ୍ର—

ପାଉଡ଼ାରେ କୌଟୋ ଖୁଲେ ତୁଳିଯା ନିଯେ ତିନି ଗଲାୟ ଆର ଘାଡ଼େ ଏକଟୁ ଆମେଜ ବୁଲିଯେ ନିଲେନ । ଚିରଣୀଟା ଏକବାର ଟେନେ ଦିଲେନ ସିଂଧିର ଛ'ପାଶେ । ଚିକଚିକେ ବିଚାହାର ଛଡ଼ାଟା ଗ୍ରୀବାର ପାଶ ଦିଯେ ଗଲାର ଦିକେ ଏସେ ବ୍ଲାଉସେର ଭିତରେ ନେମେ ଗେଛେ । ତୌରତୀ ପାଥରେର ଛଳ ଛାଇ କାନେ । ଚେହାରାଟା ସ୍ଵନ୍ଦର,— ବୟସଟା ଏଥନ୍ତି ଖୁବ ଅନ୍ଧ ଦେଖାଯା ।

—ଆମି ବିଯେ କରିଲି କେନ ବଲତେ ପାରୋ ? ଜୀବନଟା ଆମିଓ କାଟିଯେ ଦିତେ ପାରତୁମ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ...ସ୍ଵାମୀ, ସଂସାର, ସନ୍ତାନ, ଐଶ୍ୱର୍ୟ—ସା କିଛୁ ଆମାଦେର କାମ୍ୟ । ତବୁ ମାଷ୍ଟାରି କ'ରେଇ ଚିରକାଳ କାଟିଯେ ଦିଲୁମ—

ସୁମିତ୍ରା ଆବାର ଆୟନାର ଭିତରେ ତାକାଲେନ ନିଜେର ଦିକେ । ତାରପର ପୁନରାୟ ବଲଲେନ, ତିରଙ୍କାର ତୋମାକେ ଆମି କରବ ନା, ସୁଧୀରା,—ଉନିଶ କୁଡ଼ି ବହରେର ମେଘେ ତୁମି, ଆମାର କାଛ ଥେକେ ଲେଖାପଡ଼ା ଶିଥେ ତୁମି ପାଶ କରବେ, ତୋମାର ସବ ଖରଚ ଆମି ବହନ କରବ ଏହି ଛିଲ ଆମାର ଆଶା,—କିନ୍ତୁ ଏହି କି ତୋମାର ଆଚରଣ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କ'ରେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

ଏକଟି କୁର୍ରପା ମୋଟାମୋଟା ମେଘେ ଘରେର ଏକାନ୍ତେ ବହି ହାତେ ନିଯେ ନିଃଶବ୍ଦେ ବସେଛିଲ, କିନ୍ତୁ ବ'ସେ ଧାକଲେଓ ତାର ଛାଇ ଗାଲ ବେଯେ ଚୋଥେର ଜଳଓ ନେମେ ଏସେଛିଲ ନିଃଶବ୍ଦେ । ଉତ୍ତର ଦିତେ ଗିଯେ ତାର ମୁଖେର କଥା ଥତିଯେ ଗେଲ ।

ସୁମିତ୍ରା ଏକବାର ଅପାଞ୍ଜେ ସେଇ ଦିକେ ତାକାଲେନ । ଅଧର ଏକଟୁ ନ'ଡେ ଉଠିଲୋ, କିନ୍ତୁ ସେ-ବୋଧ ହୟ ତୌଳ୍କ ଏକଟି ହାସିର ରେଖା ଚେପେ ଘାବାର ଜଣ୍ଠ । ଚୋଥେର ଜଳେର ଆନ୍ତରିକତାୟ ତାର ବିଶ୍ଵାସ ନେଇ । ତାର ଏହି ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଶ ବହର ବୟସେର ଭିତରେ ଅନେକେର ଅଞ୍ଚ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଗେଛେ । ଅଞ୍ଚିତେ ତାର ମନ ବିଗଲିତ ହୟ ନା । ମେଘେଦେର ଅଞ୍ଚର ପିଛନେ ଧାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରତ୍ୟାଶା । ତିନି ବିଶ୍ଵାସ କରେନ ନା ।

প্রবেধ সাঞ্জালের গল্প সংক্ষিপ্ত

বিকৃতমুখে বললেন, দিন দিন তোমার মাথাটার যে-দশা হয়ে উঠলো, দেখতে আমারই লজ্জা করে—চুল আৱ নেই বললেই হয়, যে কগাছা আছে তাও শোনদড়ি। ক্লপ সকলের থাকে না,—স্মিতা আয়নাৰ ভিতৱ্রে চেয়ে বললেন,—যদিও ক্লপটাই মেয়েদের বড় পুঁজি,—কিন্তু নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখবেনা কেন? তোমাকে নিয়ে ভদ্রসমাজে আমি যেতেই পারিনে, তা জানো, স্বধীৱা?

এতক্ষণ পরে সেই ক্লপহীনা মেয়েটি বই থেকে মুখ তুলে তাৱ দুইটি দীৰ্ঘায়ত চোখ মেলে তাকালো। মৃছ কম্পিত কঢ়ে বললে, আমি মনে কৰতুম—

কী মনে কৱতে তুমি? কথা বেরোয় না কেন?

আপনি সাজগোজ পছন্দ কৱেন না, তাই মনে কৰতুম।

এ বাড়ীৰ আশেপাশে দু'একজন প্রতিবেশী আছেন। তাঁৱা না শুনতে পান, সেজন্ত চাপা ঝক্কার তুলে স্মিতা বললেন, সাজগোজ পছন্দ কৱিনে, আৱ লুকিয়ে লুকিয়ে পুৱষেৱ সঙ্গে চিঠি চালাচালি বুঝি আমার খুব পছন্দসই? শ্বাকামি আৱ ক'ৱোনা, স্বধীৱা! ছ'মাস এখনো হয়নি, এৱ মধ্যে বিজনকে নিয়ে তুমি এই কেলেক্ষাৱীটা কৱলে। তুমি জানো, বিজন ইঞ্জিনীয়ৱেৱ চাক্ৰিৱীটা নিয়ে এই মোৱাদাবাদে এসেছিল আমারই সাহায্যে? চাক্ৰিৱ সম্ভান আমিহ তাহাকে দিয়েছিলুম?

স্বধীৱা একবাৱ মুখ তুলে আবাৱ নামিয়ে নিল। কিন্তু ওই একটি মুহূৰ্তেই সে দেখে নিল, স্মিতাৰ হিংস্র চক্ষু দপ দপ ক'ৱে জলছে। উত্তৱ প্ৰত্যুত্তৱ কৱতে তাৱ সাহস হলো না।

—আমাৱ সমস্ত বিশ্বাস তোমৱা নষ্ট ক'ৱে দিয়েছ—স্মিতা বলতে লাগলেন, এই দূৱ দেশে তোমাকে কেউ দেখবাৱ নেই, মা বাপ মৱা মেয়ে তুমি, টাকা পয়সাৱ জোৱ নেই, এখনও একটাৱ পাশ কৱোনি, একজনেৱ আশ্রয়ে আশ্রিত,—কিন্তু তুমি আমাৱ সব বিশ্বাস নষ্ট কৱলে। এজন্তই কি বিজনেৱ সঙ্গে তোমাৱ আলাপ কৱিয়ে দিয়েছিলুম? স্বাধীনতা পেয়েছিলে, ব'লেই কি উচ্ছুল্লাল হ'তে হবে? তোমাদেৱ দু'জনেৱ চিঠিই আমি রেখে দিলুম, কিন্তু এই শেৰবাৱ জানিয়ে দিচ্ছি আমাৱ কাছে এসব চলবে না। এই ব'লে তিনি ছোট ছাতাটা হাতে নিয়ে পায়ে জুতোটা পৱলেন। আৱ তাঁৱ অপেক্ষা কৱাৱ সময় নেই, ইস্কুলেৱ বেলা হয়ে গেছে।

সুধীরা উঠে এলো, এবং তাঁর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে হাত বাড়াতেই সুমিজা একটু স'রে গেলেন। বললেন, থাক, জুতোর ফিতে আজ থেকে আমিই বেঁধে নিতে পারবো। এ দিয়ে আমার মন আর ভোলাতে চেয়ে না, সুধীরা।

জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিয়ে তিনি ঘর থেকে মস মস ক'রে বেরিয়ে গেলেন। সুধীরা ভীতদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। তিনি বি-এ, বি-টি, তিনি সুন্দরী—অহঙ্কার তাঁকে অলঙ্কারের মতই মানায়। নিজের জীবনকে তিনি নিজের হাতেই গড়েছেন। পরাশ্রিতা, মুখ-চাওয়া মেয়ে তিনি নন। তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সুধীরা চেয়ে রইলো।

বাইরে এসে তিনি সোনার ছোট হাত ঘড়িতে দেখলেন, দশটা বেজে পঁচিশ। হাতে সময় নেই, যেতেও হবে অনেকটা পথ। গাড়ী এসেছিল একটু আগে, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাগে তখনও তাঁর শরীর কাপছে বটে, কিন্তু মেয়েটাকে তিরঙ্কার ক'রে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অস্তিত্ব বোধ হচ্ছে। সম্মুখে পথের দিকে বহুরে ধূলিধূসর মাঠ, সেখানে ছায়াহীন রোড যেন তাঁরই জীবনের মতো ধূধূ করছে।

মাঠের পারে কবেকার কোন নবাবী আমলের একটা প্রাসাদের শেষ ভগ্নাবশেষ। সেইদিকে চেয়ে তিনি মনে মনে হিসাব করলেন, সুধীরার আঠারো, আর তাঁর প্রায় একত্রিশ অর্থাৎ তেরো বছর বয়সে তাঁর সন্তান হ'লে সে হোতা সুধীরার মতো। তাঁর ঘোবনকাল প্রায় অন্তিমে এসে দাঢ়িয়েছে। এখন কথায় কথায় তাঁর বুকের ভেতরটায় একটি বাংসল্যের কঠক টন্টন করে, অনেক সময় তাঁর স্নেহের দৃষ্টি কেমন যেন নত হয়ে চলে।

ধৌরে ধৌরে তিনি পথে চলতে লাগলেন। সুধীরার মুখখানাও যেন তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলছে। মেয়েটা অবশ্যই এতক্ষণে কাদতে বসেছে। আজ ছ'মাস ধ'রে তাঁর প্রতি এই মেয়েটির সেবার অন্ত নেই। তাঁকে গল্প প'ড়ে শোনানো, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া, তাঁর টেবল্ গুছিয়ে রাখা, কাপড় জামার তদ্বির করা, মনের মতো আহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, রাত্রে তাঁর পায়ের সেবা ক'রে ঘুম পাড়ানো—মেয়েটা যেন তাঁর গায়ের পোকা। অন্যায় সে অবশ্যই করেছে; তবে যুবতী মেয়ের কাছে প্রগ্রামিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এও ত' নিত্যনৈমিত্তিক। ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা, এতে ত'

পৃথিবীর সর্বনাশ হয়নি, সমাজও উচ্ছেষ্ঠ যায়নি ! তবে কি এই অশান্তি কেবল তাঁরই মনে ঘনে ?

দূরে একটা শুকনো বিলের বাঁক পেরিয়ে যে-একা গাড়ীটি দেখা গিয়েছিল, মাঠের পথ অতিক্রম ক'রে সেটি যে তাঁরই কাছাকাছি এসে পড়েছে, এতক্ষণ তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নি। গাড়ীখানা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঢ়ালো।

—আপনার যে আজ এত বেলা হোলো, মিস্‌বোস ?

সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। মাথার টুপিটা খুলে বিজন পুনরায় বললে, আজ হেঁটে কেন ?

সুমিত্রা বললেন, ইঁটতে বেশ লাগছে।

মিছে কথা—বিজন হাসিমুখে বললে, দুই পায়ে ধূলো মেখে কোন হেড-মিট্রেসেরই এত রোদে ইঁটতে ভালো লাগে না। আস্তুন, আপনাকে মাথায় ক'রে পৌছে দিয়ে আসি।

মুসলমান একাওয়ালা বাঙালা ভাষা বোবে না, তাই রক্ষে। সুমিত্রা একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তার হাসিমুখে বললেন, আজ আমার মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন ? ফন্দীটা কিসের শুনি ?

হো-হো ক'রে বিজন মাঠ-ঘাট কাপিয়ে হেসে উঠলো। বললে, পাঞ্চাকে খুশি না রাখলে ঠাকুর দর্শন হয় না যে।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা মিলিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তার শেষ রেশটুকু অতি কষ্টে রৌজুক্লিষ্ট মুখখানার উপরে জাগিয়ে রেখে তিনি বললেন, আপনার গাড়ীতে আমাকে ইস্তুলে পৌছে দিন।

আস্তুন আস্তুন, আমার সৌভাগ্য !

কিন্তু উঠবো কি ক'রে ?

আমার হাত ধ'রে ?

সুমিত্রা হেসে বললেন, ফেলে দেবেন না ত' ?

ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাত বুঝে নিয়ে বিজন বললে, ধরতে জানলে পড়বেন না, ভয় নেই।

একাগাড়ী চ'ড়ে বিজনের মতো ছেলের সঙ্গে ইস্তুলে গিয়ে পৌছন্ত্য একটু চক্ষুলজ্জা আছে বৈ কি ! গাড়ীতে চ'ড়ে বসবার পর সুমিত্রার এই কথাটা মনে হলো ! কিন্তু গাড়ী ছুটতেই লাগলো, তাঁর সঙ্গেচের

কথা বলাই হলো না। কিছুদূর দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন
এদিকে ?

একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পশ্চিমের মাঠের রোদটা বেশ লাগে।
দিল্লী থেকে একটা সিনেমাপার্টি এসেছে, তারা ছাউনি বাঁধবে কোথায় তাই
দেখতে যাচ্ছিলুম।

সুমিত্রা বললেন, এত বানিয়েও বলতে পারেন আপনারা।

বিজন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কেন ?

ধরক দিয়ে সুমিত্রা বললেন, আপনি যাচ্ছিলেন আমার ওখানে। আপনি
জানতেন এই সময় আমি থাকিনে।

বিজন চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, হয়ত আসবার সময়
সুধীরার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতুম। কিন্তু আপনি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি
আরম্ভ করেছেন।

বাড়াবাড়ি আপনারা করছেন না ?

বিজন বললে, না, সুধীরাকে আমি একটু ভালোবেসেছি এইমাত্র।

কর্ণে একঘলক উত্তাপ ক'রে সুমিত্রা বললেন, এটা যে লজ্জা আর কলঙ্কের
কথা তা আপনি স্বীকার করেন ?

না, মিস্ বোস।

ও। ব'লে সুমিত্রা চুপ ক'রে গেলেন। গাড়ী উচু-নিচু পথে হেলে-হুলে
ছুটে চলছিল। যে পথটা চৌক-এর দিকে গেছে, সেই দিকে গাড়ী বাঁক
নিতেই তিনি নিশাস ফেলে ব'লে উঠলেন, থাক, আজ সুলে আমি
যাবো না।

বিজন মুখ ফিরিয়ে বললে, যাবেন না ? তাহ'লে ?

গাড়ীতেই থাকবো কিছুক্ষণ। অন্ত পথে চলুন।

সে কি ? কোথায় যেতে চান ?

রাগ ক'রে সুমিত্রা বললেন, চুলোয়।

বিজন একাকে আবার মাঠের পথের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে
নির্দেশ দিলে। পরে হেসে বললে, চুলোয় নিয়ে যেতে পারি সুধীরাকে,
আপনাকে নয়।

সুমিত্রা বললেন, আচ্ছা, পুরুষ মাঝেরা কি বুড়ো হয় না ? তিরিশ
বছরেও তারা ছেলে মাঝে থাকে ?

হাসিমুখে বিজন বললে, যারা বারোয় পাকে তারা বজ্রিসে বুড়ো হয়, আর
যারা পঁচিশে পাকে তারা বুড়ো হয় পঞ্চাশে ।

আপনি কেন চিঠি লিখেছেন স্বধীরাকে ?

চিঠি লিখিনি, লিখেছি প্রেমপত্র ।

লজ্জা করে না আপনার ?

আপনার কাছে আবার লজ্জা কিসের ?

স্বমিত্রা বলবেন, আপনি জানেন যে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করিনে ।

বিজন বললে, খুবই স্বাভাবিক । লেখা-পড়া শিখলে বুড়ি কুমারীরা
পুরুষকে ঘৃণা করতে শেখে ।

স্বধীরা আমার আশ্রিত, সেকথাও আপনি মনে রাখবেন ।

সেজন্ত আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।

কৃতজ্ঞ ? অনেক কথা আজকাল বলতে শিখেছেন । কেমন ? বেশ,
আমার বাড়ীতে আপনি আর কোনোদিন যাবেন না ।—ব'লে স্বমিত্রা মুখ
ফিরিয়ে নিলেন । তাঁর সর্বশরীর ভীষণ উত্তেজনায় কাপছিল । তিনি কঠোর
ভাবে চোখের জল চেপে রাইলেন । এমন অপমানজনক কথা তিনি
কোনোদিন কারোকে বলেন নি ।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে বিজন ধরালো । বা'র দুই
জোরে টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কি বললেন ?

স্বমিত্রা উত্তর দিলেন না । গাড়ীখানা ছুটতে ছুটতেই চলতে লাগলো ।
অনেকদূর গিয়ে পকেট থেকে একটি চকোলেট বার করে বিজন মুখে
পুরলো । তারপর সিগারেটে আর একটা টান্ দিয়ে বললে, বেশ, মনে
রাখবো । এই কথা মনে রাখবো যে আপনি নিষেধ করেছেন আপনার
বাড়ী ঘেতে ।

স্বমিত্রা বললেন, না, সেকথা আমি বলিনি । আমি বলেছি, স্বধীরার
সঙ্গে আপনার এই সম্পর্ক আমি স্বীকার করব না ।

হেতু ?

এটা অগ্ন্যায়, এটা অসম্ভব ।

হেতু ?

স্বমিত্রা বললেন, কুমারী মেয়ের মন ভুল পথে গেলে তার জীবনে আর
কোনো উন্নতি হয় না ।

বিজন প্রশ্ন করলে, এই আপনার ধারণা ?

এই আমার বিশ্বাস ।

ও । আপনি কি উন্নতি করেছেন শুনি ?

উত্তরটা স্বীকৃতির মুখে থিয়ে গেল । পথের ধারে ধূলিধূসর ফণীমনসা
আর বাব্লার সারির দিকে চেয়ে নিজের জীবনের চেহারাটা তাঁর নিজের
কাছেই খুব স্পষ্ট মনে হোলো না ! মাসে মাসে প্রায় দেড়শো টাকা তিনি
এই প্রবাস-জীবন থেকে উপার্জন করেন । ব্যাকে এরই মধ্যে তিনি হাজার
পাঁচেক টাকা জমিয়েছেন । অলঙ্কার কিছু আছে । এসব ছাড়া চাকরানী
দাই, গৃহসজ্জা, নাম ডাক, রং-বেরঙের কয়েকখানা শাড়ী, কয়েকজোড়া
জুতো, দামী একটা গ্রামফোন,—এবং বি-এ, বি-টি উপাধি । সমস্ত মিলিয়ে
দেখলে উন্নতি তাঁর কম নয় । কিন্তু তবু বিজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে
এই সব নানাবিধ ঐশ্বর্যের বিশেষ কোনো অর্থ পাওয়া গেল না, এই প্রিয়দর্শন
যুবকের কঠের প্রচ্ছন্ন পরিহাসের কাছে তাঁর সমস্ত সম্পদ একটি মুহূর্তেই যেন
গ্লান হয়ে এলো । উত্তর দিতে তাঁর সাহস হলো না ।

অনেকক্ষণ পরে হেসে বিজন বললে, অবশ্য আপনার বাড়ীতে আর বোধ
হয় আমাকে যেতেও হবেনা—কারণ—

স্তুক হয়ে স্বীকৃতি চলন্ত গাড়ীর একটা খুঁটি 'ধ'রে ব'সে ছিলেন ।
সিগারেটের শেষ অংশটা ফেলে দিয়ে বিজন বললে, আসামের এক ওয়াটার
ওয়ার্কসে বড় চাকুরির জন্যে একটা দরখাস্ত করেছিলুম, তারা ডেকেছে ।
ছুটি নিয়ে আমি কল্কাতায় যাচ্ছি ।

চকিত দৃষ্টিতে স্বীকৃতি তার দিকে তাকালেন । উদ্বেগ চাপতে পারলেন
না, ভৌত চক্ষে চাপাস্বরে বললেন, কবে ?

আজ রাত্রেই যাবার ইচ্ছে ।—এই যে, আপনার বাড়ীর কাছাকাছি এসে
পড়েছি, এবার নামুন ।

গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, আমি নামবো না—এই বলে স্বীকৃতি দৃঢ় হয়ে
চেপে ব'সে রাখলেন । স্তুতরাঙ গাড়ী আবার চললো অন্ত পথে । উপরের
বারান্দায় স্বধৌরা যদি দাঢ়িয়ে থাকে, তবে তাদের নিচয় দেখেছে । কিন্তু
সেদিকে জক্ষেপ করার সময় স্বীকৃতির ছিল না ।

আজ রাত্রে আপনি কল্কাতায় যাবেন, কই আগে বলেননি কেন ?

বিজন বললে, স্বধৌরা আপনাকে বলেননি ?

ଶୁଧୀରା !—ଶୁମିତ୍ରା ବଲଲେନ, ଶୁଧୀରା ଅମୁଗ୍ରହ କ'ରେ ଆମାକେ ଆପନାର ସଂବାଦ ଦେବେ ଆର ତାଇ ଆମାକେ ଶୁଣନ୍ତେ ହବେ ?

ପରିଷକାର ସହୃଜ ଗଲାଯ ବିଜନ ବଲଲେ, ତାକେଓ ଯେ ନିଯେ ସାବୋ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ।
କି ବଲଲେନ ?

ଆମତୀ ଶୁଧୀରା ଦେବୀ ଆମାର ସହ୍ୟାତ୍ମୀ ହବେନ ।

ଏ କଥା କେ ବଲେଛେ ଆପନାକେ ?

ବିଜନ ବଲଲେ, ଆମିହି ବଲେଛି, ଆମାରହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

ଆମି ସଦି ଘେତେ ନା ଦିଇ ?—ଶୁମିତ୍ରା ବଲଲେନ ।

ଘେତେ ନା ଦିଲେ ସାବାଲକ ଏବଂ ସାବାଲିକା ନିଜେଦେର ପାଯେ ହେଟେଇ ସାବେ ।
ପ୍ରୟୋଜନ ହ'ଲେ ମହାମାନ୍ତ ରାଜସରକାର ବାହାତୁର ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ ।

ଶୁମିତ୍ରା ଇହାକ ଦିଲେନ, ଏହି ଗାଡ଼ୋଯାନ, ଏକକା ଯୁମାଲେଓ ?
ଏକକା ଥାମଲୋ । ବିଜନ ବଲଲେ, ବାଡ଼ୀ ଘେତେ ଚାନ ?
ଇହା ।

ଗାଡ଼ୀ ଯୁରେ ଆବାର ବାସାର ଦିକେ ଚଲଲୋ । ଶୁମିତ୍ରା କଠୋର କଠେ ବଲଲେନ,
ଆମି ଆପନାର ସାମନେଇ ଶୁଧୀରାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରବ, ସେ ଆମାକେ ଏମନ
ଅପସଥର ମଧ୍ୟେ ଡୁବିଯେ ଯାଚେ କେନ ।

ବିଜନ ବଲଲେ, ସେ କୌଦବେ କିନ୍ତୁ ଆପନାର ପ୍ରଶ୍ନର ଜ୍ବାବ ଦେବେ ନା ।

ତିକ୍ତକଠେ ଶୁମିତ୍ରା ବଲଲେନ, ମେଯେମାହୁଷେର କାନ୍ଦା ! ତାଦେର କାନ୍ଦାର ପେଛନେଓ
ଥାକେ ହୀନ ସତ୍ୟନ୍ଦ୍ର । ଚୋଥେ ତାରଓ ଜଳ ଆସତେ ଚାଇଲୋ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦମନ
କରଲେନ ।

ବିଜନ ଧଲଲେ, ସତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଏକା ହୟ ନା ମିସ୍ ବୋସ, ଆମିଓ ତାର ମଧ୍ୟେ ଆଛି ।
ଯେ ଜାଲାଟା ଶୁମିତ୍ରା ଏତକ୍ଷଣ ଚେପେ ଛିଲେନ, ମେଟି ଏବାର ଫମ କରେ ତାର ମୁଖ
ଦିଯେ ବେରିଯେ ଗେଲ । ମୁଖେର ଏକଟା ଶକ୍ତ କରେ ବଲଲେନ, ସେମନ ତାର କଦାକାର
ରୂପ, ତେମନି ଆପନାର କର୍ମ୍ୟ ଝାଚି ।

ବିଜନ ହୋ ହୋ ଶବ୍ଦେ ହେସେ ଉଠିଲୋ । ଗାଡ଼ୀ ଏମେ ଶୁମିତ୍ରାର ବାସାର କାହେ
ଦୀଢ଼ାଲୋ । ଛୁଜନେ ନେମେ ଏଲେନ । ଦରଜାର କାହେ ଦୀଢ଼ିଯେ ବିଜନ ବଲଲେ,
ଭେତରେ ଆମି ସାବୋ ନା, ଏହି ଗାଡ଼ୀତେଇ ଆମାକେ ଫିରେ ଘେତେ ହବେ । ଆପନି
ଶୁଧୀରାକେ ଡାକୁନ ଏହିଥାନେ ।

କର୍ମ ଚକ୍ର ଚେଯେ ଶୁମିତ୍ରା ବଲଲେନ, ସାବାର ଦିମେ ଆମାକେ ଏହିଭାବେ ଅପମାନ
କରେ ଘେତେ ଚାନ ?

অপমান ত' করিনি, আপনার নিষেধ অঙ্গসারেই আপনার বাড়ীতে
চুকবো না।

কিন্তু এই বাক্বিতগুর মধ্যে নিরূপায় মেয়েমাঝুষ কথন যে আপন
অবচেতনাতেই নিজের পথটা খুঁজে নিয়েছে তা বলা কঠিন। এই ঘোষন-
প্রান্তবর্তিনী নারী সহসা আপনার সমস্ত অঙ্গিকা ভুলে গিয়ে সহসা কাছে
এসে শ্বলিতকণ্ঠে বললে, গাড়োয়ানের সামনে আমাকে পায়ে ধরাবেন ?

বিজন একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো, তারপর এগিয়ে গিয়ে
গাড়োয়ানকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে এসে বললে, চলুন।

বেলা মধ্যাহ্নে উত্তীর্ণ। শুধীরার কোনো সাড়াশব্দই নেই। চাকুরাণী
চলে গেছে, দাই বোধ করি কোথায় যুমিয়ে আছে। এই হিন্দুস্থানী প্র্যানের
বাসার নৌচের পথটা অঙ্ককার। সেই ঘাতায়াতের পথটা দিয়ে পার হবার
সময় শুমিত্রা সহসা বিজনের হাতখানা ধরলেন।

বললেন, কেন ছেলেমাঝুষী করছেন ? আমি নিয়ে যেতে দেবো না
শুধীরাকে।

বিজন বললে, সত্যি বল্ব আপনাকে ? ওঁকে না নিয়ে গেলেই আমার
চলবে না।

আমি যদি সমস্ত বাঙালীদের জড়ে করে আপনার এই অনাচারের কথা
বলি ?

তাতে কি আপনার নিজের কথাও ঢাকা থাকবে ?

কি বলছেন ?

বিজন বললে, এত অত্যাচার আপনি এই কঘমাস ধরে আরম্ভ করেছেন
যে, এর একমাত্র জবাব শুধীরাকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া।
মিস্ বোস, আমার প্রতি আপনার যত স্বেহই থাকুক, আপনি বিকৃত আদর্শের
দোহাই দিয়ে বহু মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন।

চাপাগলায় শুমিত্রা বললেন, তার মানে ?

তার মানে, তথাকথিত স্বাধীনতার নাম করে আপনি মেয়েদের স্বত্ত্বাবধি
বিষাক্ত করতে চান। আপনার কাছে থেকে তারা সংযম শেখে বটে কিন্তু
সংশিক্ষা হারায়।

শুমিত্রার গলা কেঁপে উঠলো। বললে, সব আমি মানলুম, কিন্তু আপনি
চলে যাবেন কেন দেশ ছেড়ে ?

উত্তেজিত হয়ে বিজন বললে, আপনার নাগপাশ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই, স্বধীরাকেও বাঁচাতে চাই।

কম্পিত অধীর কঠে স্বমিত্রা বললেন, ভগবান যাকে কোনো কিছুই দেননি তার কাছে আপনি এমন কী ঐশ্বর্য পেলেন যাকে নিয়ে সব ছেড়ে যেতেও আপনি প্রস্তুত ?

পুরুষ না হলে সেকথা বলা যায় না, মিস্‌বোস।

এ বাড়ীতে কি আপনার জন্তে কিছুই ছিল না ? স্বধীরা আপনার কে ? স্বমিত্রার কন্ধ কণ্ঠস্বর কণ্ঠনালীর মধ্যে বন্ধ হয়ে এলো।

বিজন একটু থেমে বললে, উনি যেই হোন, আর যেমনই হোন, আমি তাঁকে বিয়ে করব। বিদেশে যাবার সময় উনি আমার সঙ্গে যাবেন। আপনি যদি না ছেড়ে দেন, জোর করে নিয়ে যাবো। এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু এর পরেও যে কথা ছিল তা বিজন ভেবে দেখেনি। ভগবান যাকে কিছু দেননি সে অনেক সময় ঐশ্বর্য পায় বটে, কিন্তু সব থেকেও যার কিছু নেই, সে আশ্রয় পাবে কোন আঘাটায় ? পুরুষের বিচার কি তাদের পরে এতই অকরূণ ?

চোখের জলে চারিদিক অঙ্ককার হয়ে এসেছিল। সহসা সেই গলিপথের ধারে নিরূপায় সেই বি-এ, বি-টি হেডমিস্ট্রেস বিজনের পায়ের কাছে বসে পড়ে ভগ্নকঠে বললেন, তোমরা নিজেদের কথাই ভাবলে, কিন্তু আমি যাবো কোথায় ? তুমি যা খুশি তাই করো, বাধা দেবো না। কেবল আমাকে তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে দাও।

বিজন স্তুক হয়ে কিছুক্ষণ দাঢ়ালো, তারপর চারিদিক একবার চেয়ে সম্মেহে তাঁকে তুলে ধরে বললে, আচ্ছা, কথা দিলুম, কোথাও যাবো না।

সেই পুরাতন

যতদূর মনে পড়ছে হরিপদের অবস্থা প্রথম দিকে একটু ভালোই ছিল। লোহার কারখানায় যারা চাকরি করে, দিন-মজুরিই তাদের সম্বল—কিন্তু হরিপদ ওদের মধ্যে টাকাকড়ি কিছু জমিয়ে অনেকটা স্বয়েগ স্ববিধে ক'রে নিয়েছিল বৈকি।

লোহার কারখানায় ইলেকট্রিক যন্ত্রের চক্রান্ত নিয়ে কালিবুলি মেথে ঘার দিন কাটে—সে একটু নেশা ভাঙ্গ করে—এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। কিন্তু হরিপদ যেদিন হঠাত বিয়ে ক'রে বসলো সেদিন সবাই একেবাবে অবাক। বিয়ে ক'রে ঘর চালাবার ক্ষমতা হয়ত তার ছিল,—কিন্তু এমন সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা পাত্রী সে কোথা থেকে নিয়ে এলো, এই ছিল সকলের কাছেই বিস্ময়। অনেকে তামাসা ক'রে বললে, এমন ষণ্মার্কা চেহারা তোর—মেঝেটাকে চুরি ক'রে আনিসন্নি ত'বে?

হরিপদ অহঙ্কার প্রকাশ ক'রে বললে, সাতপাক ঘুরে মালাটি বদলে তবে ঘরে এনেছি বাবা—হে হে—

তোকে মেঘে দিল? মেঝেটির গলায় দড়ি জুটলো না?

হরিপদ বললে, বীরভোগ্যা বস্তুরা! আমি ত' একটা পুরুষ বটে,—কারো চেয়ে কম নই, মনে রেখো।

সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা—কারখানার সামান্য মজুরের পক্ষে এমন কবে কা'র ঘটেছে? প্রায়ই ছুটির দিনে দেখা যায় তেলকালি মাথা হরিপদ হঠাত যেন মন্ত্রবলে নব কলেবর ধারণ করেছে। পরনে তার ফিনফিনে ধূতি, গায়ে আদ্বির পাঞ্চাবী, পায়ে চকচকে তুন জুতো, মাথায় ফুলেল তেলের গন্ধ—হরিপদ স্ত্রীকে নিয়ে মধ্যে মাঝে কার্নিভ্যালেও যায়, এবং সেখানে চার আনা আট আনা জুয়া খেলেও সংগীরবে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসে। বস্তুরা ইর্ষ্যান্বিত হয়ে হরিপদের দিকে চেয়ে থাকে। হরিপদের জীবন-নদীতে যেন জোয়ার এসেছে। কেউ কেউ বললে, বেশ, খুব ভালো হরিপদ, তুই সংসারী হলি, তোর বদখেয়ালগুলো কমলো—এ তোর বউয়ের গুণ, বউ তোর সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! অনেক ভাগ্য তোর।

হরিপদ বললে, যেমন তেমন মেঘে বিয়ে করিনি, বুঝলি—বাপের এক মেঘে, হাতে মোটা টাকা আছে।

কিছুকালু চ'লে গেল। দেখা যাচ্ছে হরিপদর পোষাক-আসাকে আর তেমন জেঁসা নেই। তার মেজাজটাও কিছু ক্লক্ষ। অনেকে বুঝে নিল, হরিপদ এতদিনে মোটামুটি টাকা জমিয়েছে, নৈলে পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্কে এমন কৃপণ হোলো সে কেন! আর তা-ছাড়া লোকটার হাতে টাকা হয়েছে বলেই মেজাজটা এত গরম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্তর্কল্প। হরিপদর পক্ষে বিয়ে করাটা বরং সইলো, কিন্তু সংসারী হওয়াটা সইচে না। বিয়ের প্রথম দিকটা কাটলো নেশায়—কারণ স্ত্রীলোকের স্নেহের আস্থাদটা তার পক্ষে নতুন। কিন্তু এর পিছনে সাংসারিক দায়িত্ব আর কর্তব্যের চেহারাটা দেখে তার মন বিগড়ে গেল। হরিপদ ভাবলো, ভালো রে ভালো, দিব্য নেশা ক'রে জুয়া খেলে, হাতুড়ি পিটে আর কল ঘূরিয়ে আমার স্বর্ণের জীবন কাটছিল, এ আবার কোন্ নতুন উৎপাত এসে জুটলো? এ আমি বরদান্ত করতে পারবো না।

তার স্ত্রী স্বহাসিনী কোমল প্রকৃতির মেঘে। হরিপদর চেয়ে যোগ্যপাত্রের হাতে সে পড়তে পারতো, কিন্তু এ-নিয়ে তার কোনো ক্ষেত্রে নেই, সে আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত। হরিপদ বললে, আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে বাগানে ঘাবো, টাকা দাও। স্বহাসিনী তখনই টাকা বা'র ক'রে দেয়। হরিপদ বললে, আজ ভালো রেস্ আছে, টাকা দাও। স্বহাসিনী তখনই হাতের একগাছা বালা খুলে দিয়ে বললে, নগদ টাকা ত' নেই, বালা বাধা দিয়ে টাকা নাওগে।

স্বহাসিনী কোনো দিন স্বামীর উচ্ছুজ্জ্বলতার প্রতিবাদ করে নি। জানে প্রতিবাদ মিথ্যে। দুরন্ত পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন ছোটে তখন বাধা দিতে গেলে নিজেকে চূর্ণ হ'তে হয়। স্বহাসিনী কেবল স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। মনে মনে বলে স্বামী ঘেমনই হোক, তা'র নিজের ভালোবাসা মিথ্যে নয়,—ভগবান যেন তাকে কোনো দিন তেমন সংশয়ের মধ্যে না ফেলেন।

তাদের বিয়ের বছর-হই পরে একটি ছেলে হোলো এবং মেই ছেলে সম্পত্তি একটু বড়ও হয়েছে। হরিপদ তা'র পুরনো দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে এসেছে। হ'বেলা ভাত অবিশ্বিত জোটে, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক উপকৰণ

জোটে না। পরনে তার সেই হেড়া হাফপ্যান্ট, গায়ে হাতকাটা ময়লা শাট। কাজ করে সে অঙ্গান্ত, মজুরী তঁথেবচ। নেশাটা বরাবরই আছে, তা'র সঙ্গে আরো কিছু আপত্তিজনক গতিবিধি। এদিকে স্বহাসিনীর স্বাস্থ্য ভেঙেছে, গায়ে একটি অলঙ্কারও নেই, একটি পরিচ্ছব্দ জামার অভাব—ছোট ছেলেটার দুধের পয়সা জোটে না। হরিপদ মাঝে মাঝে আসে, স্বহাসিনীর প্রতি জুলুম করে, হাতের কাছে যা পাঘ—বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে' সেই পয়সায় ঘোড়দোড়ের বাজী খেলে আসে। প্রেমের ঘোড়া উইন্-এ ধরে, এবং সর্বস্বান্ত হয়ে আবার বন্ধুদের নেশার খোয়াড়ে গিয়ে ঢোকে। বন্ধুরা বলে, চক্রকে বউ পেরে ক'দিনের জন্যে নবাবী করতে গেলি, আবার সেই পুরনো জীবনে ফিরতে হোলো ত' ? ওরে ভাই, আমরা জন্মেছি পাপ করার জন্যে, ওসব কি আমাদের সয় ?

ঠিক বলেছিস।—ব'লে হরিপদ আবার ময়লা তাস তাঁজতে থাকে।

কিন্তু দেখতে দেখতে হরিপদ আরো নৌচের দিকে নেমে গেল। স্বহাসিনী তা'র হাতে অহেতুক অপমান আৱ উৎপীড়ন সইতে লাগলো, কিন্তু একদিনও প্রতিবাদ কৱলো না। ছেলেটাও বড় হ'তে লাগলো—অনাচার, নিষ্ঠুরতা, অশিক্ষা আৱ দারিদ্র্যের ভিতৰে। এদিকে হরিপদৰ বৰ্বৰতা রাশ খুলে হৃদয়হীন উগ্রাদনায় চারিদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগলো।

এমনি ক'রে পরিণামে যা ঘটলো তা খুবই সাধাৰণ। আত্মবিস্মৃত হরিপদ একদিন কাৱখানা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থেকে সহসা সে রক্তচক্ষে উঠে দাঢ়িয়ে স্তৰীকে বললে, লোকে বলে তুই লজ্জামন্ত্র বউ ? মিছে কথা। তোৱ জন্যেই আমাৱ যত সর্বনাশ। বেৱো তুই বাড়ি থেকে। দূৰ হ—

সেদিন ছেলেটার হাত ধ'ৰে স্বহাসিনীকে পথে নামতে হোলো। হৃদয়হীন স্বামীকে সে ধিক্কার দিল না, চোখেৰ জল ফেলেও একথা বললে না, এ অন্ত্যায়, এ পাপ ! নিঙ্কপায় নাৱী কেবল মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে পথেৱ একদিকে চলতে লাগলো।

হরিপদ তাৱ স্তৰী ও পুত্ৰেৰ দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, ইঁয়া, ঠিক হয়েছে, কিছুই অন্ত্যায় কৱিনি। ওৱা না বিদেয় হ'লে আমাৱ কোনো উন্নতি নেই। এবাৱ বাঁচলুম।—এই ব'লে সে অবাৱিত উচ্ছুলতায় আবাৱ ফিরে গেল।

মাঝে মাঝে একটি অবোধ বালকের ক্ষুধার্ত একখানি মুখ আরণ ক'রে সে অস্তিত্ব বোধ করতো বটে, কিন্তু তাও একদিন ঝাপ্সা হয়ে এলো !

ভালো মিঞ্জি হিসেবে হরিপদর খ্যাতি ছিল, স্বতরাং বরাতক্রমে হঠাৎ তার একটা ভালো কাজ জুটে গেল। মাইনেটা আগের চেয়ে বেশী এবং সেজন্মে হরিপদর উপাস আর ধরে না। সংসারের দায়িত্ব আর নেই, স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াতে হয় না—অতএব সমস্ত টাকাটা সে অবাধে খরচ করতে পায়। স্বহাসিনী অথবা তা'র ছেলের কোনো খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না, মাতা পুত্র এই পৃথিবীর বিরাট লোকযাত্রার ভিতরে কোথায় তলিয়ে গেছে,—কোনো সন্ধান তা'র নেই। সেই অলঙ্কণা বৌ আর অভিশপ্ত পুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হরিপদ এ যাত্রা বেঁচে গেল বৈ কি !

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে।

স্বহাসিনী তার ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য আন্তীয়পরিজন ও পরিচিত মহলের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেবলে সে অনেক, দুঃখ পেয়েছে তার চেয়েও বেশী—কিন্তু তবু তা'র সিঁথির সিদ্ধুরটি উজ্জল হয়ে রয়েছে। ঠাকুর দেবতার মন্দিরে মানু করেছে, ভিক্ষে ক'রে ছেলের মুখে অম্ব জুটিয়েছে—কিন্তু এ-কথা বলেনি, জীবনটা তার এবারের মতো ব্যর্থ হয়ে গেল। বরং তা'র বিশ্বাস দুঃখটা নাকি তার সার্থক হয়েছে ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তোলার কঠোর তপস্থায়। এমন অস্তুত মনোভাব কেবল হিন্দুনারীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব।

কিন্তু এমনি তপস্থায় ক্রমে ক্রমে স্বহাসিনীর অকাল বাধ্যক্য দেখা দিল ! কুলকিনারা নেই কোনো দিকে—তখন সে উপার্জনের পথ ভাবতে লাগলো। অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের গুণে সে সেলাই আর ডিজাইনের কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। বাঙলা দেশের বাইরে কাশী শহরের এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে একখানি ঘর নিয়ে স্বহাসিনী কোনো মতে চলতে লাগলো। ছেলেটার বয়স তখন পনেরো !

মায়ের সে খুবই বাধ্য, লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু পৈতৃক প্রবৃত্তিটা সে উত্তরাধিকারস্থলে পেয়েছিল। জুয়া খেলতো সে লুকিয়ে, রানিং ফ্লাস খেলতো গোপন স্বড়জ পথে বন্ধুদের আড়ায়। বাজি ধরতো সে খুব

ভালো, যেন সে জন্ম থেকেই জয়তিলক প'রে এসেছিল কপালে। এক একদিন হই পকেট তা'র ভরে যেতো টাকা পয়সায়। আজ্ঞার পর রাত্রে ঘরে ফিরে দেখতো, টিমটিমে আলো জেলে তা'র মা জানলার ধারে ব'সে একমনে মহাভারত পড়ছে। ঠান্ডের আলো হয়ত এসে পড়েছে মায়ের কপালে, এবং অদূরবর্তী গঙ্গার হাওয়ায় কুকু চুলগুলি উড়ছে। তার মনে হোতো, মা যেন তা'র ঋষিকণ্ঠা ! সে অপরাধীর মতন অন্তর্ভু চ'লে যেতো। মায়ের কাছে সে অন্যায় উপার্জনের কথা বলতে সাহস করতো না।

সহসা একদিন রাত্রে অঙ্ককার গলির পথে ছেলের আর্তনাদ শুনে স্বহাসিনী ঝাঁৎকে উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, দরজার ধারে তা'র ছেলে প'ড়ে গো গো করছে—সর্বাঙ্গ দিয়ে তা'র রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে ছেলে একবার বলে উঠলো—মা, গুণ্ডারা আমার পিঠে ছুরি মেরেছে। আমি—আমি বোধ হয় বাঁচবো না।

স্বহাসিনী ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। ছুরির আঘাত তা'র পিঠের শিরদীঢ়া ভেদ ক'রে ভিতর অবধি চ'লে গেছে। প্রাণের আশা কম।

হতভাগিনী নারীর চোখে সেদিন জল এলো না। সমবেদনা জানাবার মানুষ নেই, চোখের জল কেন তা'র পড়বে ? শীতকালের সেই ভয়াবহ দীর্ঘ রাত তা'র কাটলো, সকাল বেলায় ছুটলো সে ইঁস্পাতালে খবর দিতে। উন্মাদিনীর মতন সে ছুটে চলেছে, এমন সময় সহসা তা'র চোখে পড়লো, একজন ব্যাধিগ্রস্ত কদাকার ব্যক্তি তা'র দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রয়েছে। একখানা হাত তা'র কাটা। স্বহাসিনী চিনলো, এ তা'র স্বামী—হরিপদ। ক্ষণকালের জন্য স্বহাসিনী পাথরের পুতুলের মতন থমকে দাঢ়ালো।

সে আবার পা বাঢ়াবে এমন সময় হরিপদ এগিয়ে এসে বললে, বৈ, দাঢ়াও। আমি তোমাকে অনেক দিন ধ'রে খুঁজছি।

স্বহাসিনী প্রথমটা শিউরে উঠেছিল। কিন্তু আগে কে কান্দবে ঠিক বুঝা গেল না। সহসা হরিপদই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে তা'র পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো—বৈ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই।

হরিপদের কাটা হাতখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্বহাসিনী এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাউ হাউ ক'রে সে কেঁদে উঠলো। বললে, ওগো, শিগ্গির চলো, কালু বোধ হয় আর বাঁচবে না।

হরিপদ তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, এক পা তা'র খোড়া। স্তুরির কাধের
ওপর একখানা মাত্র হাতের ভর দিয়ে দৃষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত হরিপদ কোনমতে বাসায়
এসে পৌছলো। কিন্তু এসে দেখলো, ইতিমধ্যে অশেষ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত
ক'রে তাদের ছেলেটির মৃত্যু ঘটেছে।

হজনে স্তুর ও নীরব। এক সময় হরিপদ ধরা গলায় ডাকলো, বৈ ?
সুহাসিনী তা'র অসাড় মুখ তুললো স্বামীর দিকে।

হরিপদ বললে, কালু মরেছে আমার জন্যে। এ শাস্তি তোমার নয়,
আমার। ছেলের রক্তে আমার সব পাপ যেন ধূয়ে যায় !

জড়িত ক'গে সুহাসিনী মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে বললে, এ কি আমি
সহিতে পারবো ?

হরিপদ ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিল। বললে, পারবে বৈ,
নিশ্চয় পারবে—আমি জানি মরণকে তুমি জয় করবে, তুমি যে মহাশক্তি।
চলো, আমরা অনেক দূরে অন্ত কোথাও চ'লে যাই।

মৃদুকর্ষে সুহাসিনী কেবল বললে, তাই চলো।

କୁଡ଼

ଶ୍ରୀଅମ୍ବକାଳେର ସନ୍ଧ୍ୟା ହତେ ବିଲନ୍ଧି ହୟ ।

ଆକାଶେର ଏକଦିକେ ଅନ୍ତଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତରଶ୍ମି ତଥନ୍ତି ଏକେବାରେ ମିଲିଯେ ଯାଇନି । କିନ୍ତୁ ତାରଇ ଅପର ଦିକେ ଈଶାନେର ପର୍ବତପ୍ରମାଣ କୁଷଙ୍କାଯ ମେଘ ଯୁଦ୍ଧଧାତ୍ରୀର ସେନାପତିର ମତ ସମ୍ମନ ଆକାଶେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଆସଛିଲ । ଆସନ୍ତ ଝଡ଼େର ଏକଟି ଇଞ୍ଜିତ ପେଯେ ସବାଟ ଇତିମଧ୍ୟେ ଏକଟୁଖାନି ସନ୍ଧର୍ଷ ହୟେ ଉଠେଛେ ।

ପୁରାଣଦହେର ମାଠେ କଯେକଟା ଶୁକନୋ ଖେଜୁରଗାଛ ଯେଥାନେ ଏକଟା ଜଟଳା କରେଛେ, ତାଦେରଇ ମାଥାଯ କାଳୋମେଘେର ଛାୟା ପଡ଼େଛିଲ । ପାତାଗୁଲି ଦୁଲେ' ଦୁଲେ' ଝଡ଼େର ଶୁଚନା ଜାନାଛେ । ତାରପର ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଧୂଲୋ ଉଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରଲ, ସାଦା ବକେର ସାରି ଅନ୍ଧକାର ମେଘେର ନୀଚେ ଦିଯେ ଅଞ୍ଚପ୍ରତି ଡାନାର ଶବ୍ଦ କରେ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଲାଗଲ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ-ତମ୍ଭୁ ନଦୀର ଓପର ନେମେ ଏଇ ଧୀର-ଛାୟା । ଆଭାସ ଦେଖେ ମନେ ହଛେ, ଭୟାନକ ଏକଟା ଝଡ଼ ଉଠିତେ ଆର ହୟତ ସତିଯିଇ ଦେଇଁ ନେଇ ।

ପଶ୍ଚିମେର ଲାଲିତ୍ୟଟୁକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୟେ ମୁଛେ ଯେତେଇ ପ୍ରସନ୍ନକୁମାର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବାସାର ଦିକେ ଚଲିତେ ଲାଗଲ । ନତୁନ ଜାୟଗା, ଝଡ଼ି ଉଠିଛେ, ବାସାୟ ମଲିନାଓ ଆଛେ ଏକା—ଦେଇଁ କରେ ଆଜ କାଜ ନେଇ ।

ପଥ ବେଶୀ ଦୂର ନୟ । ଛୋଟ ଏକତଳା ବାଡ଼ୀର ଦରଜା ଠେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏସେ ଭେତରେ ଢୁକ୍ଲୋ । ପ୍ରସନ୍ନକୁମାର ଯୁବକ, କିନ୍ତୁ ଏକଟି ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଔଦ୍ଦାସୀନ୍ଧ୍ୱ ତାକେ ଯୁବାର ଚୟେ ପ୍ରୌଢ଼େର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଦିଯେଇଛେ । ସେ କଥନ୍ ବାଡ଼ୀ ଥେକେ ବେରୋଯ ତା ତାର ମନେ ଥାକେ ନା, କଥନ ବାଡ଼ୀତେ ଏସେ ଚୋକେ ତାଓ ସେ ଭୁଲେ ଯାଯ । ତରକାରୀ ଲବଣ୍ୟ ନା ହଲେ ତାକେ ଭାବତେ ହୟ ତରକାରୀର ମଧ୍ୟେ ଅଭାବଟା କି ।

—ଓ, ଏହି ଯେ ମଲିନା । ଏକଟୁଗାନି ଥମକେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆବାର ବଲ୍ଲ—ଆଛା, ବାହିରେର ଦରଜାଟା ଖୋଲାଇ ରେଖେଇଲେ ?

—ଖୋଲା ? କହି ଖୋଲା ତ ଛିଲ ନା । କହି ଦେଖେ ଆସି ତ' ।

—ଥାକ୍, ଖୋଲା ଯଦି ନା ଥାକବେ ଏଲାମ କି କରେ ?

ମଲିନା ମୁଖ ନା ତୁଲେ ଅନ୍ତଦିକେ ସରେ ଗେଲ । ଯେ ଜାନ୍ମାଟା ବନ୍ଧ, ସେଇଥାନେ ସରେ' ଗିଯେ ଦୀଡାଲ । ପ୍ରସନ୍ନ ଗାୟେର ଜାମାଟା ଛାଡ଼ିଲ—ବୋଧ-ହୟ ତାର ଗରମ

হচ্ছে। সেটা ছেড়ে যত্ন কৱে' হকেৱ ওপৱ টাঙিয়ে দিয়ে বল্ল—এ বাস্টা
কেমন লাগছে মলিনা, বেশ স্ববিধে হচ্ছে ত সব দিকে?

বোৰা গেল মলিনা ঘাড় নেড়েছে।

আচ্ছা, আমি যখন এসে চুকলাম তখন পায়েৱ শব্দ হয়েছিল?

মলিনা এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ তুলে বল্ল, কাৱ?

—চমকে উঠলে কেন? আমাৱ কথাই বলছি। তাৱপৱ মুখ ফিরিয়ে
জান্লাৱ বাইৱে তাকিয়ে প্ৰসন্ন বল্ল, এইবাৱ ঝড় উঠবে, আৱ দেৱী নেই।
আচ্ছা দেখেছ জটাজুট কালো মাথাৱ চুড়ো? কি বিৱাট বিপুল! আমি
তাই দেখেছিলাম মলিনা—এক হাতে শৰ্ক আৱ এক হাতে ঝড়েৱ দণ্ড, কোলে
বিহৃৎমণি। মলিনা, ঘৱেৱ ভেতৱটা এমন এলোমেলো হল কেমন কৱে?
এমন অগোছালো ত আমাৱ বেৱোৰাৱ সময় ছিল না।

ভৌত দৃষ্টিতে মলিনা চাৱিদিকে তাকাতে লাগল।

—অনেক ঘূৰলাম তোমাকে নিয়ে, কি বল? জলপাইগুড়ি, কাশী,
আগৱা, জয়পুৱ। এখানে এসে বোধ হয় তোমাৱ সব চেয়ে ভাল
লাগছে নয়?

—কি বলছেন আপনি?

—কিছুই না, শুধু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমাৱ ভাল লাগছে কি না।

মলিনা আৱ কিছুই বলল না। প্ৰসন্ন বলল—আচ্ছা বাস্টা ওখান থেকে
সৱে গেল কি কৱে' বল ত?

আমি সৱিয়েছিলাম।

তুমি? ঠিক মনে আছে? আমি সৱাইনি?

থৱ থৱ কৱে মলিনা কেঁপে উঠল। অস্ফুট কঢ়ে শুধু বলল, আমিই ত!

—ও; ভাৱছিলাম আমিই বুঝি কাপড় বা'ৱ কৱে ওখানেই রেখে গেছি!
বাইৱে মেঘেৱ গৰ্জন শোনা গেল। একটি ব্যাকুল উত্তেজনা আকাশে
আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্ৰসন্ন তাড়াতাড়ি জান্লা-দৱজা সমস্ত
খুলে দিল।

মলিনা স্তুতি হয়ে দাঙিয়েছিল। হাসতে হাসতে প্ৰসন্ন বলল—লোকেৱ
কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে গেলাম। যে-মেঘেৱ মাথায় পিঁছুৱ নেই তাকে
নিয়ে দেশ ঘোৱা—অবশ্য আমৱা কিছুই গ্ৰাহ কৱিনে। তবুও মাৰে মাৰে
মুক্তি বাধে বৈকি। আচ্ছা মলিনা?

মলিনা মুখ তুল্লো ।

—তোমার শরীর কি ভাল নেই ? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে
দেখে—

—কি ?

মেঘের গর্জনের সঙ্গে বিহ্যতের আলো দুজনকে চমকে দিয়ে
মিলিয়ে গেল ।

—না কিছু না,—আচ্ছা, এর আগে কি ঝড় হয়ে গিয়েছিল ? তুমি কি
তখন ছাতের ওপর ছিলে ? ছিলে না ?

—না ।

—ঘরের মধ্যেই ? ও ।

কয়েকটি মুহূর্তের অতল নিঃশব্দতা হয়ত দুজনেই একবার অনুভব করে
নিল । তারপর ধৌরে ধৌরে একটা হাত দেওয়ালের ওপর তুলে দিয়ে প্রস্তু
বল্ল—আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করে তুমি বোধ হয়
খুশী হয়েছ ? হওনি ? থাক থাক, এক কথায় জবাব মুখে না আসে ত
আমার কথা এড়িয়ে যেও ।—কিন্তু আমার হাসি পাছে তোমাকে দেখে ।
তুমি যেন ঠিক আদালতের মধ্যে অপরাধীর মতন দাঢ়িয়ে । কেন ?
কি হল ? আমাকে লজ্জা দিও না মলিনা ! আমার জন্যে পাশের ঘর ত'
বেশ গুছিয়ে রেখেছ, কিন্তু তোমার ঘরের এ কি চেহারা বলত ? বিছানাটার
ও রকম অবস্থা কে করলে ?

মলিনার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ।

কি আশ্রয়, মাথার চুলের কি ছিরি হয়েছে দেখ দেখি ? ঝাঁচ ডাওনি
বুঝি ? আমি বেরিয়ে যাবার পর এতক্ষণ—

মলিনার ভয়ান্তি মুখ দিয়ে শুধু একটি শব্দ বেরিয়ে এল । দেওয়ালের দিকে
আর একটু তাকে ঘেঁষে দাঢ়িতে হল—হাতের ভর দেবার জন্যে । মনে
হলো হিমাচল তার দেহ, হাত-পাণ্ডলি অবশ, মাথাটা এখুনি হয়ত শিথিল
হয়ে ঘাড়ের কাছে ঝুইয়ে পড়বে । ঘর দো'র যেন তার পায়ের তলায় দুলছে ।

—মলিনা ?

—কি ।

—আঘীয় স্বজনের কাছ থেকে তুমি এমনি করে পালিয়ে লুকিয়ে
বেড়াবে ? এমন কতদিন ? তোমার বয়স যে অল্প ! দেশের কাজে

নামতে চাইছ অথচ এমনি করে ভৱে পালিয়ে বেড়ানো—আর আমিহি-বা
তোমার সঙ্গে এমনি করে কতদিন.....ধর তোমার বয়স এখন আঠারো
কুড়ি পার হয়ে না গেলে তোমার নিজের ওপর কোনো অধিকারই নেই !

কোনো কথার সঙ্গত উভয় দেবার শক্তি মলিনার ছিল না। প্রসন্ন হঠাৎ
বল্ল—বাঃ, তুমি ত' বেশ দেখছি ! এদিকে ঘরে একটা আলো জ্বালতেও
তোমার মনে ছিল না ? ভুলে গেছলে বুঝি ?

সপাং করে মলিনার পিঠে যেন চাবুক পড়ল। থর থর কাপ্তে কাপ্তে
সে বল্ল, এই যে জ্বাল, এতক্ষণ জ্বালবার,—আপনি এলেন কি না !

—অঙ্ককারে ছিলে ? একলাই থাকতে হয়েছিল এতক্ষণ, না ?

বাতিটা হাত থেকে ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। সেটিকে কুড়িয়ে
নেবার জন্যে মলিনা আর আঙুলগুলি একত্র করতে পারছিল না। হাত তার
অবশ অচেতন !

প্রসন্ন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জলন্ত বাতিটা তুলে' দু ফোটা তেল
মাটিতে ঢেলে তার ওপর বসিয়ে দিল।

ঘরে আলো জ্বল্ছে। সকল দরজা জান্লা খোলা, প্রদীপের পরমায়ু
কতৃকু কে জানে। সেই ক্ষীণ দীপশিখার আলো থেকে আত্মরক্ষা করবার
জন্য মলিনা একটু দূরে সরে দাঢ়াল। মুখে তার ভয়ের বিশ্রি বিবর্ণতা।
একটি অপরিচিত আতঙ্কের ছায়া !

আজকে বোধ হয় আর বড় উঠল না ! এবার আমি বলি এক কাজ
করা যাক—বুঝলে মলিনা ? দুঃখও তুমি অনেক পেলে। আমাকে অবলম্বন
করে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিন্দাও তোমাকে সহিতে হলো। তোমার মত
সরল মেঘের পাঞ্জাব সংসারে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই। বড় যে হতে
পেরেছে, নিন্দা আর অপযশও তার তত বড়। চল, তোমার চোট কাকার
ওখানে তোমাকে রেখে আসি। তিনি তোমাকেও বোবেন, আমাকে জানেন।
নৈলে এ অবস্থায় তুমি—ওকি ? মলিনা তোমার ছেঁড়া কাপড় ? ছেঁড়া
কাপড় পরে আছ ?

দেখতে দেখতে মলিনার মুখ শাদা হয়ে এল, সে মুখে আর রক্তের
চিহ্নমাত্র রইল না। কাপড়খানি গুটিয়ে সে আর এক পা পিছিয়ে দাঢ়াবার
চেষ্টা করল। তার চোখ ছুটি কাপছে, ঠোট ছুটি স্ফুরিত হচ্ছে, পা টলছে, তার
আর দাঢ়াবার শক্তি নেই, বসে পড়ে' কোথাও মুখ ঢাকতে পারলে সে বাঁচে।



—মলিনা ?

—উঁ ?

—এ রকম কথা ত ছিল না ! আমি চেয়ে দেখবো তোমার জামা-কাপড় ছেঁড়া, তোমার মাথার চুল এলোমেলো, তোমার গায়ে-মাথায় ধূলো বালি, তোমার জিনিস-পত্র, বিছানা-বালিশ ওলোট-পালোট ? আজ তোমার এ কি রূপ ! প্রসন্ন না হেসেও আবার থাকতে পারল না, তুমি ডাকাতের সঙ্গেও যুদ্ধ করনি, ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করনি, তবে ?

দু'হাতে মুখ টেকে মলিনা বলে' উঠলো—আমি জানিনে ।

সে যেন আর্তনাদ । প্রসন্ন বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধূক্ ক'রে উঠল । এই বিদীর্ণ হৃদয়ের উচ্ছুসের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না । মুহূর্তের জন্য সে একবার বাইরের দিকে তাকালো । সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন বিরাট মহাসাগর স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে ! নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়, পুরাণদহের প্রান্তর-সীমা অতিক্রম করে অনন্ত অস্ককার । দিক্ষিত্বান্তির পটের উপর কে যেন কালী বুলিয়ে দিয়েছে ।

এগিয়ে এসে বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রসন্ন তার কাছে সরে গেল । বল্ল—কি ? বল শুনি ? কানচো নাকি মুখ টেকে ? এখানেও যে তোমার ভাল লাগছে না তা আজ আমার মনে হচ্ছে । কিন্তু সত্যি, কি চেহারা হয়েছে তোমার বল দেখি ? কাল এমন সময় ত তোমার এ চেহারা ছিল না ।

প্রসন্ন আবার বল্লে—কাল কেন, আজ সকালেও তোমাকে এমন দেখিনি । বিকেল বেলা যখন আমি বেরোই...অশ্চর্য, এ যে তুমি বদলে গেছ একেবারে ? মলিনা, টাট্কা ফুলকে মুঠোয় চেপটাতে দেখেছ ? পায়ের তলায় মাড়াতে ?

ওঁ: বুঝেছি, তুমি এ লজ্জার জীবন আর সইতে পারছ না । তাই নয় কি ? মলিনা ?

মলিনা ফুঁপিয়ে উঠে বলল—আর কিছু আমায় জিজ্ঞেস করবেন না । আমি—আমি কিছু বলতে পাচ্ছি না ।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বলছিলাম তোমার জন্মেই । তোমার উপর ঝড় যদি বয়ে যায়, আমি জানি ধূলো তোমার গায়ে কিছুতেই লাগবে না ; সে মেয়ে ত' তুমি নও ।—বেশ অন্য জায়গা আগে থাকতেই আমি বন্দোবস্ত করেছি । চল দিল্লীতে গিয়েই থাকিগে । সেখানে ভাল বাঙালীর হোটেল

আছে কি না আজ খবর আসার কথা। আচ্ছা, আমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল মলিনা ?

ডাকতে ? মলিনা অকস্মাত শশব্যন্ত হয়ে বলল, কই না, কই জানিনে ত কিছু ? কাকুকেও ডাকতে শুনিনি ?

কেউ আসেনি ? একজনও না ?

উহঁ !

মনে করে' দেখ দোখ, আমি বেরিয়ে যাবার পর...দীনেশ.....এসেছিল কি না ? দীনেশ গো আমাদের। মনে পড়ছে না দীনেশকে ? এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

মুমুর্দু' পক্ষীর মত মলিনার আর্তকর্থ শোনা গেল, ইংসেছিলেন।

এসেছিলেন ? তাই বল, আমার মতো যে তোমারও কথার ভুল হয়। ইংসেছিলেন ? তাকেই আমার দরকার। তুমি কি বললে তাকে ? বসতে বললে না ? আমার না আসা পর্যন্ত তাকে ধরে' রাখা তোমার উচিত ছিল যে মলিনা। উঃ সমস্ত মন দিয়ে কেমন করে' যে তার জগ্নে অপেক্ষা করে' আছি...ঁ্যা, দীনেশ তাহলে এসেছিল আমি বেরোবার পর ? ঘড়ির কাঁটা ধরে' সে চলতে জানে। হায় হায়, তুমি যদি তাকে আর একটু বসিয়ে রাখতে।

বাইরের আকাশ ততক্ষণে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কুমারী

এক বেঁটায় ছ'টি ফুল ; একটি গোলাপ আর একটি অপরাজিতা ।
গোলাপটির গঙ্কের চেয়ে ঝাঁঝ বেশী ; অপরাজিতাটি মৃদু এবং সলজ্জ ।

চঞ্চলার নাকি বিয়ে হবে, পাত্রের খোজ চলছে । ছোট বনলতারও বাড়স্ত
গড়ন—বছন খানেকের বেশী আর হয়ত তাকে রাখা চলবে না । ছুটো মেঘে
পাশাপাশি দাঢ়ালে ভয়ে একেবারে গা শিউরে ওঠে ।

তবে দিয়ে-থুয়ে পার করবার মত স্বচ্ছল অবস্থা । বাপ আছে, মা নেই ।
বুড়ি ঠাকুরমা কিন্তু আজও বেঁচে আছে । ঠুক-ঠুক ক'রে গঙ্কালানে যায়,
মন্দিরে ঢোকে, ফিরে এসে রাঁধে বাড়ে, বিকালে ‘গোপাল বাড়ী’ কীর্তন শুন্তে
যায়, সন্ধ্যার পর এসে মুড়ি দিয়ে শোয় । রাত্রে নাকি বুড়ির রোজ জর আসে ।

বাপের বয়সও অনেক । সরকারী চাকুরীতে পেন্সন্ পান । একটু
ইপানির দোষ আছে । কবিরাজের ওষুধ চলে ।

চঞ্চলা কালো, মুখখানি সুশ্রী, আনন্দ, শান্ত,—চোখছুটি দীর্ঘায়ত, গভীর ।
চোখের উপর চোখ রেখে দেখলে তবে সে-চোখ চেনা যায় । বনলতা সুন্দরী,
আগুনের আভার মত,—তীব্র এবং তীক্ষ্ণ । চঞ্চলা স্কুল ছেড়েছে, অত বড়
মেঘে, স্কুলে যাওয়া আর ভাল দেখায় না । বনলতা এখনও যায়, সে অত সব
গ্রাহ করে না । সামনের বছরে সে ম্যাট্রিক দেবে । লেখাপড়ায় দিদির
চেয়ে সে একটু বেশী টন্টনে ।

বুড়ি হেসে বলে—দেখিস ভাই, খোটার দেশ । রাঙ্গাঘাটে চলিস, কেউ
যেন—বুঝলিনে ?

তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বনলতা বলে, পায়ে আমার জুতো থাকে ঠাকুরমা, ভয়
নেই ! একটা ছেলে সেদিন মুখ টিপে হেসেছিল, ইট ছুড়ে তার রং ফাটিয়ে
দিয়েছিলাম, ঠাকুরমা ।

শরতের হাওয়া বইছে । দুপুর বেলা পুরুষের ভিড় একটু কমে’ গেলে
মেঘেরা গিয়ে গঙ্কালান করে’ আসে । মেঘে ছুটোকে স্নান করিয়ে উঠে এসে
বুড়ি বল্ল—দাঢ়া ভাই তোরা একটুখানি, কেদারের মাথায় ছুটো ফুল ফেলে
দিয়ে আসি । এই যাবো আর আসবো ।

ফুল ফেলতে গিয়ে বুড়ির পুঁজো আৱ শেষ হয় না।—

ঘাটের দিকে চেয়ে এক সময় বনলতা বলল, ঢাখ্ দিদি, ওই ঢাখ্,—
এই জন্মেই আমি নাইতে আসিনে...ওকে দেখলে আমাৱ গা জলে' যায়।

চঞ্চলা সেই তাৱ দিকেই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল—
এত রাগ কেন ওৱ ওপৱ ? বাবাকে সেদিন কি রকম বাঁচালো বল দেখি ?
নিজেৱ হাতে ওষুধ দেয়া, সেবা কৱা...তুইত তখন স্থুলে !

সে অমন লোকে কৱেই থাকে। ভাৱি আমাৱ ডাক্তাৱ ! এত যদি
দয়ালু তবে আড়াল থেকে আমাদেৱ দিকে তাকায় কেন ? লজ্জা কৱে না ?

চঞ্চলা সলজ্জভাবে বলল—পাশাপাশি বাড়ীতে থাকলে অমন এক আধবাৱ
দেখা শোনা হয়ই।

স্কুল আক্রোশে বনলতা দাতেৱ ওপৱ দাত চেপে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে
ৱাইল।

এতক্ষণে স্বান সেৱে কাঁধেৱ ওপৱ গামছা ফেলে ছোক্ৰাটি ওপৱে উঠে
এল।

হঠাতে পাশে চঞ্চলাকে দেখে একটু হেসে বলল—এই যে, চান কৱতে
এসেছিলেন বুঝি ?

চঞ্চলা বলল—ইঝা।

বনলতা দুজনেৱ দিকে এক মুহূৰ্ত তাকিয়ে কয়েক পা সৱে' গেল। কাছে
দাঢ়িয়ে এমন বেহায়াপনা দেখা তাৱ একেবাৱে অসহ।

ছোক্ৰাটি বলল—বাবা আপনাৱ ভাল আছেন ?

ভাল বিশেষ নেই, ওষুধ চলছে।

সেৱে উঠবেন, ভাবনা নেই—বলে' ছোক্ৰাটি অদূৱে বুড়ীকে বেৱিয়ে
আসতে দেখেই আবাৱ নিজেৱ পথে চলে' গেল।

বুড়ীকে পিছনে রেখে দুই বোনে পথ চলতে লাগলো। অপৱিসীম ক্রোধে
ফুলতে ফুলতে মুখ রাঙ্গা কৱে' এক সময় বনলতা বলল—ষুপিজ্জি ! পথে ঘাটে
মেয়েদেৱ সঙ্গে হেসে কথা বলতে লজ্জা কৱে না !

চঞ্চলা বলল—ছি, গালাগাল দেওয়া কিন্তু ভাল দেখায় না বুনি। ভজ্জতা
ৱক্ষা কৱতে কথা বলাটা অন্তায় নয়।

ওৱে আমাৱ ভজ্জতা ! দিন দিন এ ভজ্জতা না বেড়ে গেলেই বাঁচি।
আঁচারো বছৱেৱ মেয়ে গেলেন পঁচিশ বছৱেৱ ছেলেৱ কাছে ভজ্জতা রক্ষা

করতে—এ কথা শুনলে লোকে কি বলবে শুনি? আমি কিন্তু বাবাকে বলে' দেবো দিদি, তা বলছি।

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বলল—তা দিস, এখন চুপ করে' হেঁটে চল।

রাগে প্রায় অঙ্কের মত বনলতা বলল—একেবারে মরিয়া—কেমন? এ কিন্তু আমি হ'তে দেবো না, এই বলে রাখলাম। আমি বেঁচে থাকতে এসব চলবে না।

বাড়ী গিয়ে খানিকক্ষণ দুই বোনে ঝগড়া চললো কিন্তু হার হ'লো চঞ্চলার। সে বলল—আচ্ছা বেশ, সব মানলাম; কিন্তু পুরুষ মানুষের ওপর এত রাগ তোর কেন শুনি?

রাগ? রাম বল, রাগ নিজেরই ওপর। আমরাই ওদের সাহস দিই নৈলে ওদের সাধ্য কি যে,—তুমি যদি ওখানে কথা না বলে' মুখ ফিরিয়ে নিতে কিম্বা ধূমকে দিতে তা হলে কেমন হতো বল দেখি?

ছি বুনি!—বলে' চঞ্চল। উঠে চলে' গেল। গেল বটে কিন্তু যাবার আগে বনলতার মুখের অবস্থাটা একবার ভাল করে' দেখে গেলে ভালই হতো!

কিন্তু বনলতা ছাড়বার মেয়ে নয়! সেদিন থেকে সে একেবারে বড় বোনের কড়া সমালোচক হয়ে দাঢ়াল। চঞ্চলার ভাবভঙ্গী গতিবিধি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তার চোখ এড়িয়ে কিছুই যে ঘটতে পারে না—এজন্তে তার আত্মপ্রসাদও বড় কম হলো না। চঞ্চলার যে কোনো অপরাধের জন্য সেই যেন সম্পূর্ণ দায়ী, এই মনোভাব নিয়ে তার অশান্তির আর অন্ত নেই।

—ওকি, সাড়ীখানা যুরিয়ে না পরলে আর চলে না, আগে ত তোমার এমন করে' কাপড় পরতে দেখিনি দিদি?

চঞ্চলা বলল—চিরকাল কি আর একরকম চলে?

চলতেই হবে! তা বলে'—বাঃ, এ যে বেড়াতে যাবার সাজগোজ হচ্ছে দেখছি। কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

কোথাও না, নিয়েই বা কে যাবে! ছাদে গিয়ে বসি গে।

না না, ছাদে তোমার যাওয়া চলবে না দিদি; বিকেল বেলা ছাদে উঠা ভাল নয়। যেয়ে মানুষের এত ঘন ঘন হাওয়া বদল না করলেও চলবে। মাগো, কালো পান্নে আবার আগতা মাথানো কেন? মাথার ওকি

ছিরি ? এলো খোপা না ফিরিয়ে বিনিয়ে বাঁধলেই ত হতো ! তুমি যাই বল দিদি, ক্লপ দেখাবার চেষ্টা করলেই শুন্দর হওয়া যায় না !

চঞ্চলা হেসে বলল—আঃ তোর কথার মাঝাজ্ঞান নেই বুনি ।

তা না হোক, তুমি কিন্ত এ রকম করতে পাবে না ।—বলে' বনলতা একদিকে হন্ত হন্ত করে' চলে' গেল ।

চঞ্চলার কোনো আঘাতকেই সে আমল দেয় না । বয়সে বড় হলেও চঞ্চলা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা, সহজ বুদ্ধি এবং শুল্ক দৃষ্টির ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক ছোট—একথা বনলতা কিছুতেই ভুলতে পারে না । এ জন্তে বড় বোনের ওপর তার করুণারও সীমা নেই ।

—যখন তখন অমন চূপ করে' বসে থাক কেন দিদি ? সংসারের কাজ তুমি ত এক রকম ছেড়েই দিয়েছ ; দেখছি । লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছ—
স্বতরাং এ কথা আর জানবে কি করে' যে মাথা খালি থাকলেই খেয়ালে পেয়ে বসে ! আজ স্কুল থেকে এসে যেন দেখি তুমি বই খাতা নিয়ে বসে আছ ।
গোটাকতক আৰু দিয়ে ঘাবো কস্বে বসে' বসে' ?

আৱে না না, কেন বাজে বকিস ?

বাজে ! আমি বাজে বকি—কেমন ? ক্রমে সবই বুঝতে পারুছি দিদি ।
ৱাগে গৱ গৱ করতে করতে বনলতা চলে' যাচ্ছিল ; ফিরে দাঢ়িয়ে আৱ
একবার বলে' গেল—বয়েস আমারও কম হয়নি দিদি, বিয়ে হলে এতদিন
ছেলেৰ মা হতাম । এৱকম কাণ্ড সবই বুঝতে পাবি । বুঝলে ?

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে হাসতে হাসতে চঞ্চলা একদিকে পালিয়ে গেল ।

পসাৱ এখনও ভাল কৰে জমে নি । সারাদিনে গুটি চার পাঁচ রোগী আসে
আৱ একটি কিম্বা বড় জোৱ ছুটি ‘ডাক’ । বিদেশেৱ লোকেৱ স্বাস্থ্য একটু
ভালই তাই ঔষধ পত্ৰ এনে জমিয়ে রাখতে সাহস হয় না । যাৱা একটু আধটু
শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে তাৱাই ডাক্তার দেখাতে আসে ; বাদবাকী সবাৱই
শুষ্ঠিযোগেৱ ব্যবস্থা ।

নৌচে আৱ ওপৱে ছুটি ঘৱ । নৌচেৱটিতে দোকান আৱ ওপৱেৱটিতে
শোবাৱ ব্যবস্থা । একটি মাত্ৰ বাইৱেৱ লোক আছে । নাম—মহারাজ ।
সে একধাৱে চাকুৱ, বামুন, দারোয়ান এবং সৱকাৱ । থাঙ্গা-পৱা পনেৱো
টাকা মাস-মাহিনে । রাত্ৰে সে ‘দোক্তিৰ’ বাড়ীতে গুতে যায়—আবাৱ কাক
না ডাকতেই ফিরে আসে । লোকটা বিশ্বাসী ।

—তুমি নিজের একটা ষা হোক হিল্পে করে' নিয়েছ—কি বল
মহারাজ ?

সেবার লাঠি খেলতে গিয়ে মহারাজ স্থমুখের দুটো দাত ভেঙে আসে।
এক মুখ হাসি হেসে সন্তুষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—মেহেরবান বাবুজি !

মেহেরবান আমি খুব। দয়া একেবারে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—
বলে' বিনয় হো হো করে হেসে ওঠে। এই হাসির সঙ্গী তার কেউ নেই।
নিজের পরিচ্ছন্ন ঘরখানির মধ্যে নিজেই একটি ছোট পৃথিবী সৃষ্টি করে' নানা
খেয়ালের তুলি বুলিয়ে তাকে রঙ্গীন করে' রাখে। ঘরের দক্ষিণ দিকে দুটি
খোলা জানুলা। যেন দুটি বোন। একখানি রৌদ্রোজ্জল নীল আকাশকে
তারা যেন দুজনে ভাগ করে' নিয়েছে। জোরে জোরে হাওয়া বইলে দুটি
জানুলাই লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

থাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা ইঞ্জি চেয়ারে শুয়ে বিনয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
বাঙলা কবিতা পড়ে। বলে—একটা লাইনও বুঝতে পারছিনে, বুঝলে
মহারাজ ? তবু ভাতগুলো হজম করতে হবে ত !—বেটা গেল কোথায় ?
সাড়া দেয় না কেন ?

উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই নজর গিয়ে পড়লো ও-বাড়ীর সিঁড়ির
কাছের জানুলায়। জানুলার কাছে দাঢ়িয়ে এদিকে, চেয়ে চঞ্চলা তখন
হাসছে। জিভ কেটে মুখ লাল করে' বিনয় বল্ল—লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন
আমার কাব্যচর্চা ?

চঞ্চলা বল্ল—বনলতা স্তুলে গেছে, এখনই ত শোনবার সময়। আপনি
বুঝি কবিতা লেখেন ?

আমি লিখবো কবিতা ? হা ভগবান, এতদিনে এই দুর্নাম ! আমার
মধ্যে কোন ধোঁয়ার ধোঁজ পেয়েছেন নাকি ? আচ্ছা, ছোট বোনটিকে
এত ভয় করেন কেন ?

একটুখানি হেসে চঞ্চলা বল্ল—না করে' উপায় কি বলুন ? ও একেবারে
বুনো ঘোড়া, মাথা উচিয়ে একবার ছুটলে আর কারোকে কেয়ার করে না !
ভারি একণ্ঠ্যে !

বিনয় বল্ল—আমার ওপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন—কেন বলুন ত ?

সে এমনিই !—চঞ্চলা হেসে বল্ল—জগতটা যেন তার মেজাজের মুখ
চেয়ে থাকে !

জান্মাটি ছোট কিঞ্চ সেখান থেকেই বিনয়ের সমস্ত ঘরটা দেখা যায়। ঘর ত নয়, যেন হরি ঘোষের গোয়াল। একটু আগে সে ঘরে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। মুখ বাড়িয়ে চঞ্চলা বল্ল—শোবার ঘর লোকে অমনি অপরিষ্কার রাখে? একেবারে যে ডামাডোল!

বিনয় আবার হো হো করে' হাসলো। বল্ল—বুঝেছি, কথা খুঁজে না পেলে লোকে আপনার মতন অনেক বাজে কথা বলে। আমার ঘর সত্য সত্যই পরিষ্কার, এ পাড়ার কারো শোবার ঘর এমন নয়—আমি বাজি রেখে বল্টে পারি।—

কথা বলার অভ্যাসটা বিনয়ের এই রকমই। তর্ক করে' সে সাপের বিষ পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে।

—আমি কিঞ্চিত্বেশ থাকি তা আপনারা যাই বলুন। সবই পাবেন, কিছুরই অভাব নেই আমার ঘরে। ওই দেখুন ‘চৌভ’,—মাংস ডিম কপি, ভাল ভাল তরকারী এনে নিজেই ‘ফিষ্ট’ করি—নিজেই ওড়াই। মহারাজ বেটা গোড়া হিন্দু হয়ে ভারি স্ববিধে হয়ে গেছে। এবার দেখুন না ভাল ‘ডিনার টেবল’ আনাচ্ছি, সঙ্গে দুটো ফুলদানী।—ওই যে গাড়া পাঁচিলটা দেখছেন ওর ওপর টবে করে' ডালিমের চারা বসাবো—লাল লাল ফুল ফুটবে, আর মৌমাছি এসে ঘুর ঘুর করে' যাবে। আর নৌচে ওই যে খালি জায়গাটুকু পড়ে' আছে, ওখানে—নাঃ, এখন বললেই সব মাটি হয়ে যাবে; এখানে আছেন যখন তখন সবই একে একে দেখতে পাবেন।—বলে' হেসে তাকাতেই চঞ্চলা বল্ল—কেবল একটা জিনিসের অভাব আছে!—বলেই সে জান্মার একটা কপাটের পাশে মুখখানিকে লুকিয়ে বসলো।

বিনয়ের সেই নিরুৎসেগ, সরল এবং শান্ত মুখখানি হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে মাথা তুলে বল্ল—বুঝেছি আপনার কথা; কি উত্তর দেবো তাই চট করে' ভেবে নিলাম।

উত্তরটি কি শুনি?—ভুক্ত কুঁচকে মুখ টিপে চঞ্চলা চেয়ে রইল।

ভাবছিলাম বাঙলা দেশে একটি মাত্র মেঘে স্থৰ্থী, আমি যাকে বিয়ে করিনি। আর তা ছাড়া—

চঞ্চলা বল্ল—বেশ, বাহাদুর আপনি। এখন আপনার ওই কবিতার বইটা দিন দেখি, কাল আবার এমন সময় ফেরৎ দেবো।

বইটা নিয়ে বারান্দার কাছে এসে বিনয় বল্ল—চুড়ে দিচ্ছ, লুকে নিন।

আমার হাতে বেশ টিপ আছে। ছোট বেলা খুব ভাল গুলি খেলতে পারতাম। ধৰন্ত।

চুড়ে দিল বটে কিন্তু সেখানা চঞ্চলার হাত অবধি পৌছল না—জানুলার গরাদে লেগে নীচে পড়ে' গেল।

ওই যা—বলে' তাড়াতাড়ি উঠে নেমে আসতেই মাঝপথে বনলতার সঙ্গে দেখা। সে তখন স্কুল থেকে ফিরুছে। চঞ্চলাকে দেখে আরুক্ত দৃষ্টিতে বলল—গায়ের ওপর বই ফেলে আমাকে অপমান করা? আমাকে অপমান!

বনলতা আর কিছু বলল না। খাতাপত্র রেখে কবিতার বইটা হাতে নিয়ে খট্ট খট্ট করে' বেরিয়ে গেল।

বিনয় তখন নিঙ্গপায় লজ্জায় নীচের ঘরে বসে' আছে। দরজার কাছে দাঢ়িয়ে বইখানা ভিতরে ছুড়ে দিয়ে বনলতা বলল—নিন্। কবিতার বই দিয়ে আমাকে নরম করা শক্ত। কাউকে কিছু বলবো না; এবারের মতন চুপ করে' গেলাম। কিন্তু দিদির মতন আমি কাউকে কেঘার করিনে এটা আনিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বিত বিনয়কে কিছুই বলতে না দিয়ে বনলতা যেমন এসেছিল তেমনিই আবার চলে' গেল।

ভয়ে বিবর্ণ মুখে চঞ্চলা দোরের কাছে দাঢ়িয়েছিল। 'ঘরে চুকে গঞ্জীর ভাবে বনলতা কাপড় ছাড়তে লাগলো। চঞ্চল বলল—কি বল্লি? যা তা বলে' এলি ত?

কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া বনলতার পক্ষে যেন নিতান্তই নিষ্পংঘোজন। তবু তাচ্ছিল্য কঠে বলল—আমার ভদ্রতা জ্ঞান একটু কম তা বলে' কমন-সেন্স্টা কম নয় দিদি। শুধু বলে' এলাম ওসব চলবে না।

বেশ করেছিস।—বলে' হেসে চঞ্চলা চলে গেল।

জলঘোগ ক'রে' একটু ঠাণ্ডা হয়ে দিদিকে ডেকে বনলতা বলল—আমি ইস্কুল ধাদার পর সারাদিন তুমি কি কর গুনি? আঁক কসা ত বস্ক করে দিয়েছ! সেলাইয়ের কাজটা দিলাম, তিনদিনের কাজ, তুমি আটদিনেও শেষ করতে পারলে না। তোমার একটু শাসন হওয়া দরকার দিদি।

তা না হয় কর—বাবার ছড়িটা এনে দিচ্ছি।

ঠাণ্টা আমি ভালবাসিনে। হপুর বেলা আজকাল কি হচ্ছে আমার বলতেই হবে!

চঞ্চলা বল্ল—কি আবার হবে! হয় যুমিয়ে পড়ি না হয় মহাভারত পড়ি।

মাথা নৌচু করে বিজ্ঞের মত বনলতা বলল—তা মহাভারত পড়া ভাল, অনেক জিনিস জানবার আছে। তবে তোমার বয়েসী যেয়ের আগাগোড়া মহাভারত পড়া তেমন ইয়ে নয়। সে অংশগুলো লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেগুলো বাদ দিও, না হয় আমি দাগ দিয়ে দেবো'খন। ওকি, ও জান্লাটা আবার কে খুললো?

তাড়াতাড়ি জান্লাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে, বিনয় বারান্দায় দাঢ়িয়ে রয়েছে! সশঙ্কে মুখের উপরেই জান্লাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে বনলতা বল্ল—বাবাকে বলে' এ বাড়ীটা ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, আর নয় ত ডাক্তার অন্ত কোথাও যাক।

যাবার সময় চঞ্চলা বলে' গেল—সেই ভালো বুনি, তোর দুঃখ দেখতে পারিনে।

ঘরে ঢুকে বিনয় একটু চমুকে উঠলো। কার পায়ের শব্দ এই মাত্র যেন এ ঘর থেকে মিলিয়ে গেছে। একটি অপরিচিত ঝিলমিলে বাতাস ঘরের চারিদিকে যেন ভুর ভুর করছে। এ যেন ঠিক হাওয়া নয়—কা'র নিখাসের আমেজ। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রগুলি হাসতে হাসতে ঠিক যেন কার আগমনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে ত' নিজে ঝড়, যতক্ষণ থাকে ঘরটাকে ওলোট পালোট করাই তার কাজ। কিন্তু যে এসেছিল সে ত' ঝড় নয়—সে বসন্ত। আপনাকে সে সর্বস্বান্ত করে' ফুল ফুটিয়ে গেছে।

ইজি চেয়ারে আর বসা হলো না; পায়চারি চলতে লাগলো। ওখানে ওই বইগুলি—বাঃ চেহারা ফিরে গেছে যে! চিঠি না ওখানা?

বই চাপা পত্রখানি তুলে নিয়ে বিনয় এক নিখাসে পড়লো...‘ডাকতে এসেছিলাম, পেলাম না। চিঠি পেয়েই একবার আস্তন। বাবার ইংগানিটা একটু বেড়েছে। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।—চঞ্চলা দেবী।’ পুঁ:—‘চিঠির কথা যেন বনলতা টের না পায়।’

বাস্তুর মধ্যে চিঠিটা রেখেই বিনয় ছুটলো।

অন্দর মহলটা বেশ পরিচিত। উপরে উঠতেই চঞ্চলা হেসে বলল—আস্তন, বাবা জেগেই আছেন।

জেগেই ছিলেন। সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এসো বাবা, এখন

একটু ভাল আছি। টান্টা কিছু কম পড়েছে। তোকে বললাম না ওঁকে
আর এখন বিরক্ত করিসনে, তুই শুনলিনে।

চঞ্চলা বস্ল—আমরা বিরক্ত না করলেও অন্ত কেউ করতো !

বিনয় বল্ল—তা ত নিশ্চয়ই। বিরক্ত করলেই আমাদের পেট চলে।
আজ কিন্তু আপনার ওষুধটা বদলে দিয়ে যেতে হবে। হাতটা একবার
দেখি ?

হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে বিনয় বল্ল—ভালই আছেন ; তবে ভারী
ঢৰ্বল ! কাগজ-কলমটা একবার দিন ত ?

চঞ্চলা তাড়াতাড়ি লেখার সরঙ্গামগুলি এগিয়ে দিল। ছোট একটি
'প্রেস্ক্রিপশন' লিখে দিয়ে উঠে দাঢ়িয়ে বিনয় বল্ল—এটা খাইয়ে কেমন
থাকেন কাল সকালে যদি একবার খবর দেন ত'—আজ যাচ্ছি।

ওকি, না না, সে হবে না বাবা। ফি-র টাকাটা—

মাপ করবেন—বলে' বেরিয়ে আসতেই একেবারে বনলতার মুখোমুখি।
ভিতরে চুকে বনলতা বল্ল—দাঢ়ান, অত দয়ালু নাই বা হলেন ! দাও
দিদি টাকাটা—বলে' এগিয়ে এসে চঞ্চলার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে
আলগোছে সে বিস্মিত, ক্ষুঁক বিনয়ের হাতের ওপর ফেলে দিল। বল্ল—এ
রকম ডাঙ্কারী কিছুদিন চালালে লোকে আপনাকেই ঝঁগী বলে' ঠাউরে নেবে।
তা' বলে' কিছু মনে করবেন না যেন।

বেশ যা হোক—বলে' বিনয় বেরিয়ে নৌচে নেমে গেল।

চঞ্চলাও আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। আজ তার একটু রাগ হয়েছিল।
মুখ রাঙ্গা করে বল্ল—বাহাদুর মেঘে তুই বুনি। কিছুই তোর আঠকায় না।
লোককে অপমান করাটা যেন তোরই একচেটে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কর্তা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে
রইলেন। ঝঁপ মুখে একবার একটুখানি হাসলেন, পরে নিজের মনেই
মুছ কঠে বললেন—যদি হয় ত মন্দ হয় না !

আবার তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

একটু পরে ঘরে চুকে বনলতা বল্ল—বাবা জেগে আছেন ?

বাবা মুখ ফিরিয়ে—কেন ছোট মা ?

আচ্ছা, একি ভাল বাবা ? এই যে ডাঙ্কার আপনাকে হাতে রেখে
চিকিৎসা কচ্ছে।

সে কি ?

তাই ত মনে হচ্ছে ! নেলে রোজ একবার করে' আসবার তাঁর কি
দরকার ? এ শুধু টাকা নেবার ফলি বৈ ত নয় ।

ছি মা, একি বলতে আছে ! ঘরের ছেলের মতন—এলেই বা ! টাকা
ত নিতেই চায় না, আমরাই জোর করে'—

এই কথাগুলিতেই বনলতা বেশি ক্ষুক হয় । ডাক্তারের সঙ্গে এতখানি
অকারণ আভ্যন্তরীন—তার গায়ে ধেন বিষ ছড়িয়ে দেয় । বল্ল—আচ্ছা
বেশ বাবা, টাকা উনি নিচ্ছেন, টাকাই নিন, তা বলে' ঘরের ছেলের মতন
আর হয়ে কাজ নেই ।—বলে' সে দুম দুম করে' ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল ।

রাগে তার সর্বশরীর জালা করছিল, একটা কিছু কাজ নেবার জন্যে
পড়বার ঘরের কাছে আসতেই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ওবাড়ীর বারান্দায়
বিনয়কে দেখা গেল । সন্ধ্যার অক্ষকার হয়ে আসছিল, তবু মনে হল
লোকটার স্মৃতি গৌরবণ্ণ দেহে অতিরিক্ত শক্তি, চোখ দুটো উদার,
চওড়া কপাল, মাথার চুল পিছন দিকে ফেরানো, মুখে ছোট ছেলের মত
একটি উদ্দেশ্যহীন হাসি—অনেকগুলি সাধারণ যুবকের মাঝখানে নিজের
একটি অখণ্ড বিশেষত্ব নিয়ে দাঢ়াতে পারে । আজ প্রথম বনলতা তাকে
ভাল করে' দেখলো । বল্ল—বাইরে রূপ থাকলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে
ছাঁটুমী একেবারে জড়ানো ।

চঞ্চলা কখন্ এসে পিছনে দাঢ়িয়েছিল । বল্ল—তা হোক গে, ছাঁটুমী
ঘার আছে তার আছে—আমাদের কি ?

হঠাতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বনলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো । একটু হেসে
চঞ্চলা বল্ল—কিন্তু কেমন দেখলি তাই বল ।

বনলতা একেবারে ফেটে উঠলো । বল্ল—আস্পদাটা একবার ভাল
করেই দেখছিলাম ! পরের বাড়ীর জান্মার দিকে এমনি নজর করে' থাকা !
শেমুলেস ক্রিচার !

ও কখাটা তোর পক্ষেও খাটে বুনি ।—বলে' চঞ্চলা গিয়ে ঘরে চুকলো ।

সেইদিনই রাত্রে বারান্দার কাছে গিয়ে থড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে বড়
বড় অক্ষরে বনলতা লিখলো—‘এ বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখা কোনো পুরুষের
পক্ষে একেবারে নিষেধ ।’

এবং পরদিন লেখাটার ফলাফল সম্বন্ধে জানবার জন্য সে অতিশয় ব্যগ্র

হয়ে উঠলো। গোপনে বিকাল বেলা ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঢ়িয়ে লুকিয়ে দেখলো, বারান্দার দিকে চেয়ে কৌতুক-হাস্তে ছোক্রা ডাঙ্কারটির মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে উন্নাসিত হয়ে উঠেছে। এবং সেইদিকেই চেয়ে কা'কে যেন বল্ছে—আপনার ছোট বোনটির মাথায় একটু ছিট আছে, কি বলেন ?

রাগে যেন চারিদিক অঙ্ককার হয়ে গেল। ছিট ! তবে সে পাগল ? মানে, মাথা খারাপ—কেমন ?

চঞ্চলা বল্ছে—তা বলে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন ?

না না, সেকি, ছেলেমানুষ এমন করেই থাকে। মনে কি করবো ?

পা ছটো যেন বনলতার টল্টে লাগলো। গায়ের প্রতি লোমকুপে কে যেন লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। সে ছেলে মানুষ ! অর্থাৎ ছনিয়ার কিছু সে বোঝে না। ইস্কুলের কোন বাঙ্কবী একবার তাকে এই আখ্যা দিয়েছিল বলে' সে তার গায়ে নথ ফুটিয়ে রক্ত বার করেছিল।

অপমানের জালায় বনলতার কানা এল।

এর প্রতিশোধ চাই !

নৌচে নেমে বারান্দায় এসে দেখলো, চঞ্চলা সরে গেছে ; ওধারে বিনয় দাঢ়িয়ে। বল্ল—মেয়েদের দিকে চেয়ে ইঁ করে কি দেখা হচ্ছে শুনি ? ডাঙ্কার বলে' কি মাথা কিনেছেন !

তার তৌর মূর্তির দিকে চেয়ে অকস্মাত হো হো করে' হেসে উঠে বিনয় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তার পরদিন ইস্কুল যাবার আগে একখানি চৌকে। টিনের পাত্ৰ দড়ি দিয়ে বৈধে বনলতা বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। তাতে লেখা—‘গাধা’। এবং ফিরে এসে সেটাকে আর দেখতে না পেয়ে রাগে গিস্ গিস্ করতে করতে বল্ল, দিদি ?

কেন রে ?

আমার ‘গাধা’ কোথায় ?

চঞ্চলা একটু হেসে বল্ল—ও বাড়ীতে।

সে আবার কি ?—বলে' বনলতা জান্লা দিয়ে মুখ বাঢ়িয়ে দেখলো, তার দড়ি বাঁধা ‘গাধা’ ডাঙ্কারের বারান্দায় ঝুলছে। বল্ল—কি করে গেল ?

চঞ্চলা বল্ল—বোধ হয় বাবাকে দেখে যাবার সময় নিয়ে গেছেন !

তৌক্ষ কঠে বনলতা বল্ল—নিজের বাড়ীতে ‘গাধা’ টাঙানো হলো। তার

মানে, আমি যদি ওদিকে তাকাই তা হলে আমি ‘গাধা’—কেমন? চোর
কোথাকার!

‘হ্ম হ্ম করে’ ঘরে চুকে সে খাটের বিছানার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো।
তার সমস্ত রাগ ঘুরে এল এই বিছানাটারই ওপর! মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে
শুয়ে তিন চারটে বালিশ প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে দুহাতের দশ আঙুল
দিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতে লাগলো। অপমানে রাগে দুঃখে
আর প্রতিশোধ-স্পৃহায়—যদি সে একবার চীৎকার করে’ কাদতে পারতো
তাহলে হয়ত ভাল হতো।

পরের দিনটা শনিবার। দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই বহুধাতা
রেখে বনলতা বল্ল—ডাক্তারের বাড়ীতে যে আমার কোন চিহ্ন থাকে এ
আমি চাইনে। টিনের পাতখানা তুমি ফিরিয়ে আনো দিদি। তা হলেই
ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পদ আমাদের মিটে যাবে। বাবার অস্থি ত অনেক কমে
গেছে, দরকার হলে গোপাল কবরেজকে ডাকলেই চলবে। তুমি গিয়ে
গুটা আনো, তা হলেই—বাস।

চঞ্চলা হেসে বলল—তা এনে দিছি!

সন্দিক্ষ দৃষ্টিতে একবার দিদির দিকে চেয়ে বনলতা বল্ল—কিন্তু যাবে আর
আসবে; এক মিনিটের বেশি দেরী হওয়ার কোনো কারণ নেই। চল,
আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, দরজায় গিয়ে দাঢ়াবো।

হজনে নেমে এল। চঞ্চলা ভিতরে চুকে ওপরে উঠে গেল। দোকান
আগলে মহারাজ বসেছিল, ওপরে যাবার জন্য সে বনলতাকেও অনুরোধ
জানালো। বনলতা বল্ল—বাবু তোমার ভারি পাজি মহারাজ, তার বাড়ীতে
পা দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

মহারাজ হেসে আবার কলকে টানতে লাগলো! কি ভাগিয় সে বাঙলা
বোঝে না!

তন্দ্রা এসেছিল; বিনয় জেগে তড়ক করে উঠে বসলো। হঠাৎ
হেসে বল্ল—এতক্ষণ আপনাকেই স্বপ্ন দেখছিলাম! সত্যি বলছি, আপনাকে
যেন—

মনে হলো চঞ্চলা ত কালো নয়—গ্রামজী। মুখখানির ওপর একটি
কঙ্গ শান্ত ছায়া জড়িয়ে আছে! ডাগর দুটি চোখ যেন দুখানি সজীত;
হাত পা গুলি নিটোল। মনে হলো, একটি লতার মত একজনকে আঞ্চল করে’

সে উঠে দাঢ়াতে চায় ; একটি সরল আন্তসমর্পণের ভাব তার মুখে মাথানো ।

বিনয় উঠে দাঢ়ালো ; দাঢ়িয়ে কাছে গেল, গিয়ে বল্ল—আমি তোমার
ভালবাসি চঞ্চল ! ।

চঞ্চলা থতমত খেয়ে একটু হেসে সরে' যাবার চেষ্টা করতেই বিনয় তাকে
হই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মুখের ওপর মুখ রেখে চুম্বন করতে করতে বল্ল—
এতে অন্ত্যায় কিছু নেই—বুঝলে ?

হঠাৎ চোখের ওপর যেন নাটকের একটি দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেল !

এদিকে এক মিনিটের বেশী হয়ে যেতেই বনলতা চৌৎকার করে' উঠলো—
দিদি ?

চঞ্চলা উত্তর দিল—যাচ্ছি, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না !—এবার ছাড়ো, কেউ
আবার—আঃ—বলে' মুছ হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টিনের পাতটা হাতে
করে' সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল ।

তুমি যেন কি দিদি ! অত ইঁপাছ কেন ? আমি কি এত ছুটে আসতে
বলেছিলাম ? চুল এলো করে' আলুথালু হয়ে, মুখ রাঙা করে'—আশ্র্য
মেয়ে যা হোক !

চুম্বনের সে উত্তাপ তখনও মুখ থেকে মোছেনি ; প্রণয়ের প্রথম স্পর্শ,
কুমারীর বুকের অবাধ্য কাপুনি—তাও চঞ্চলাকে প্রায় ঝুঁকড় করে'
ফেলেছিল ।

ওপরে উঠে টিনের ‘গাধা’টি নাড়তে নাড়তে বনলতা বল্ল—যাক, সব
চুকে গেল এতদিনে । বাঁচলাম !—তুমিও আর ওর সঙ্গে কথা বলো না,
দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিও । আর যদি কখনো বাবা আর আমি ওর সঙ্গে
আলোচনা করি, তুমি সেখান থেকে উঠে যেও । বুঝলে ?

অন্তমনস্ক হয়ে চঞ্চলা বল্ল—দেখা যাবে ।

তার মানে ?—মুখের দিকে চেয়ে বনলতা বল্ল—যাই বল, তোমার জগ্নে
আমার ভয় করে দিদি । মাঝে মাঝে তোমার এই চুপ করে থাকা দেখলে
আমি শিউরে উঠি ।

শিউরে উঠবাবাই কথা ।

দেনা-পাওনা এমন করে' শেষ করবার পরেও দেখা যায়, দু'একদিন অন্তর
বিনয় এক আধবার এসে কর্তাকে দেখে যায় ! সে যে এসে শুধু' রোগ আর
ঔষধপত্রের সঙ্গেই আলোচনা করে তাও ত তার মুখ দেখলে মনে হয় না ।

চঞ্চলা যেন একটু গাঞ্জীর হয়ে গেছে ; সে গাঞ্জীর্য ঠিক ফজ্জুলারার মত । কিছুই
বুঝতে না পেরে বনলতা একবার গিয়ে গোপনে দরজার কাছে দাঢ়িয়েছিল,
বাবা ভিতর থেকে বললেন—বিনয় কিছু মনে করতে পারে, যদি আমাদের
কথা শুনতেই হয় ত ভেতরে এসো ছেট মা ।

বনলতা আহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল ।

তারপর সে এক রহস্য !

বলে—মুখ টিপে নিজের মনে অমন হেসো না দিদি, গা জলে যায় ।

চঞ্চলা হেসে বলে—তুই যে জলে জলেই গেলি !

এরকম মন্তব্য বনলতা গ্রাহণ করে না ; কিন্তু মনে মনে অস্তির হয়ে উঠে
বলে—যার দিকে চাই সবাই চুপচাপ—এর মানে কি ? তা হলে আমাকে
লুকিয়েও এ সংসারে অনেক কথা চলে ?

আমাকে কেন যখন তখন ধমক্ দিস্ বল্ত ?

তবে কাকে ধমকাবো শুনি ? বাবাকে ? ঠাকুরমাকে ? না তোমার
ওই গুণা ডাঙ্কারাটাকে ? উল্টে ধমক থাবার ভয় নেই আমার ?

খিল খিল করে চঞ্চলা হেসে ওঠে ।

হেসো না যখন তখন, হাসি আমার দু'চক্ষের বিষ !—বনলতা হন্দন করে
চলে' যায় ।

সেদিন দুপুরে চঞ্চলা বিনয়ের দরজা থেকে নামতেই বনলতা পিছন থেকে
বল্ল—দিদি ?

মুখ ফিরিয়ে দিদি বল্ল—ও, তুই ? ছুটি হয়ে গেল ? চারটে বাজে
বুঝি ? বিনয়বাবুকে পেলাম না, তাঁর থোজেই গিছলাম ।

সে ত বুঝতেই পাচ্ছি । কি দরকারে গিছলে আমি জানতে চাইনে ।
তুমি যে এসে বাবার ওষুধ নিয়ে যাও তা শুনেছি, তবু তার একটা সময়
অসময় আছে ! এখন বাবা ঘুমুচ্ছেন, ঠাকুমা গেছেন গোপাল-বাড়ী, আমি
ইস্কুলে—ডাঙ্কারের ওষুধ নেবার এই কি সময় ? দিদি, মেয়ে মাঝুমের লজ্জা
গেলে আর কিছুই থাকে না ।

চঞ্চলা বল্ল—বুনি, এসব অপমানের কথা, মনে রাখিস্ ।

দরজায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে বনলতা আগন্তের মত একটুখানি হাসলো ।
বল্ল—সত্যি ? তা হলে অপমান তোমার গায়ে বাজে ? আমি জানতাম
তোমার একদিক উগ্র হয়ে আর সব দিক ক্ষয়ে গেছে !



এক মুহূর্ত সে চুপ করলো, পরে একেবারে মরিয়া হয়ে নিতান্ত অস্ত্র একটি মন্তব্য করে বসলো। বলল—পুরুষ মানুষকে তোমার এতখানি দরকার করে থেকে হয়েছিল তা'ত আর জানিনে ভাই ? বলে বনলতা ভিতরে চলে গেল।

গেল বটে কিন্তু বিনয়ের এ বাড়ীতে আসা বঙ্গ করবার মত শক্তি তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় রোজই আসে—আসে বনলতার মুখেরই ওপর। ঠাকুমার ঘরের কাছে দাঢ়িয়ে হেসে হেসে কথা বলে, নিজের জীবনের নানা কাহিনী বলতে বলতে দুঃসাহসের গন্ধ করে। কর্ত্তার ঘরে গিয়ে ইংরেজি বাঙ্গলায় নানান আলোচনা স্বরূপ করে' দেয়।

এ আভ্যন্তার গোপন অর্থ ক্রমশঃ বনলতার কাছে আর গোপন থাকে না।

অনেকদিন পরে কর্ত্তা বিছানার ওপর উঠে বসে সংবাদ পত্র পড়ছিলেন। শরীরটা তাঁর আজকাল একটু ভালই আছে।

ঘরে চুকে একটি ইঞ্জি চেয়ারের ওপর বনলতা সোজা হয়ে বসলো। বাবা তার আগমন টের পাননি ভেবে চেয়ারটা একটু শব্দ করে নড়িয়ে সে আবার চুপ করে রইল।

একটু পরে কাগজের ওপর মুখ রেখেই কর্ত্তা বললেন—আজকাল সকালে আর বেড়াতে যাওনা ছোট মা ?

যাই মাৰে মাৰে। আচ্ছা বাবা ?—

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে তিনি বললেন—কেন ?

দিদির নাকি বিয়ে হবে শুন্ছি ? আর পাত্র নাকি আপনার ওই ডাক্তার ?

কর্ত্তা হেসে বললেন—সবই ত জানিস মা ?

বনলতা বলল—শুধু এইটি জানতাম না যে আপনি রাজি আছেন ! কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন বড় লোকের ছেলে হলে আর ভাল ডাক্তার হলেই সৎপাত্র হয় না !

কথার এই অতিরিক্ত উগ্রতায় কর্ত্তা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন —বিনয়ের সহজে তোমার ধারণা কি ভাল নয় ?

বনলতা একটুখানি ধামলো, পরে অন্তদিকে চেয়ে হঠাৎ বলল—পাত্রের স্বভাব-চরিত্র ভাল হবে এ দাবী আমরা সবাই নিশ্চয় করতে পারি !

ক্ষণ হলেও কর্ত্তা একটু কঠিন লোক। বললেন—তা পারো, তবে তার একটা অধিকারী-ভোঁ আছে। ও জিনিসটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার

চেয়ে, আমি যদি নিজে নাড়াচাড়া করি তা হলেই মানায়—বুবালে ছেট মা ?

বনলতা বল্ল—ভাল লোক কি মন্দ লোক, এ কথা জানবার অধিকারও কি নেই বাবা ?

কর্তা আবার হাসলেন,—সেটা খুব ভাল কথা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এ বিয়ে সার্থক ! পাত্রের স্বভাব-চরিত্র কেমন সেটা দেখবার চেয়ে চঞ্চল। এবং বিনয়ের মধ্যে গোড়াকার আসল মিলটি যে আছে এই দেখেই আমি আনন্দিত ।

তাতে আপনার ভুলও হতে পারে !—বলে বনলতা উঠে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আপনার তিক্তায় নির্বিষ অবরুদ্ধ আশ্ফালনে সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তার আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি এই পৃথিবীজোড়া বিরুদ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে তার সর্বাঙ্গে যেন শত সহস্র ছুঁচ ফোটাতে লাগলো। পড়বার ঘরের মধ্যে চুকছিল কিন্তু চঞ্চলাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেই সে অন্তর চলে গেল। ঈর্ষা বিদ্বেষ প্লানি এবং সকলের ওপর চঞ্চলার প্রতি একটা বিজাতীয় হিংসা তার জর্জরিত চোখ-দুটোকে যেন অঙ্গ করে দিয়েছিল। চঞ্চলার মুখ পর্যন্ত দেখবার ইচ্ছা আর তার নেই। নীচে গেল, কিন্তু পাছে ঠাকুরার সঙ্গে একটা রাগারাগি হয় এজন্ত আবার ওপরে উঠে এল। কোথাও যেন শান্তি নেই—বুকের ওপর কে যেন তার অঞ্চলিক লৌহ দিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে দিয়েছে। গোপন করতেও হবে অথচ যাতনারও অন্ত নেই। মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করতে পারলে হয়ত খানিকটা স্বন্তি পাওয়া যেত !

রাত্রে দুই বোনে একই ঘরে দুইটি বিছানায় শোয় !

নিঃশব্দে বনলতা বিছানার ওপর পড়েছিল ; কয়দিন থেকেই তার চোখে ঘুম নেই, আজও ছিল না। মনে হচ্ছিল বিছানার ওপর কে যেন এক রাশ কাকর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে—কেবলই ফুট্চে। মাথার মধ্যে কানের মধ্যে যেন অবিশ্রাম ঝিঁঝি ডাকছে। রাত তখন ঘন গভীর। কেউ কোথাও আর জেগে নেই। এত নীরব যে নিজের মনের কথাগুলি তখন স্পষ্ট নিজের কানেই শুন্তে পাওয়া যায়। বনলতা চোখ চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলো। আলোটা তখনও জলছে। মাথার কাছের জান্মলা দিয়ে শরতকালের মুখচোরা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আকাশে মাত্র গুটি কয়েক মিট্টিমিটে তারা—বাদুকি সমস্তটাই আসন্ন বৃষ্টির আভাস জানাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক-

টিক শব্দে ঘেন চারিদিকের নিষ্ঠৱজ্ঞ নিঃশব্দতাকে অবিশ্রাম বিন্দ করে' চলেছে।

আলোটা একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে কি যেন একটা অস্তুত খেয়ালের বশে বনলতা ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করে নিল। ওদিকের বিছানায় চঞ্চলা তখন নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বোধ করি গরম বোধ হওয়াতে গায়ের কাপড় ঝুলে দিয়েছে—মাথার খোপাও বালিশের ওপর এলিয়ে পড়েছে। বনলতা একবার কাছে গিয়ে দাঢ়ালো। মনে হলো, চঞ্চলা শুধু কালো নয়—কুৎসিৎ! চেহারার মধ্যে এতটুকু শ্রী কোথাও নেই। সর্বাঙ্গে যৌবনের একটি প্রাচুর্য আছে বটে কিন্তু এমনতর যৌবন পথে ঘাটে যে কোনো নারীর জীবনেও ত একবার করে' আসে! যৌবনই ত সব নয়—কুপের যে একটি মহৎ আভিজাত্য আছে! চঞ্চলার দৈহিক প্রাচুর্যের মধ্যে আন্তর্ভুক্তির একটি উদ্বাম পাশবিকতা যেন অতি কষ্টে আন্তর্গোপন করে' রয়েছে।

ঘৃণায় নাসাকুঞ্জ করে' মুখ ফেরাতেই চোখ পড়লো বড় আয়নাটার ওপর। তাই ত, একি সে! আজকের এই বিশ্বব্যাপী নিবিড় তামসী রাত্তির সে যেন প্রাণ-প্রতিমা! নিজের এতখানি রূপ সে ত কই নিজেও কোনোদিন দেখেনি! কিন্তু মনে হল, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সদৃশ তার রূপের ওপর দিয়ে যেন একটা মদমন্ত্র ঝঞ্চা বয়ে গেছে। মাথার ঝঞ্চ বিস্তৃত চুলের রাশি যেন লক্ষ লক্ষ ফণায় কাকে দংশন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ঝুলে পড়েছে। বনলতা কাছে সরে এল। কাছে এসে দেখলো হিংসার মাধুর্য চোখছুটিকে আরো যেন অপরূপ করে' তুলেছে, অধরে একটি তীক্ষ্ণ তিক্ত হাসি—এ হাসি এমনি মধুর যে একে বিদ্যায় দিতেও মন ওঠে না! আর রূপ! সে ত' প্রভাত-সূর্যকেও লজ্জা দিতে পারে।

বনলতা আরো কাছে সরে গেল। আপনার অপরিমিত যৌবনের প্রতিবিম্বকে সে যেন কিছুতেই আর এড়াতে পারছিল না। আপাদমন্ত্রক নগ্নতার প্রতি চেয়ে থাকার বাধাও কিছু নেই। মনে হলো, স্বকোমল পেলু দুখানি বাহুমূলের পাশে দু'টি উন্নত স্বগোল বুকের ওপর বড় বড় দু' ফোটা রক্ত জমে আছে। তার সমস্ত দেহখানি যেন মাঝের একটি শ্রেষ্ঠ মরণ-শয্যা! অধীর উদ্বাম আবেগে সারা ঘরময় পায়চারি করে' করে' আপনার অবারণ দেহখানিকে বনলতা দুই হাতে পীড়ন করতে লাগলো।

এত রূপ তার, তবে কেন রূপের প্রতিযোগিতায় চঞ্চলার কাছে সে এমন

তুচ্ছ হয়ে গেল ? যে অপমান আজ তাকে সহিতে হচ্ছে এ ত শুধু তার
দেহের প্রতি ! যে দেহ বিধাতারও বিশ্বাস !

স্ফীতনাসায় বনলতার বিষাক্ত নিশাস পড়ছিল। মেঝের উপর থেকে
আস্তে আস্তে পরনের কাপড়খানা সে তুলে' গায়ে জড়াতে লাগলো !

সেদিনের মেই অঙ্ককার নিঃশব্দ রাত্রেই ; লোক চক্ষুর আড়ালে,—
নিতান্ত গোপনে ।

দরজা খুলে নিঃশব্দে বনলতা রাস্তায় নেমে এল। পথের ওপর দিয়ে
সোঁ সোঁ করে' রাত্রির হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। গলির মোড়ে টিম টিম করে'
তেলের আলোটা জলছে ।

ডাক্তারের দরজায় উঠে সে অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়লো। ভিতর থেকে
তখনি সাড়া এল—কে ?

খুলুন ত একবার ?

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলেই বিনয় ভয়ানক চমকে উঠলো। বলল—
একি, আপনি ? কি ভাগিয় আমার ? বাবা আপনার ভাল আছেন ত ?

বনলতার গলা বঙ্গ হয়ে আসছিল। বলল—ইয়া, আপনি এখনো নৌচে
রয়েছেন ?

আজকাল রাত জেগে একটু পড়াশুনো করতে হচ্ছে, রোজই প্রায় ভোর
হয়ে যায়। আপনি এ সময় যে ? কি ব্যাপার ?

বনলতা মাথা হেঁট করে' রাইল। বিনয় কিছুই বুঝতে পারল না, নিতান্ত
বেয়াকুবের মত স্তুতি হয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঢ়িয়ে অক্ষমাং বিশ্বিত কঢ়ে বলল—
ওকি, আপনি কানচেন কেন ?

অশ্রদ্ধিক মুখখানি তুলে সোজা কথাটাই বনলতা বলে ফেললো—আমিহ
ত হেরে গেলাম। তুমি নাকি দিদিকে বিয়ে করবে ? সে কি তোমার
যোগ্য ?

আমার যোগ্য তবে কে ?

জানিনে। দিদিকে তোমার বিয়ে করা হবে না। সে তোমার উপযুক্ত
নয়।

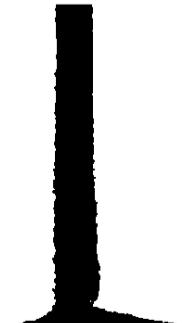
হতচকিত বিনয়ের মুখের ওপর কথাটা বলেই ফুল্তে ফুল্তে সে আবার
এসে নিজেদের বাড়ীতে চুক্লো ।

କୋଣେ ଏକବାଟେ

ଘରେର ଜାନଳାୟ ଗରାନ୍ ନେଇ ; କୋନ୍ ଅତୀତକାଳେ ଗୃହଷ୍ଠେର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଗରାନ୍ଦଗୁଲି ଆୟୁରକ୍ଷା କରତେ ପାରେନି, ତାରା ଧଂସ ହେଁଛେ । ପଞ୍ଜୀଆମେର ଏହି ଅନ୍ଧକାର ବାଟେ ସଦି କୋନ ବନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ି ଏସେ ଜାନଳା ଦିଯେ ଢୋକେ ତବେ ତାକେ ବାଧା ଦେଓଯା ଯାବେନା । ଦରଜାଗୁଲିର ପାଣୀ ନେଇ, ସନ୍ତ୍ଵତ: ଜନହୀନ ପୁରୀ ଦେଖେ ଗ୍ରାମେର ଲୋକେହି ସେଗୁଲି ଖୁଲେ ନିଯେ ଗେଛେ । ବାତାସେର ଶବ୍ଦେ ମନେ ହେଁଛେ, ବିଗତ ଦିନେର ମତ ନରନାରୀର ଶେଷ ନିଶ୍ଚାସ ଏଥିନୋ ବୁଝି ମିଳିଯେ ଯାଇନି ; ଆଜୋ ତାରା ଜୀବନେର କିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିଯେ ଅଶରୀରୀ ହେଁ ରହେଛେ । ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାରେ ଆମି ଏକବାର ମୁଖ ଫିରିଯେ ଦେଖିଲାମ । ଦେଖିଲାମ ନା କିଛୁଇ, କିନ୍ତୁ ଚାମଚିକାର ପାଥାର ଶବ୍ଦଟା ଏଥିନୋ ଶୁନତେ ପାଞ୍ଚି,—ଶୁନତେ ପାଞ୍ଚି ଘରେର କଡ଼ିକାଟେ ପୋକା ଏଥିନୋ ଘୁରେ ଘୁରେ ଥାଏଁ ; ଭିତରେର ଦେଇଲେ ଯେ ଛୋଟ ବଟଗାଛଟା ଶିକଡ଼ ବିସ୍ତାର କ'ରେ ମେଘେର ଦିକେ ନେମେ ଏସେଛେ, ତାର ଏକଟି ଶାଖା ଗଲା ବାଡ଼ିଯେ ଆକାଶେର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହବାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ,—ତାରଇ ତଳାୟ କୋଥାର ଡାକଛେ ବିଁବିଁ, କୋଥାଯ ଶୁନଛି ନାନା ପୋକାର ସଶ୍ଵତ ଜଟଳା,—ଅନ୍ଧକାରକୁ ତାରା ଯେନ ଗଭୀର ଭାଷାୟ ଭବେ ତୁଳଛେ, ଯେନ ନିଶ୍ଚିଥ ରାତ୍ରିର ଆୟୁର ବାଣୀ ।

ଏକାନ୍ତେ ଏକଟି ବିଛାନା ପେତେଛି, ଭାବଛି ମଶାରି ଟାଙ୍ଗାନୋ ନିତାନ୍ତଇ ଦରକାର । ଏଥାନେ ବାସ କରିବାର ଆୟୋଜନ ନେଇ, ଥାକବାର କଥା ଓ ନୟ ; ଆଜ ବିକାଳ ବେଳାୟାଓ ଏହି ଅକଣ୍ଠିତ ନିର୍ବାସନେର ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ତ୍ଵନା ଓ ଜାନା ଯାଇନି । ମୋମବାତି ଏକଟୁଖାନି ଛିଲ, ସେଟୁକୁ ଜଲେ ଜଲେ ଶେଷ ହେଁ ଗେଛେ । ଦେଶଲାଇଟ୍ଟା ବାର ବାର ଜାଲତେ ଭୟ ହେଁ—ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ବସେ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରତେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଚିପ ଚିପ କରେ । ହୀ, ଆମି ନାର୍ତ୍ତାସ । ଆୟୁପ୍ରକାଶ କରତେ ଆମାର ଭୟ ଲାଗଛେ ।

ଭଗ୍ନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜନହୀନ ପ୍ରାସାଦେର ଏକଥାନି କଙ୍କାଳ—ଶୁମ୍ଖେ ଥାନିକଟା ଖୋଲା ମାଠ, ତାରଇ ଉପର କୟେକଟା ନିଷଫଳ ନାରିକେଳ ଗାଛ ଭୂତେର ମତୋ ଦୀଢ଼ିଯେ ରହେଛେ । ତାଦେରଇ ଅଦୂରେ ଏକଟା ବାଣୀର ବନ । ଏତକ୍ଷଣେ ପଥେର ଧାରେ ଏକଟି ଆଲୋକେର ବୈଧ ଦେଖା ଗେଲ ; ସେ ଆଲୋ ନିକଟତର ହେଁ ଆସଛେ । ଏକଟୁ ଆଶ୍ରମ ହଲାମ ।



আলোটা এসে চুকলো অন্দরে, সোজা উঠান পার হয়ে চৌকাঠ ডিক্কিয়ে
এসে দাঢ়ালো আমার কাছে। এতক্ষণ যেন অভিভূত হয়েছিলাম, এবার
বললাম, মশারি এনেছ?

চন্দ্রনাথ একটু হাসলো। বললে, এরা কাছাকাছি থাকে কিন্তু কামড়ায়
না। তোমার এত প্রাণের ভয়?

—প্রাণের ভয় নয়, সাপের ভয়!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পুনরায় বললাম, তোমার জগ্নে, এবার বুঝেছি
তোমার জগ্নে গাড়ী ফেল হয়ে গেল। আমি চলে যেতে পারতাম, পৌছতে
পারতাম এতক্ষণে নিজের দেশে, শহরে—এ শাস্তি হলো কেবল তোমার
জগ্নে।

চন্দ্রনাথ বললে, সবই নিয়মিতির কাও, বুঝলে হে?

—চুপ, তুমি চুপ কর চন্দ্রনাথ; তুমি যা বলো শুনবো, শুনবো না তোমার
নিয়মিতি, তোমার দর্শন, তোমার প্রলাপ; তুমি চুপ করো চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, মশারি এনেছি আলোটাও নিয়ে এলাম তোমার জগ্নে।
তোমার যেন কষ্ট না হয়; কারণ তুমি অতিথি।

—বেশ, আর কিছু দরকার নেই, এবার তুমি যাও। না না, গল্প করতে
আমি ভালবাসিনে ও আমার ফঁচি নয়। এবার তুমি যাও।

—যাবো কোথায়, আমি যে থাকতে এলাম—

—থাকতে এলে? মানে? থাকতে চাও তুমি আমার কাছে?—
বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলাম,—তোমাকে আমি সহ করতে পারিনে
চন্দ্রনাথ, তোমার দিকে তাকালে ভয়ে আমার গলা বুজে আসে, হতাশায়
আমার চোখ কাঁপে,—তুমি চলে যাও, তুমি থাকলে এই অঙ্ককার আরো
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে; তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।

ভিজা তবলার উপর হাত চাপড়ালে যেমন তার শব্দ হয় তেমনি আমাদের
হজনের গলার আওয়াজ এই ভগ্ন কক্ষের কোণে-কোণে চৰ চৰ করতে
লাগলো। চন্দ্রনাথ বলে, ইঁয়া, মতলব আমার একটু ছিল; ইচ্ছে ছিল ট্রেণটা
যেন তোমার ফস্কে যায়, অনেক দিন তোমার সঙ্গে গল্প করিনি।

—গল্প করবো তোমার সঙ্গে? কেমন গল্প সে?

—কিন্তু আগে ত তুমি বেশ গল্প করতে আমার সঙ্গে?

—আগে করতাম, এখন নয়। আগে মাঝুষের উপর তোমার শুক্রা ছিল,

তুমি মূল্য বুঝতে স্নেহ-মমতার—ধাক চন্দ্রনাথ, সে তোমার গত জন্ম, তুমি
সেদিন মাহুষের মধ্যে মাহুষ ছিলে। কিন্তু আজ তুমি ধাও, তুমি কাছে
ধাকলে আমার সব আশা, সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়।

—স্বপ্ন ?—চন্দ্রনাথ ঠোঁট উল্টে আবার হাসল। আমি চিনি তার হাসি,
তার হাসির বাহু চেহারাটা নির্মল ও মধুর কিন্তু সে হাসির প্রাণ বিষে ভরা,
বিজ্ঞপ্তে জর্জরিত অপরিসীম তাছিল্যের সঙ্গে মেশানো অপরিমিত অবিশ্বাস।
বললে, এখনো স্বপ্ন দেখছো নাকি ?

—ইঝা, দেখছি, লজ্জা কিছু নেই। স্বপ্ন দেখছি ; বিংশ শতাব্দীতে এখনো
স্বপ্ন দেখি, প্রাচীন বলে তাকে ঠাট্টা করবে, এই ত ? করো। আমার
হৃদয়ে আছে সম্ভল, তাকে আমি মরতে দেবো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, আমার কথা তাহলে তুমি শুনবে না, কেমন ?

—না—আমি বললাম, শোনবার মতো কথা তোমার কিছু নেই। জানি
তুমি যা বলবে ; তোমার মনের চেহারা আমি জানি, এই রাত্রির চেয়েও
তুমি ভয়ঙ্কর। তোমার কাছে এলে আমার সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।
নিষ্পূর্ণ হয়ে যায় আমার যা কিছু—

—কিন্তু তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—ভয় পাই, বড় এলে যেমন ভয় পায় গাছপালা, আগুন জলে উঠলে
যেমন ভয় পায় বাতাস ; চন্দ্রনাথ, তোমাকে দেখলে মনে হয়, জীবনের
কোনো অর্থ নেই ; বন্ধুত্ব, বাংসল্য, দয়া, প্রেম সব নির্বাক !

চন্দ্রনাথ আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর একটু হেসে বললে,
তুমি বড় দুর্বিল হে, বড় ভঙ্গুর !

—ইঝা, বড় দুর্বিল, বড় ভঙ্গুর। এই ভালো, বেশ আছি। আমি বুঝতে
চাইনে তোমার সহজ কথাটা শান্তা চোখে। আমি বুঝতে চাইনে তোমার
ইউটিলিটির কথা। আমার চোখে ধাকুক কাজল, মনে ধাকুক রঙ, আমার
ভাল লাগে মেঘের মাঝা, গাছের ছায়া। তুমি আমাকে বারে বারে
মরুভূমির পথ দেখিয়ে দিয়ো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, তোমার মন দেখছি বুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল নয়।

—না হোক—আমি বললাম,—বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির উদ্বৃত্ত তাল-ঠোকাঠুকি।
সেখানে কোথাও প্রাণের ঐশ্বর্য নেই, সেখানে কেবল বস্ত্র ভার, লগেজের
উপরে লগেজ, আঘাতে আর সংঘাতে উৎপীড়িত।

—কিন্তু তোমার ভাল লাগে কি, শুনি ?

—তোমাকে সে সব কথা বলতে প্রযুক্তি হয় না, চন্দ্রনাথ তুমি তার অধিকারী নও। এমন কথায়ে বলে প্রেমের ফুল ফোটে দেহ-লালসার জীব থেকে, যে কেনো মহাআর জন্ম বৃত্তান্ত অতি কলঙ্কময়—তার সঙ্গে আমার তর্ক নেই। আমি একথা জানতে চাইনে স্মর্যকিরণ মানে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণধারণের রস, যেখ মানে শস্ত্রক্ষেত্রের ইউটিলিট, নদী মানে লোকের তৃষ্ণার জল !

—আর প্রেম ? বিজ্ঞপ্ত করে হেসে বললে চন্দ্রনাথ।—শুন্বে আমি একটা বেশ জুতসই প্রেমের গল্প বলবো ?

—না, না চন্দ্রনাথ, না। সব সইবে, কিন্তু সইবে না তোমার প্রেমের গল্প। তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়ে না, প্রেম মানে বিধাতার জীবস্থষ্টির চক্রান্ত। বোঝাতে চেয়ে না পরম্পরের স্বাযুতন্ত্রিক উভ্রেজনা, ইমোগ্ন মানে শিরার সঙ্গে শিরার কলহ-কোলাহল।

চন্দ্রনাথ বললে, কিন্তু হৃদয় বলে নাকি একটা পদাৰ্থ আছে তোমাদের।

রাত্রি হয়ত বাশে হয়ে এসেছিল। বহু চেষ্টা করলাম চন্দ্রনাথকে বিতাড়িত করবার জন্য। সে গেল না, অপমান করলেও সে মানে না। আলোটা জলতে লাগলো, মশারী টাঙ্গানো হলো না, সেও বসে রইলো চুপ করে। তার মতো চরিত্রবান মানুষ আমি দেখিনি, কিন্তু চরিত্রই তার উন্নতির পক্ষে বাধা, সৌজন্যের জগ্নই সংসার থেকে সে বরখাস্ত হয়েছে।

—এই যারা বড় হয়েছে তাদের সত্যিকার ইতিহাস তুমি জানো ? যাদের নাম ছাপালে খবরের কাগজ বিকৌ হয়, যারা হয় বড়-বড় সভার সভাপতি, রাষ্ট্রনেতা বলে যারা নিজেদের নাম জাহির করেছে, সমাজ-সংস্কারক বলে যারা পরিচিত। তাদের কথা বলব তোমাদের কাছে ? —চন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, নাম শুন্লেই তুমি চিনবে তাদের ? প্রতিদিনের জীবনে কি দৈন্য আর ক্ষুভ্রতা, তুমি শুন্লে অবাক হয়ে যাবে।

বললাম, এর দ্বারা তুমি কি বলতে চাও ?

—বলতে কিছুই চাইনে ; দেখি, তাই বলে যাই। ইচ্ছে যায় তোমাদের সমালোচনা করতে। বড় হলেই বড় হওয়া যায় না। বড় মানুষ তুমি দেখেছ ? জানো বড় মানুষ কাকে বলে ?

—যাক চন্দ্রনাথ, উভেজনায় তুমি হয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তুমি সীমা ছাড়ালেই আমি যাবো ভেসে। এখন বলো তোমার প্রেমের গল্প।

—কাহিনীই আছে কিন্তু প্রেম নয়—চন্দ্রনাথ বললে, সেই কিন্তু আর সেই কিন্তুমাং, সেই চিরপুরাতন, কেবল চালের তফাং, কেবল তফাং ঘটনার—

—তবুত সবাই শুন্তে চায় চন্দ্রনাথ !

—শুন্তে চায়, তার কারণ, মাঝুষ যে কখনো পুরোনো হয় না মাঝুষের কাছে, আনন্দ বেদনার নানা চেহারা, নানান ষাইল, সে ত তুমি জানো !

এমনিই চন্দ্রনাথ জীবনে দেখেছে অনেক, তাই তাকে ভয় করে। তার অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক ইতিহাস, অনেক সহ্য করেছে সে, সাধারণ মাঝুষ তাই তাকে সহ্য করতে পারে না, ভয় পায়। মাঝুষের কোনো ক্রটি তার চোখ এড়ায় না, মনে হয় সে যেন সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে।

তুমি কি পেয়েছ এতকাল ?—চন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, অনেক ত ভালোবেসেছ, অনেক দোলায় দুলেছ, কী পেয়েছ বলো ত ?

বললাম, পাবার জগ্নই বা এত লালায়িত কেন ? না পেলেও ত চলে যায় মাঝুষের।

—চলে না। ব'লে চন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় বললে, চলে না হে, চলে না ; কিন্তু দোষ কার জানো ?—তোমার ! যরুণভূমির উপর দিয়ে ত মেঘ চলে যায় কিন্তু দোষ মেঘের নয়, তোমার। তুমি কেবল ফাঁকি দিলে, কেবল আঘ্যাপ্রবঞ্চনা, কেবল রইলে জ্ঞানের অভিমান নিয়ে, বুদ্ধির দস্ত নিয়ে। তোমার উপর বর্ণ হবে কেমন করে ? কী আছে তোমার সহ্যল ?

নীরবে বসে রইলাম। হঠাং পুনরায় উভেজিত হয়ে চন্দ্রনাথ বললে, তোমারি কি কম গলদ ? কেবল ভঙ্গি, কেবল কসরৎ, এক ছটাকও পুঁজি তোমার নেই। ওপরে তোমার যত পালিশ ভেতরে তত দৈত্য : কাঁচের মতো তুমি সৌধীন, পাশ্চাৎ মেঘের মতো তোমার সাজসজ্জার চটক, কেবল বিজ্ঞাপন, শুধু আড়ম্বর—সত্যকার জীবনের সঙ্গে তোমাদের কোন পরিচয় নেই। পুঁথিগত বিশ্বে তোমাদের, তোমরা জীবনের ব্যাখ্যা করো। চায়ের দোকানে বসে। মিথ্যা নিয়ে পরের মুখের বুকনি নিয়ে তোমাদের ফলাও কাজ কারবার।

এবার সে চুপ করলো, আমিও বাঁচলাম। মাহুষ নেশার মুখেও এর চেয়ে
যুক্তিযুক্ত কথা বলে। চন্দনাথের মাথার একটা ঝুঁআলগা রেখে বিধাতা
তার সঙ্গে একটু বিজ্ঞপ্ত করেছেন।

তোর 'হয়ে এল বোধ হয়, বাঁশের বন একটু-একটু স্বচ্ছ হয়ে আসছে।
বললাম, প্রথম ট্রেণেই আমি যাবো কিন্তু, সাড়ে ছ'টায় গাড়ী নম?'

চন্দনাথ বললে, ইয়া, একটু ঘুমোও, আমি ঠিক সময় জাগিয়ে দেবো।
মশারীটা এবার ফেলে দিই, কেমন? বলে সে বেমকার মতো চোখ বুজে
পাশ ফিরে ঘুমুলো।

কল্পান্ত

ছোড়দিদির বাড়ীটা ছিল বেলেঘাটার শেষপ্রান্তে। এমন একটা ঠিকানা, যেটা খুঁজে বা'র করতে অমলকে বিশেষ বেগ পেতে হোলো। অমলের বহু নৃপেন নাগপুর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তোরা যদি জাপানীদের ভয়ে নিতান্তই কলকাতা ছেড়ে পালাস, তবে আমার ছোড়দি বেচারীকেও ষেখানে হোক নিয়ে যাস, ও বেচারীর কেউ নেই।

অমল ভয় পায়নি, কিন্তু বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট ভয় পেয়েছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পরেই গভর্ণমেন্ট কাপতে কাপতে জানালো, যারা কোন সরকারী কাজ করে না, তারা পালিয়ে যাক। স্বতরাং লক্ষ লক্ষ লোকের মতন অমলও তার বাড়ীর লোকদের এখানে ওখানে সরাতে লাগলো। কেউ কাশী, কেউ পাটনা, কেউ বর্ধমান, কেউ বা রাণাঘাট।

নৃপেনের চিঠিতে ছোড়দিদির ঠিকানাটা ঠিকই ছিল, তবে সহরতলীর গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে নাম নস্বরহীন বাড়ীটা খুঁজে পেতে বেলা অনেক বেড়ে গেল। তখন শীতের শেষ।

বহুর সহোদরাকে অমলও ছোটবেলা থেকে ছোড়দিদি ব'লে ডাকে। তবে এটা ছোড়দিদির শুন্মুক্তবাড়ী। এ বাড়ীতে স্টান ঢোকবার আগে অমল বাইরে থেকে ডাকলো, কেউ আছেন নাকি?

ডাকাডাকি করতে করতে বছর পনেরো বয়সের একটি ফুটফুটে মেঝে দরজার কাছাকাছি এসে বললে, কে?

আমি অমল, ছোড়দিদি আছেন?

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। মেঝেটি হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে, একি, অমল মামা, কী ভাগিয়ে আমাদের? আস্তুন?

অমল ভিতরে ঢুকে বললে, কেমন আছিস তোরা টুহু? এখনও পালাসনি?

কোথায় পালাবো বলুন? এপাড়ায় ত সবাই চলে গেছে। আমরা এখনও আছি, সঙ্কেত পরে কী ভয় করে?

ভয় কা'কে রে?

কেন, চোরের ভয়?

অমল বললে, পাগলি চোরের প্রাণভয় আরো বেশী,—তারাও পালিয়ে
গেছে সকলের সঙ্গে।

টুহু হাসতে লাগলো।

এমন সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ছোড়দিদি এলেন। তিনি বিধবা, বয়স
আন্দাজ বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি শান্ত নন্দ কঠে বললেন, এসো ভাই—
দিদিকে মনে পড়লো?

অমল নৃপেনের চিঠিখানা বা'র ক'রে বললে, আমাদের সঙ্গে সে আপনাকে
থেতে বলেছে। নৃপেন খুব ব্যস্ত হয়েছে আপনাদের জন্য।

ছোড়দিদি প্রশ্ন করলেন, সবাই বুঝি পালাচ্ছ? তোমার ভাই বোনেরাও?

অমল বললে, ইঝা, এক একদলে এক একদিকে পালিয়েছে, তবে কাকা
আর কাকীমা এখনও যাননি।

তোমার বাবা?

অমর বললে, বাবা ত এখানে থাকেন না। মা মারা যাবার পর থেকেই
তিনি কাশী গিয়ে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করেন। আপনার এখানে আর
কাউকে দেখছিনে যে? আপনার ভাস্তুর কই?

ছোড়দিদি নত নন্দ মুখে বললেন, তিনি সপরিবারে চ'লে গেছেন নলহাটি।
বড় তরফের ওঁরাও আজ আটদিন হোলো পালিয়ে গেছেন।

অমল বললে, আপনার দিদিশাঙ্কড়ী আর রাজাদিদিরা?

ঁৱা ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে গেছেন মালদা।

সহসা অমল একটু চাপা অভিমানে ফুলে উঠলো। বললে, নৃপেন আমাকে
সবদিক ভেবেই লিখেছে। আচ্ছা ছোড়দিদি, সত্যি বলুন ত?

সম্মেহ শান্ত হেসে ছোড়দিদি বললেন, কি ভাই?

অমল বললে, এটা আপনার শুণেরের ভিটে, এখানে দাঢ়িয়ে কারো নিন্দে
করতে চাইনে! কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনাকে ফেলে সবাই
পালিয়েছে! আপনি বিধবা, সহায় সম্বল নেই, আপনি লোকের বোৰা।

ছি ভাই অমল, এসব কথা বলতে নেই!

কেন বলবোনা ছোড়দি?—অমল বললে, আপনি হিন্দুঘরের বিধবা,
পরের দয়ায় মেয়েটাকে থাইয়ে পরিয়ে আপনার দিন কাটে, আপনার জন্য
পাঁচসের আলোচাল দিতে ওঁদের গায়ে লাগে, চিরদিন ওঁদের অনাচার আপনি
মুখবুজে সইলেন—

অমল ! যাক ভাই ওসব কথা ।

অমল বললে, ছোড়দি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে দাঢ়িয়ে কিছু বলা আমার অধিকারের বাইরে, আপনি হয়ত পছন্দ করবেন না। কিন্তু যারা পালিয়ে গেল তাদের প্রাণের চেয়ে আপনার আর টুম্বুর প্রাণের দাম কি কম ?

ক্ষেত্রে ও সমবেদনায় অমলের চোখ দুটো বাঞ্পাছফ হয়ে এলো। ছোড়দিদি কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। সহসা এক সময়ে সহান্ত্ব মিষ্টিকষ্টে বললেন, তুমি একটা কথা ভেবে দেখনি ভাই, আমরা চলে গেলে এবাড়ী যে একেবারে থালি ! এত বড় পুরোনো বাড়ী...দক্ষিণ দিকে পাঁচিল নেই...সঙ্ক্ষেয় আলো পড়বে না—আমার গেলে চলবে কেন ভাই ?

অমল বললে, কিন্তু একা এখানে থাকলে আপনার চলবে কেমন ক'রে ছোড়দি ? তা ছাড়া টুম্বু এখন একটু বড় হয়েছে।

ছোড়দিদি বললেন, সেই জগ্নই আরো কোথাও যেতে সাহস নেই ভাই। এত বড় মেয়ে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে যাবো বলো ? বরং ভাত কাপড় না জোটে, নিজেদের পড়ো ঘরখানার মধ্যে ত' পড়ে থাকতে পারবো ? তাতে মান বাঁচবে—কেউ দেখতেও আসছে না।

এমন সময় টুম্বু এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এলো। হেসে বললে, ভাই-বোনে দেখা হলে আর রক্ষে নেই। বক্তৃতা চলছে ত ? এবার—আপনি কবে পালাচ্ছেন বলুন ত অমল মামা ?

আমি কোথাও যাব না টুম্বু।

যাবেন না, তা'হলে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসবেন ত ?

অমল হেসে বললে, জাপানীরা যদি না আসে তবে এক আধিবার আসবো বৈকি ।

ছোড়দিদি আর টুম্বু দুজনেই হেসে উঠলো। মাঝের পাশে ব'সে বললে, অমল মামা, এবার কিন্তু একটা মজা দেখলুম। সবাই পালাচ্ছে বটে—মেয়েরা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তারা সবাই হেসে আর আমোদে কুটিকুটি। পুরুষমাঝুষরাই ভয় পেয়ে দৌড় দিচ্ছে, আর মেয়েদের ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে, তাই না ?

অমল হাসিমুখে টুম্বুর দিকে তাকাল। টুম্বু পুনরায় বললে, মেয়েরা বেশ মজা পেয়ে গেছে এবার। এই দেখুন না, ওবাড়ীর লোকেরা তিরিশ টাকা

দিয়ে এক একখানা গন্ধর গাড়ী ভাড়া করে আনলো—এখান থেকে হাওড়া
ইষ্টিশান। মেজগিলী সঙ্গে নিল টিপ্পাখী, মেনিবেড়াল, এক প্যাকেট তাস,
একটা লুড়ুর সেট... তারপর কত যে শাড়ী আর জামা—

অমল বললৈ, তোমার ভয় করে না, টুমু ?

আমার ? একটু না। ভয় করলেই ভয় বাড়ে।

যদি জাপানীরা বোমা ফেলে, কিংবা আক্রমণ করে ?

করুক।

তখন কি করবে তুমি ?

টুমু বললৈ, ইংরেজরা কি করবে তাই আগে শুনি ?

ছোড়দিদি ও অমল দু'জনেই খুব হেসে উঠলো।

অমল এই অবসরে চারিদিকে একবার তাকালো। এককালে অবস্থা
এদের বেশ ভালোই ছিল কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় এসে দাঢ়িয়েছে
যে, জীবনযাত্রাটা এখন দুরহ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য আর অনটন এবাড়ীর
সর্বজ স্ম্পষ্ট। উপার্জনের কেউ নেই, অদূরভবিষ্যতে যে স্বদীর্ঘ দৃঃসময়
আসছে—সে অবস্থাটাকে প্রতিরোধ ক'রে শক্ত হয়ে হাল ধরার মতো
মাঝুষও নেই। এই দুটি নারীর দিন কেমন ক'রে কাটিবে বলা কঠিন।

কি কথা ব'লে অমল তখনকার মতো বিদায় নেবে ভাবছে এমন সময়
থিড়কি দৱজা পেরিয়ে একটা বৃক্ষ মুজুদেহে কাপতে কাপতে এই দিকে
এলেন। তাকে দেখে ছোড়দিদি একটু ঘোমটা টেনে উঠে দাঢ়িয়ে মৃদুকষ্টে
বললেন, তুমি একটু বসো ভাই, ঠাকুরঘরের পূজোটা সেৱে আসি। টুমু,
মামার কাছে একটু বোস মা।

বৃক্ষ এসে বললেন, এ ছেলেটি কে, ভাই ?

টুমু বললৈ, আমার মেজমামার বন্ধু,—অমলমামা !

ও, তা বেশ। একটু কিছু খেতে দেনা দিদি ! ওই যে সেই মুগের নাড়ু
আছে ঘরে... ওই যে সেদিন দিয়ে গেল ওবাড়ীর ন'বো—

আচ্ছা দেবো, তুমি কাপড় ছাড়োগে' রাজাদিদি—

বুড়ী ধীরে ধীরে চলে গেল। এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার কোন অক
গহৰের দিকে গিয়ে বুড়ি চুকলো,—আর তা'র সন্ধান পাওয়া গেল না।

টুমু বললৈ, অমলমামা, আপনাকে কিন্তু কিছুই খেতে দিতে পারবো না।

টুমুর সলজ্জ নতমুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিপন্নভাবে অমল বললৈ,

খাবার কথা ভাবছো কেন? এইত চা খেলুম, আবার কি! এবার আমি
উঠবো, টুশু—

কিম্বৎক্ষণ পরে ছোড়দিদি শান্ত পদক্ষেপে এসে দাঢ়ালেন। অমল বললে,
তাহ'লে আমি নৃপেনকে কি লিখবো, ছোড়দি?

ছোড়দিদি বললেন, তুমি লিখে দিয়ো আমরা বেশ ভালো আছি!

আপনারা তাহ'লে কোথাও যাচ্ছেন না?

হাসিমুখে ছোড়দিদি বললেন, ভগবান কি করবেন তা ত' আর জানিনে
ভাই। তাঁর মনে কি আছে তাও বুঝিনে, তবে আপাততঃ এখান থেকে
কোথাও যাবার উপায় আমাদের নেই।

অমল বললে, অবিশ্বি প্রাণভয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে
এক জায়গায় শক্ত হয়ে দাঢ়িয়ে থাকাই ভালো।

ছোড়দিদি হেসে বললেন, পালাবার মতন টাকাও আমাদের নেই। তা
ছাড়া অত বড় মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো ভাই? দিনকাল একেই
ত' ভালো নয়,—চারদিকে মিলিটারি। কিছু একটা ঘটলে খণ্ডবাড়ী, বাপের
বাড়ী—সকলেরই বদ্নাম। তুমি নৃপেনকে লিখে দিয়ো অমল, আমরা
কোথায়ও যাবো না।

আচ্ছা, আমি তবে এখন উঠি ছোড়দি—এই ব'লে অমল উঠে দাঢ়ালো।
হেসে পুনরায় বললে, টুশু, জাপানীরা যদি আসে তাহ'লে কান ম'লেই
তাড়িয়ো, কেমন?

টুশু বললে, ইয়া অমলমায়া, ভাঙ্গা বদ্দুকের বদলে ভাঙ্গা বঁটিখানা রাইলো
ঘরে। ওরা তা'তেই ভয়ে পালাবে।

অমল হাসিমুখে বেরিয়ে সদর দরজা অবধি গেল, তারপর সহসা
কি মনে ক'রে ফিরে এলো। বললে, ছোড়দি, আসল কথাটাই ভুলে
গেছি।

কি ভাই?

নাপপুর থেকে নৃপেন পঁচিশটে টাকা পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে—
এই নিন। এই ব'লে অমল পকেট থেকে টাকা বা'র করলো।

ছোড়দিদি বললেন, আমার এখানে না পাঠিয়ে তোমার কাছে পাঠালো
কেন? সত্য নৃপেন পাঠিয়েছে ত?

নিজের মুখের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে অমল হেসে উঠলো। বললে,

সে কি আর জানে আপনি এখানে এখনো আছেন? হয়ত পালিয়ে গেছেন কোথাও, সে মনে করেছে!

অঙ্কুর ক'রে ছোড়দি কি যেন ভাবলেন পরে বললেন, ইয়া, এটা বিশ্বাসযোগ্য! আচ্ছা,—খুব উপকার করলে তুমি, ভাই।

টাকা দিয়ে বিদায় সন্তান জানিয়ে অমল সেদিনকার মতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল। পাছে হঠাত পিছন থেকে ডেকে ছোড়দিদি কি মনে ক'রে প'চিশটে টাকা ফেরৎ দেন—এজন্ত অমল হন् হন् ক'রে গলির বাঁকে এক দিকে অদৃশ হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেশের ইতিহাসটা বদলাতে লাগলো! মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিদেশ থেকে ঘুরে এসে অমল দেখলো, কলকাতা থেকে বেশীর ভাগ লোক একেবারেই পালিয়েছে। পথে সঙ্ক্ষয় আলো জলে না, রাত্রের দিকে রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলতে গেলে গা ছম ছম করে। দিনের বেলা উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার যতদূর দেখা যায়—পথ ঘাট জনবিবল। হাজার হাজার বাড়ীঘর শৃঙ্খল, দোকানপাট নিশ্চিহ্ন! দিবালোকে তখন দেশীয় লোকের পালায়, আর রাত্রির অঙ্ককারে গা ঢাকা দিয়ে ইউরোপীয়রা পালায় স্পেশাল ট্রেণযোগে। মৃত্যুভয়ভীত, আতঙ্কিত সন্তুষ্ট জনসাধারণ।

অমল আর ছোড়দিদিদের ওখানে গেল না। বোমা যখন পড়েনি, এবং জাপানীয়াও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসে পৌছয়নি তখন যেমন ক'রেই হোক তাদের দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি। অনেক দিন পরে নৃপেনের কাছ থেকে অমল একখানা চিঠি পেলো, নৃপেন নাগপুর থেকে বিশেষ মিলিটারী কাজে বোঝাই চ'লে গেছে। যুদ্ধ থামার আগে হয়ত সে আর কলকাতায় ফিরতে পারবে না!

তখন বর্ষাকাল, ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব চলছে। দেশের সর্বত্র হত্যাকাণ্ড, অরাজকতা ও সম্পত্তিনাশ ঘটছে। অমল ভাবলো, ছোড়দিদিরা মেঘেছেলে, স্বতরাং ছশ্চিন্তার কারণ নেই। তা'র নিজের বাড়ীতে প্রায় সকলেই ফিরে এসেছে। জাপানীয়া বর্ষা দখল ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছে, এক আধবার বোমা ফেলে যাচ্ছে ভারতের এখানে ওখানে,—এর বেশী কিছু না। কলকাতা এখনও নিরাপদ,—স্বতরাং ছোড়দিদির খবর নেবার আছেই বা কি।

শীতকাল দেখা দিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো। অবস্থা অনেকটা যেন নিষ্ঠেজ হয়ে এলো। ইতিমধ্যে ভারতের সামরিক শক্তি অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং জনসাধারণ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করেছে। তবে জাপান-বেতারে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তা'রা শীঘ্ৰই প্ৰবল শক্তিতে ভারত আক্ৰমণ কৰিব। এদেশে তখন প্ৰচুৱ পৱিমাণে ইংৰাজ বিদ্বেষ জমে উঠেছে। অমল ভাবছিল, কি হয়, কি হয়!

এমন সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কলকাতায় জাপানী বোমাৰ্বণ সুন্ধ হয়। এতদিন পৱে যেন পালে বাঘ পড়লো! বিপদ যতদিন আসন্ন ছিল ততদিনই আতঙ্ক, যেদিন সেই বিপদ সত্য সত্যই এলো, সেদিন অমল মনে মনে বললে, ও এই তুমি? এৱ বেশী কিছু নয়?

আবার সেই লক্ষ লক্ষ লোকেৱ পলায়ন। উন্মত্ত, মৃঢ় অঙ্ক ও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্ত জনসাধারণ ছুটেছে...ছুটেছে...যেদিকে দু'চোখ যায়। রোগে অপঘাতে, দুর্ঘটনায় যত পলায়মান নৱনারীৰ মৃত্যু ঘটলো,—বোমাৰ্বণে তা'ৰ শতাংশেৱ এক অংশও মারা যায়নি। কলকাতাটা সাতদিনেৱ মধ্যে শুশান হয়ে গেল। অমল দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে দেখলো সব।

বেলেঘাটাৰ ওদিকে বোমা পড়েনি, তবুও অমল ছোড়দিদিৰ একটা খবৰ নেবে ভাবছিল, এমন সময় বোমাই থেকে নৃপেনেৰ তাৰ এলো, তোমৰা আৱ ছোড়দিদিৰা কেমন আছ শীঘ্ৰ জানাও।

অমল তাড়াতাড়ি চ'লে গেল বেলেঘাটাৰ ওদিকে।

তখন মধ্যাহ্ন, শুতৰাং পথঘাট চেনাৰ কোনো অস্থিধা নেই, এবং তা'ৰ পৱিচিত পথ—ভুলে যাবাৰ কথা নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ একই গলিৰ মধ্যে ঘোৱাফেৱা ক'ৱে নম্বৰ মিলিয়ে অমল একই বাড়ীৰ সামনে এসে দাঢ়ালো। সন্দেহ নাই, এইটই ছোড়দিদিৰে বাড়ী, সেই শুবিস্তৃত পুৱনো পাঁচিল, মোতলাৰ ভাঙা অংশটা তেমনই রয়েছে, পুৱনো দৱজাটাও সেই একইভাৱে দাঢ়িয়ে—, তবু সমস্ত বাড়ীটাৰ চেহাৱা ফিৰে গেছে! বাড়ীৰ ধাৰে আগে এই টিউব-ওয়েলটি ছিল না, আজকাল এটা নতুন হয়েছে। সেই বাড়ী কিন্তু সেই আগেকাৱ বাড়ী নয়। ভিতৱে কা'দেৱ যেন একটা কলৱব চলছে,—একটা মস্ত সমাৱোহ।

হয়ত কোথাও কেউ অমলেৱ সন্দেহজনক গতিভঙ্গী লক্ষ্য ক'ৱে থাকবে, —তাকে নিৰ্বোধেৱ মতন অমনি দাঢ়ায়ে থাকতে দেখে সহসা একটি থাকি পোষাকপৱা লোক এগিয়ে এসে বললে, এই—ক্যা দেখতা?

অকস্মাৎ অমল হকচিয়ে গেল। বললে, আমার লোক এখানে
থাকতো।

ক্যা? তুমারা আদমি?—লোকটা কাছে এগিয়ো এলো।

অমর বললে,—ইয়া, এ কোঠি হামারি বহিনকা!

হিয়া কোই নেই,—এ মিলিটারী ব্যারাক থায়...যাও।

অমল মৃঢ়ের মতো কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। সেইদিনই
সে বোমাইতে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে জানালো, ছোড়দিদিরা কোথায় চ'লে
গেছে, তা সে জানে না। তাদের বাড়ীঘর মিলিটারীর লোকেরা দখল করেছে।

কয়েকদিন অবধি অমল অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জায়গায় খবর
নিয়েছে, কিন্তু ছোড়দিদির কোন সন্ধান না পেয়ে মাস তিনেক পরে একদিন
সত্যই সে হাল ছেড়ে দিল। ছোড়দিদি হলেন তা'র বন্ধুর দিদি, এক
সন্ত্রান্ত পরিবারের কুলবধু। তার স্বক্ষে অতিশয় উদ্বেগ এবং কৌতুহল
খানিকটা বেমানান বৈ কি। অমল সেদিকে আর জ্ঞেপ না ক'রে নিজের
কাজে মন দিল।

দেশের দিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্তটাই আতঙ্ক পাঞ্চুর নৈরাশ্যময় এবং
—জনজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অথচ ভিতরে কী বিপুল
পরিবর্তন—কোথাও স্থিতিশীলতা নেই। অমলের বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে
গেল—ভাগ্যচক্রে তারা সবাই ঘূর্ণ্যমান। যারা নীচে ছিল তারা উপরে উঠে
এলো, যারা উপরের মাঝুষ, তারা গেল তলিয়ে। অমল চেয়ে দেখলো,
তা'র পারিপার্শ্বিক জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনাকে আঁকড়ে ছিল,
তাদের অন্তর্লোকে কী বিরাট বিপ্লব! স্বেচ্ছাতন্ত্রী, অধীর, অস্থায়ী,
ক্ষণমজ্জী নরনারীর দল। নগরের পরিধির মধ্যে সবাই রয়েছে একত্র, কিন্তু
কী বিচ্ছিন্ন, কী আত্মকেন্দ্রিক। মরুভূমিতে কত অপরিমেয় বালুকণা, একত্র,
কিন্তু কণায় কণায় কোনো যোগ নেই। প্রকাণ্ড চাকা, নিত্যপরিবর্তনের
দ্রুত গতিতে ঘূরছে—মাঝুষ ছিটকে পড়ছে তা'র থেকে। অমল এদের
থেকে পৃথক—অমলের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। অমল এক।

বহুদিন পরে ধর্মতলার মোড়ে ছোড়দিদির মেজ ভাস্তুরের সঙ্গে অমলের
হঠাতে দেখা হয়ে গেল। তিনি চিনতে পারেন নি অমলকে। অমল তার
পায়ের ধূলা নিয়ে বললে, কেমন আছেন প্রকাশবাবু? আমি অমল
নৃপেনের বন্ধু।

ত্রিলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু কী মৃত্যু যেন
মনিয়ে রয়েছে মুখে চোখে। তিনি হতচকিত হয়ে কিম্বৎকণ পথের
দিকে তাকালেন তারপর বললেন, কেমন আছি? ঠিক বলা কঠিন ভাই।

অমল বললে, টুমুরা কোথায় জানেন?

টুমু? প্রকাশবাবু যেন অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে কাঁ যেন স্মরণ
করবার চেষ্টা করলেন, অতঃপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওঃ টুমু, মানে ছোট
বৌমার মেয়ে...ইয়া, মেয়েটি ভারি লজ্জা ছিল!

কোথায় তা'রা?

ঘাড় নেড়ে প্রকাশবাবু বললেন, তাত' বলতে পারিনে, ভাই! মাস
ছয়েক আগে কে যেন বললে, তা'রা যেন কোথায়—!

উৎসুক অমল প্রশ্ন করলো, কোথায়? কলকাতায় নেই? দেশে?

প্রকাশবাবু একটা ল্যাঙ্গ-পোষ্টে হেলান দিয়ে কেমন একটা ক্লান্তির সঙ্গে
আত্মবিশ্বাস-নির্লিপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন, দেশে! কিছু নেই গ্রামে।
একখানা করকেটের ঘর ছিল দাঁড়িয়ে, বানের সময় তাও ভেসে গেছে।
সেখানে দাড়াবার ঠাঁই নেই।

অমল বললে, নৃপেন আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখে ছোড়দিদের খবর
জানাবার জন্মে। অথচ আমি এক বছর হয়ে গেল ওদের খবর জানিনে। কি
করি বলুন ত?

প্রকাশবাবু হঠাৎ এবার সজাগ হয়ে বললেন, এবার আমি যাই অমল।
নৃপেনকে লিখে দিয়ো, চারিদিকে আগুন জলছে দাউ দাউ ক'রে—এ আগুন
না নিবলে জানা যাবে না, কে বেঁচে আছে, আর কে নাই।

প্রকাশবাবু মহৱগতিতে ইটতে লাগলেন ধর্মতলার পথ দিয়ে। অমল
পিছন দিক থেকে চেয়ে রইলো। তিনি যেন সেই সন্তান রায় পরিবারের
ভগ্নাবশেষ! অমলের চাপা নিখাস পড়লো।

বোমাবর্ষণের আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ লোক পালিয়েছিল, কিন্তু বোমাবর্ষণের
পর থেকে লোক বাড়তে লাগলো। অসংখ্য অগণ্য কাজ জুটছে এখানে।
কোটি কোটি কাগজের টুকরো ছাপা হচ্ছে,—তা'র নাম টাকা। বসন্তের
ঝরাপাতার মতো রাশি রাশি কাগজ ঘুড়ের ঝড়ের তাড়নায় চারিদিকে
উড়ছে। সহস্র সহস্র যন্ত্রশালা সর্বত্র দাঁড়িয়ে উঠলো, তার সঙ্গে অগণ্য
ঘুড়ের দণ্ডর। অমল দেখলো মৃত্যুর ভয় স'রে গেছে, তা'র আঁৰগা নিমেছে

লোভের লেলিহান জিহ্বা। সঙ্গে সঙ্গে এলো চোরাবাজার এবং খান্দসম্ভার নিয়ে জুয়াখেলা। আবার অভিনব ঘৃণের আরম্ভ।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালো। ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল করাল চেহারায়। ছুর্দিনের সেই বীভৎস বিকারের মাঝখানে অমল একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো, যদি ছোড়দিদিনের কোনো খোজ পায়। বাব বার সে বেলেঘাটার ওদিকে ছুটে গেল, অনেক বাড়ীর কড়া নাড়লো, অনেক প্রশ্ন করলো অনেক প্রতিবেশীকে—কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মকাল ধূধূ করছে। দেশে ছুর্ভিক্ষের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেন্টের তখনও কিছু চক্ষু লজ্জা ছিল, তাই পথের মৃতদেহগুলি ভোরের আগেই তা'রা সরিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে শুশানে জায়গা হয় না, শবদেহ পথে প'ড়ে থাকে। গাদিতে নিয়ে যাবার লোক নেই, গাড়ী নেই, পেট্রল নেই। অমল একদিন শুশানে গিয়ে দেখে এলো, শবদাহের কাঠ পাওয়া যায় না। ক্রমে বর্ষা নামলো; কলকাতার পথে ঘাটে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ প'চে ওঠে। অমল একটা ভয়ানক আতঙ্কে পথে-পথে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। অন্ন-বয়সী মুমুক্ষু বিধবা দেখলেই অমল হেঁট হয়ে লক্ষ্য করে সে তা'র পরিচিত কিনা। সে নিশ্চয় জানে, ছোড়দিদির কোনো সহায় সহ্য নেই, শুশুরবাড়ী থেকে কোনো সাহায্য সে পাবে না, কেউ তাকে দয়া করবে না,—তাকে মুখ বুজে উপবাস করতে হবে। অমল অক্লান্তভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

একদিন হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। নৃপেনকে সবিস্তারে চিঠি লিখে জানালো, ছোড়দিকে কোথাও সে খুঁজে পায়নি। তা'র সাধ্যের অতীত।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় বছর কেটে গেলো।

ইউরোপের যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা দেখা দিয়েছে। অনেকে বিশ্বাস ক'রে জার্মানীর আর বোধ হয় রক্ষা নেই। তবে হিটলার হয়ত তা'র পাশ্চাপত অস্ত্র এখনও লুকিয়ে রেখেছে; চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। ওদিকে জাপানকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতের প্রান্ত থেকে জাপানীদের তাড়ানো হয়েছে।

এমনি সময়টায় একদিন লোয়ার সাকুরার রোডের এক বিদেশী পল্লীর ধারে চলতে চলতে সহসা অমল থমকে দাঢ়ালো। অদূরে ফুটপাথের ধারে একখানা দামী মোটর থেকে জনৈক শিখ মিলিটারী অফিসার নামলেন, তাঁর

সঙ্গে একজন মহিলা। তিনি বছর আগে শেষবার অমল ছোড়দিকে দেখেছিল,—এ মহিলার সঙ্গে সেই ছোড়দিকের সামঞ্জস্য বড়ই কম। অমল ভুল করেছে, শীতের সংস্কার কুয়াশায় সে ঠিক চিনতে পারেনি। পুষ্টিকর খাত্তের অভাবে লক্ষ লক্ষ ঘুবকের মতো তারও চোখের জ্যোতি ক'মে গেছে,—উনি সেই ছোড়দি নন। এ হোলো প্রেতিনী, একে মাঝুষ বলা চলবে না।

অমল তাড়াতাড়ি নতমুখে চ'লে গেল। সেই পথের মোড়ে একটি পানের দোকানের কাছে এসে সে দাঢ়ালো। অলঙ্কে ঘষা কাচের আয়নার ভিতরে সে নিজের চেহারার দিকে তাকালো। মনে মনে বললে, ওরে মৃচ, প্রাচীন নীতিবৃক্ষের পুতুল চিনতে পারলি নে? না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না? কোনটা?

অমল ফিরে দাঢ়ালো। পুরনো বিশ্বাস একযুগে ভেঙে নতুন বিশ্বাস দাঢ়িয়ে উঠে। এ যুক্তে ভেঙে গেল সব,—অভ্যাস, আদর্শ, নীতি, চিন্তাধারা। এ যুক্ত একটি প্রকাণ্ড নাটক,—এক এক অঙ্কে এক এক যুগ স্থাপ্ত হয়েছে, তা জানিস? মৃচ, তুই কি সেই তিনি বছন আগেকার ছোড়দিকেই ধরে রাখতে চাস? মুর্ধ, নিজের অভ্যন্তর চিন্তাধারাকে বর্তমানের গতিশীলতার সঙ্গে বদলে দিতে পারিসনে? একথা কি মনে থাকে না, অবস্থার পরিবর্তনশীলতাকে মেঘেরাই সহজে প্রথমে স্বীকার ক'রে নেয়? ছোড়দিও ত' সেই মেঘেরাই একজন রে।

অমল আবার ফিরে এলো। পা দু'খানা ঠিক পড়ছে না, কেমন যেন সভয় জড়তায় আর সঙ্কোচে, অথচ অধীর উত্তেজনায় অগ্রপঞ্চাং বোধহীন। কয়েক পা এসে দেখলে মোটরখানা তখনও দাঢ়িয়ে, কিন্তু আরোহীরা ভিতরে গেছে।

অমল গিয়ে ভিতরে তোকবার চেষ্টা করতেই গার্ড বাধা দিল। বাড়ীটা যতদূর মনে হচ্ছে সামরিক কর্মচারীদের বাসস্থান। অমল বললে, মাঝিজী ভিতর গিয়া, উনকো মাংতা—

তুম কোনু হায়?

উন্কো ভাই—

গার্ড একটি স্লিপ ও পেন্সিল দিল। অমল লিখে পাঠালো। কি যেন লিখলো কি যেন ভাষায়—অস্তির হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে। তারপর সে দাঢ়িয়ে রইলো।

দাঢ়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। কেমন একটা অপমানজনক হীনতাবোধ দুলিয়ে উঠছে তার শরীরে—যার কোন ব্যাখ্যা নেই। গলার ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসছে,—সেটা যেন কুঙ্গলীকৃত মৃত্যু—উঠে আসছে হন-পিণ্ডের কোনো একটা জায়গা থেকে। অমল অনেকক্ষণ দাঢ়ালো।

এমন সময় মিলিটারী গার্ড এসে জানালো, যাইয়ে উপরমে—

সামনেই কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি। এদিকে ওদিকে অজ্ঞ আসবাব, আর সাজসজ্জা। সিঁড়ির দেওয়ালে দামী দামী বিলাতী ছবি বোলানো। অমল উঠে গিয়ে ড্রয়িং হলে এসে দাঢ়ালো।

সেই মহিলাটি এবার বেরিয়ে এলেন সেই স্লিপটি হাতে নিয়ে। অমলকে দেখে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, ওঃ তুমি ! নামটি দেখে ঠিক—মানে, ঠিক আমার মনে পড়েনি !

ঢাকা দেওয়া আলোটার নীচে এসে মহিলা দাঢ়িয়েছিলেন। সেই আলোয় হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নেবার সময় অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, তাঁর পায়ে মুসলমানী সবুজ মথমলের স্লিপার এবং পায়ের নখগুলিতে রঞ্জিতীন পালিশ।

তিনি বললেন, আমি এখনই বেরবো খুব তাড়াতাড়ি—একটু বসতে পারো তুমি !—এই ব'লে তিনি হাতঘড়িতে সময় লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বললেন, বাই-বাই, তোমাদের সব খবর কি ? মা কেমন আছেন ?

অমল বললে, আপনি ত' জানেন, আমার মা মারা গেছেন !

ওঃ সরি ! তারপর ? এদিকে কোথায় ?

এবার ফস ক'রে অমল বললে, আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন ছোড়দি ?

ছোড়দিদি হেসে বললেন, এ যুক্তে সবই সম্ভব !

অন্ত আলোতেও অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ছোড়দিদির ঠোটে ও গালে রং মাথানো, চোখে হাঙ্কা শুর্মা, ঘন চুলের রাশি থেকে চুর্ণ গুচ্ছ ছুলছে ! তাঁর এক হাতে ঘড়ি, অন্ত হাতে সোনার সরু বালাটি ঝিকমিক করছে। অলঙ্কারে আর আভরণে তাঁর চেহারাটিতে একটি ধনবতী রাজপুতানীর ভাব এসেছে। শুধু চোখের কোণে দেখা যায় অগ্নিকোণ। যেন মাঝে মাঝে বিপ্লবের বিজ্ঞাদাম ঝিকমিক করে উঠছে।

অমল নিজের মনের অবস্থা কতকটা সামলে নিয়ে বললে, সেই দেখা,

আপনার সঙ্গে...তারপর এই তিনি বছর পেরিয়ে গেল...বোমা পড়া, হৃতিক,
ভারত আক্রমণ, মহামারী...কত যে বদলে গেছে সব, ছোড়দি—

ছোড়দিদি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, মাথায় ঘোমটা তাঁর
নেই, এলো খোপায় গাঁথা রয়েছে গোটা দুই আইভরির কাটা, দুই কানে
তাঁর উজ্জল দুটি পাথর। দু'পা এগিয়ে তিনি পা পিছিয়ে নিজের পিছন
দিকটা একবার লক্ষ্য করে অন্তমনস্ফুর্ভাবে অমলের কথা শুনছিলেন।

অমল বলতে লাগলো, কত যে খুঁজেছি আপনাকে...পথে ঘাটে, সেই
বেলেঘাটার বাড়ীতে, আপনার ভাস্তুরদের ওখানে—

উৎসাহ সহকারে আরো কিছু হয়ত অমল বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু
ঘরের ভিতর কতকগুলি লোকের কোলাহলের মাঝখান থেকে হঠাতে পুরুষ
কর্তৃর ডাক এলো, মিসেস রঘু—?

থাক—বলে ছোড়দিদি অমলকে বাধা দিয়ে থামালেন। তারপর পর্দার
ফাঁকে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সহান্তে নিজের অধর দংশন করে বললেন,
ইয়া...just coming...little formalities—

তারপর মুখ ফিরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, ইঁয়া... কি যেন নামটা তোমার
...ভুলে যাই ! ইঁয়া আর একদিন তুমি আসতে পারো,—আর অবিশ্বিএইত
দেখা হয়ে গেল। তা'ছাড়া সাহেবরা থাকে এখানে,—ওসব পুরনো
আলোচনা এখানে না করাই ভালো—

এমন সময়ে সেই শিখ অফিসারটি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ইয়েস ?
উচ্ছুসিত উৎসাহে ছোড়দিদি সেই ভদ্রলোকের হাতখানা ধরলেন, বললেন,
ইনিই মেজর সিং...my great friend indeed ! ইঁয়া, তুমি বোধ হয়
একটা চাকরি চাইতে এসেছিলে, না ?

অমল কি যেন বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর গলায় আঁটকে গেল।
ছোড়দিদি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, ইঁয়া, মানে—কিছু
বলতে হবেনা, বুঝে নিয়েছি—তুমি খুব needy ! কতকগুলো চাকরি আমি
করে দিয়েছি কতকগুলো ছেলেমেয়ের...অবিশ্বিএ দু'টো চারটে এখনও
হাতে আছে—

অমল বললে, না, আমি চাকরি চাইনে ছোড়দি !

চাওনা ? ছোড়দিদি বললেন, I see, সেই ভালো,—হ'শো একশো
টাকার চাকরি আজকাল লজ্জার কথা,—আচ্ছা, চিয়ারো !

অমল কিছু বলবার আগেই মেজর সিং সহান্ত আতিশয়ে ছোড়দির একখানি নগ্নবাহু জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পর্দার ওপারে মস্ত টেবলের ভোজনের আসরে তখন মোটা ও মিহি গলার অনেকগুলি হাসি গলগলিয়ে উপর্যুক্তির পড়ছে।

অমল পাথর নয় যে চলৎশক্তিহীন। সে মাঝুষ, তাই এক সময়ে নড়ে উঠে সিঁড়িটা খুঁ'জে নেমে আসছিল। সহসা নীচের তলায় শোনা গেল কল্লোচ্ছসিত হাসির আওয়াজ। অমল ঠাহর করে দেখলো টুমু উপরদিকে উঠে আসছে,—তার সঙ্গে একটি ঘ্যাংলো ইঞ্জিয়ান যুবক। অমল বড় সিঁড়িটার একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঢ়ালো।

টুমুর পরনে মিহি জর্জেটের শাড়ী, গায়ে ঝলমলে সার্টিনের জামা,—কিন্তু পিঠের দিকে সেই জামার আকৃতা নেই,—মাঝখানটা নগ। টুমুর চুলগুলি তাত্ত্বর্ণে পরিণত, মুখখানা টয়লেট করা,—সমস্ত সিঁড়িয়ায় ক্লপের গৌরব ছড়িয়ে সে উঠে আসছিল,—আর সেই তরুণটি ছুটে আসছে তাকে ধরে ফেলবার জন্য। ঘোবনের জয়োৎসব ভরা দু'টি মুখ।

সহসা টুমু দাঢ়ালো। নিয়ন্ত্রিত আলোর আভায় অমলকে দেখে বললে, হাল-লো ?

অমল শ্বিতমুখে বললে, চিনতে পারছ টুমু ?

টুমু বললে, ও ইয়েস...তুমি অমলদা—

ছি আমি দাদা নই টুমু, আমি তোমার মামা।

ঘন তৌর হাসি হেসে টুমু বললে. না না, কেউ নয় তুমি...তবু কী মিষ্টি তুমি...sweet eternally !—এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার নীরব হাতখানা বাড়িয়ে অমলের একখানা ধরথরে হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকুনী দিল।

অমল বললে, আর আমার কোনো দুর্চিন্তা নেই টুমু, তোমাদের দেখে খুসী হয়ে গেলুম।

টুমু বললে, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

সাহেব ছোকরাটি হাসিমুখে বললে, I think she is very busy—eh ?

এক রাশি হাসিতে টুমু সিঁড়িটা ভরিয়ে দিল। বললে, মায়ের একটুও সময় নেই আজকাল। Come on John.

সোরগোল তুলে আবার টুমু ও ঘ্যাংলো ইঞ্জিয়ান তরুণটি দ্রুতগতিতে

উপরে উঠে গেল। একটা খসখসে বাসি মিহি সুগন্ধি বাতাসটাকে
ভরিয়ে দিল।

ওরা ভালো আছে, স্বথে ও আনন্দে আছে,—আর কোনদিন ওদের
সংবাদ নিতে হবে না,—এমনি একটা অস্তুত স্বত্ত্বিবোধ নিয়ে অমল সিঁড়ি
বেয়ে নেমে চলে গেল। অভিমান, ক্ষোভ, চিন্তিবিকার—কিছু নেই তার।
সে যেন ভাঙ্গকে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তা'র বুকের কোণ
থেকে যেন কোনো প্রকার আর্ত প্রতিবাদ না ওঠে।

কিন্তু পথে নেমে এসে অমল কেমন যেন নিঝপায়ের মতো এলোমেলো
ইঁটতে লাগলো। তা'র কোন্ পথ—সে ভুলে গেছে! ওদিকে, না এদিকে?
ঘোর অঙ্ককার বাত চারিদিকে,—আড়ষ্ট শ্রীহীন, ভয়ভীত, শীতার্ত, অঙ্ককার।
কিন্তু এই অঙ্ককার থেকে মুক্তি কবে হবে? এর মধ্যে সত্য কোথা?
আলো কই?

তা'র হৃদপিণ্ড থেকে আবার সেই কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু যেন উঠে এলো।
তা'র গলার কাছে—এবার অমল আর সামলাতে পারলো না। কালপ্রহরীর
মতো সামনে দাঢ়িয়ে রয়েছে লোহার একটা টেলিগ্রাফ পোষ্ট। সেইটাকে
হই হাতে ধ'রে তা'র তুহিনশীতল গায়ে মাথা রেখে সহসা অমলের চোখে
বরঞ্চরিয়ে জল এলো। তাইপর একসময়ে সে যেন 'বর্তমান যুগান্তরের
সর্বনাশ' বীভৎসতার মাঝখান থেকে মুখ তুলে কম্পিতকঠৈ বলতে চাইল,
অনেক গেল, আমাদের অনেক গেল এ যুদ্ধে...কত যে ধ্বংস, কত মহত্ত্বের
যে সর্বনাশ...তোমাকে আমরা বোৰাতে পারবোনা।

ଆଧାତ

একটি ବାରାନ୍ଦା, ଛୁଟି ଘର, ଏକଟୁଥାନି ବାଗାନ ଆର କୟେକଟି ଫୁଲେର ଗାଛ ।

ଦରଜାଟି ପାର ହୁୟେ ସନ୍ତ ଏକଟି ଲାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଏଂକେ ବେଁକେ ଉଠେ ଏସେହେ ବାରାନ୍ଦାର କୋଳେ । ଛୁଟି ଘରେର ଦରଜାଯ ଚିକ୍ ଟାଙ୍ଗାନୋ । ଭିତରେର ଦେସାଳେ ଏକଜିବିଶନ୍ ଥିକେ କେନା କୟେକଥାନି ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ର । ମେଘେତେ ଗୁଟିକମେକ ମେହଗଣି କାଟେର ଆସବାବ,—ଥାନ ତିନେକ ଚେଯାର, ଏକଟି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବ୍‌ଲ, ଛୁଟି ଟିପ୍ପଣୀ, ଏକଟି ବେଡ-ଷୋର, ଆର ଦୁଦିକେ ଛୁଟି ବହିଯେର ର୍ୟାକ ! ଆଶ୍ରମିକ ସଂକ୍ଷରଣେର ଅନେକଗୁଲି ବହି ଆଛେ ବଟେ !

ପାଶେ ଏକଟି ବିଛାନା, ପାଶାପାଣି ଛୁଟି ବାଲିଶ ସାଜାନୋ ! ମାରାମାରି ଏକଟି ପାଶେର ବାଲିଶ ବିଛାନାଟିକେ ଆଧାଆଧି ଭାଗ କରେ' ରୁହୁଛେ । କଡ଼ି-କାଟେ ଏକଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାନ ଘୁରୁଛେ, 'ରେଣ୍ଟଲେଟରେ' ଗତି ଏକଟୁଥାନି କମାନୋ ।

ଜାନାଲାର ଧାରେ ଏକଥାନି ହର୍ଜ ଚେଯାରେ ସେ ଏକଟି ମେଘେ ନିବିଷ୍ଟ ମନେ କି
* ଏକଥାନା ମାସିକ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛେ ।

ବର୍ଷାର ଶେଷ । ମେଘଲା ଆକାଶ । ଏକଟା ଜଳୋ ଘୋଲାଟେ ଆବହାନ୍ତା ଚାରିଦିକ ଘରେ ରୁହୁଛେ । ମନେ ହଞ୍ଚେ କୟେକ ଦିନ ଥିକେ ଶର୍ବ କାଲଟା ପ୍ରବେଶ-ପତ୍ରେର ଅପେକ୍ଷାଯ ବାହିରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ ! ଆଜ ସକାଳେ ଘରେର ମଧ୍ୟ ଶିଉଲୀର ଗନ୍ଧ ଢୁକେଛିଲ !

ବେଳା ଚାରଟେ !

ବାହିରେ ଯେ ପାଯେର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁୟେ ଆସିଲ, ମେଘେଟିର ହଁସ ଛିଲ ନା । ବାହିରେର ଦରଜାଟା ଠେଲେ ମନ୍ଦ ଏସେ ଘରେ ଢୁକଲ । କାହିଁ ଏକଟି ବଚର ଛୁଯେକେର ଛୋଟ ଛେଲେ ।

ମହାରାଣୀ ?

ମେଘେଟି ଏକଟୁ ହେସେ ସୋଜା ହୁୟେ ଉଠେ ବସଲ । ବଲ୍ଲ—କିବା ନିବେଦନ, କହ ବୀରବର !

ବୀରବର ବଲ୍ଲ—ସନ୍ତାନ ତବ ଧୂଲି-ଧୂସରିତ ।—ଆରେ ଗାଧା, କାନ କାମଡ଼ାଛିସ କେନ ? ନାମ୍ବୁ ତବେ । କି ଦୁଷ୍ଟ ରେ ବାବା, ପିତାର ସମ୍ମାନ ରଙ୍ଗା କରେ' ଚଲେ ନା !

ମେଘେଟି ଉଠେ ଏସେ ତାକେ କୋଳେ ତୁଲେ ନିଲ । ତାରପର ଚୁପ୍ଚନ କରେ' ବଲ୍ଲ —ତ୍ୟାଜ୍ୟପୁତ୍ର ହବାର ଭୟ ରାଖୋ ନା ?

নেক্টাইটা খুলে' সনৎ আন্লায় তুলে রাখ্ল। টাউজারের ভিতর থেকে শাট্টা টেনে উঠিয়ে তার ওপর টাঙ্গিয়ে দিল। তারপর কাপড় বদলে সে যখন কাছে এসে হঠাত হেসে দাঢ়াল, ছেলেটি তখন আবার তার কোলে আস্বার অন্ত হাত বাড়িয়েছে।

কোলে তুলে নিয়ে সনৎ তাকে জিজ্ঞেস করল—তোমার 'মা'র নাম কি বলত' টুটু ?

টুটু তার মা'র দিকে তাকিয়ে বল্ল—মোয়ালানি !

না, না, আর-একটা ।

টুটু বল্ল—তমচা ।

সনৎ বল্ল—তমচা নয়, তমসা ! গাধা কোথাকার, জিবের এখনও আড় ভাঙে নি ! আচ্ছা, তা হোক,—টুটু তোমার মাকে বলত' আমার এ বেলার প্রাপ্যটি দিয়ে দিতে !

মাসিক পত্রখানা থেকে মুখ তুলে এবার হেসে ফেলে তমসা বল্ল—নিজে ডাকাতি করে' এতদিন পরে বুঝি লজ্জা হচ্ছে ? যাও, ও-সব এখন হবে না ! —ঠেঁট ছুটি তার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল ।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে সনৎ হেসে বল্ল—না, তা নয়, চুমু থাওয়া ছাড়া কি আর আমার অন্ত কাজ নেই ? তা বলছিনে,—ওটা কি পড়া হচ্ছে ? গল্ল ? কা'র ?

তমসা ততক্ষণে দস্তরমত কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে বল্ল—বাজে লেখা ! দেখ না, 'মেঘেটাকে' কি নাস্তানাবুদ করছে ।

কি রকম ?

বেশ ছিল...স্বামী আর স্ত্রী ! ঘর দোর, সাজানো গোছানো, জিনিসপত্র ...স্বর্খের সংসার !

তারপর ?

এল এক উড়নচুড়ে দেওর অতিথি নারায়ণ হয়ে...হতভাগা ! জিনিসপত্র লঙ্ঘিত করতে স্কুল করে' দিল, ভেঙ্গে চুরে একেবারে তচ্নচ্চ ! বউটা ত একেই একটু কৃপণ, স্বামীটাও আবার বোকা, ভাইকে ভালবাসে !...ছি ছি, শেষের দিকে একেবারে যাচ্ছে-তাই !

কি শুনি ?

বলতে লজ্জা করে । শোনো তবে বলি চুপি চুপি ।

কানে কানে তমসা কি বলিতেই সনৎ হঠাত হো হো করে' হেসে উঠল ।
রাগ করে' উত্তেজিত হয়ে আরুক্ত মুখে তমসা বল্ল—এমনি জঘন্য লোক ।
এ গল্প যে লিখেছে, আমি তাকে দেখতে পেলে কান মলে দিই !

সনৎ বল্ল—আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে ।

অ্যা ?—তমসা অবাক হয়ে বল্ল—এই দুর্বীতি তোমার ভাল লাগে ?

সনৎ বল্ল—নীতি আমি মানিইনে !

মানো না ? আর ধর্ম ?

সনৎ একটু হেসে বল্ল—আমরা বিংশ শতাব্দীর সন্তান ।

তমসা হিন্দুর মেঝে । যে-বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে আচার
বিচার পাল পার্বণ, ঠাকুর দেবতার পূজা, আঙ্গণ পুরোহিতের সেবা—এ সমস্ত
নিত্য নৈমিত্তিক । একদিকে যেমন সাত্ত্বিকতার আবহাওয়া, অন্যদিকে তেমনি
সংশ্কার স্থিংক আলোয় সে বড় হয়ে উঠেছিল ।

বিবাহ হয়েছে তার উপরুক্ত স্বামীর সঙ্গে । রাজপুত্রের মত ক্লপ, উচ্চ
আধুনিক শিক্ষায় স্বপঞ্চিত, অপরিমিত ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী । বিনয়ী, ভদ্র,
বৃক্ষিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ।

ভালবাসা ? সমস্ত জীবন তমসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আনন্দে, প্রেমে,
তৃপ্তিতে, স্বত্ত্বিতে ও গর্বে । ভালবাসায় স্বামী তাকে আবৃত করেছিল,
আচ্ছম করে' রেখেছিল ।

কাগজখানা ফেলে রেখে সে উঠে দাঢ়াল, পরে কাছে এসে বাঁ হাতটা
সন্তের কোমরে জড়িয়ে মুখের ওপর মুখ তুলে বল্ল—মাঝে মাঝে তুমি
এমন কথা বলো যে ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে । এমন কথা কি বলে
কথনো ?

হা-হা-হা করে' সনৎ হেসে উঠল । বল্ল—পাগল আর কি ! যেটা
আমার নেই, সেটা আছে বলে' চালিয়ে দিয়ে লাভ কি ?—বলে' ছুটি আঙ্গুল
দিয়ে সে তমসার চিবুকটি নেড়ে দিল ।

বিকাল বেলা এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে ‘আয়া’টা চলে গিয়েছিল, এবার সে
ফিরে এসে টুটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল । রান্নাঘরে ঠাকুর এসে রাতের
রান্না চড়িয়েছে । বি এবার চায়ের জল বসালো !

হ্রাইচ্চিপ্তেই সমস্ত ঘর আলোয় হেসে উঠলো । ফ্যান-এর বেগটা
আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে তমসা খাটের ওপর আধ-ভাঙা অবস্থায় উঠে বসলো ।

হাসচো যে ?

সনৎ বল্ল—ভাবছি, আমি হখন থাকিনে, তোমার সময় তখন কেমন
ক'রে কাটে !

তমসা হেসে বল্ল—দয়ার শরীর ! কিন্তু তোমার হাসি দেখে মনে হয়
এ কথা তুমি ভাবছিলে না । তুমি আড় চোখে তাকাছিলে আমারই দিকে !

আল্তা-পরা দুখানি ফর্সা পায়ের ওপর শাড়ীটা তমসা নামিয়ে দিল ।
মাথার চুলের রাশ আলগা খোপায় বাঁধা ছিল, নাড়াচাড়া পেতেই খোপার
খিল খুলে চুল এলিয়ে পড়ল ।

প্রেমের একটি মন্তব্য, একটি গান্ধীর্য এসেছে তাদের জীবনে, দীর্ঘির জল
যেখানে গভীর, সেখানে সে অস্তির চঞ্চল নয়, হাওয়া লেগে শুধু একটু
একটু কাপে ; মাতালের উন্মত্তায় ওলোট-পালোট করে না, সন্ধ্যাসীর তপশ্চার
মত শান্ত !

তমসা বল্ল—আমাব ঠাকুর-ঘর কেমন করে সাজাচ্ছি, দেখেছ ?—
বা রে, শুনতেই যে গভীর হয়ে উঠলে !

সনৎ বল্ল—তুমি আবার এই ছেলেমালুষীকে প্রশ্ন দিচ্ছ তমসা !

তমসা চুপ ক'রে রইল । খানিকক্ষণ পরে বল্ল—বাবে বাবে তুমি এটাকে
তাছিল্য কর কেন বল ত ! আঙ্গণের ঘর থেকে ঠাকুরের সেবা উঠিয়ে দিলে
কি থাকে, শুনি ?

সম্পূর্ণ অর্থহীন ! নিজেদের মনের উন্নতি যেখানে হল না, বাইরে
শিবের মন্দির বসিয়ে সেখানে লাভ কি ?—সনৎ একটা সিগারেট ধরালো ।

বি এসে স্বন্মথের টিপয়ের ওপর ছ' পেয়ালা চা ও রেকাবীতে কিছু
জলখাবার রেখে বেরিয়ে গেল ।

তমসা বল্ল—মনে করো না, এ আমার গোড়ামি । এ হচ্ছে গৃহস্থানীরই
একটা অঙ্গ । নৈলে ধর, সবই ত হল...স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য, প্রেম, ভজ্ঞা,
সামাজিকতা—সব ! তারপর কি বল দেখি ? কি নিয়ে থাকা চলে ?
আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি না হয় সবই পেলাম একে একে, কিন্তু ঠাকুর-দেবতা'র সঙ্গে
শুভদৃষ্টি না হলে এরা সবই যে প্রাণহীন ! চুপ করলে যে ?

সনৎ শুধু বল্ল—পাগলামি করো না, ধরো চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল !

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে তমসা বল্ল—তুমি দেখছি নিতান্তই
মান্ত্রিক । মনে করো না যে—

କି ଶୁଣି ?

ହିଁଦ୍ୟାନୀ ତ୍ୟାଗ କରେ' ବାହାଦୁରୀ ନିଛ ?

ତାହି ନାକି ?—ଏହି ଗରମ ଥାନ୍ତାର କୁଚରିଟା ଖେଳେ ଫେଲ ଦେଖି—ଆରେ, ଥାକ୍
ଥାକ୍, ଆମାର ମୁଖେ ଆର ଦିତେ ହବେ ନା !

ଦୀତ ଦିଯେ ଏକଟୁ ଭେଡେ ନାଓ !

ପ୍ରସାଦ କରେ' ନା ଦିଲେ ଥାଓୟା ହବେ ନା ବୁଝି ?—ତମସା ଆଗେକାର କଥାର
ଜେର ଟେନେ ବଲ୍ଲ—ବାଡ଼ୀତେ ଠାକୁର ଦେବତାର ପାଟ ଥାକଲେ ସମସ୍ତଇ ସେଥାନେ ଗିଯେ
ମେଲେ । ରାଶି ରାଶି ଫୁଲ ଥାକତେଓ ମାଲା ଗୀଥା ଯାଇ ନା, ସୁତୋ ସଦି ନା ଥାକେ ।

ସନ୍ଦ ବଲ୍ଲ—ଆବାର ?

ତମସା ହେସେ ବଲ୍ଲ—ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମାର କିଛୁତେହି ଯାବେ ନା । ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସହି
ହଚେ ମାନୁଷେର ପରମ ଆଶ୍ୟ ।

ତମସା କୋନୋ କଥାହି ଶୁଣିଲୋ ନା, ବିଶ୍ୱାସଟା ତାର ରଇଲହି । ବାଡ଼ୀର ପାଶେ
ଯାଦେର ବାଡ଼ୀ, ତାଦେର ମେଘେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ତାର ବଞ୍ଚୁତ୍ତ । ଟୁଟୁର ପାତାନୋ ମାସି ।
ଛାଦେର ପାଂଚିଲେ ଉଠେ ଏକଦିନ ତମସା ଡାକ ପାଡ଼ିଲୋ—ସରଲା ? ଶୋନ୍ ତ ଭାଇ
ଏକବାର !

ସରଲା ଏଲ । ବଲ୍ଲ—ଅସମୟେ ଯେ ! ତମସା ବଲ୍ଲ—ଭାଲବାସାର କି ଆର
ସମୟ-ଅସମୟ ଆଛେ ?—ଶୋନ ବଲି, ତୋଦେର ପୁରୁଷ ଠାକୁର ଆସବେନ କଥନ୍ ?

ଏସେ ତ ଚଲେ' ଗେଛେନ । ତୋର ଠାକୁର ବସବେ କବେ ? ନେମନ୍ତମା ?

ଇହା ଲୋ ଇହା, ପରେର ବାଡ଼ୀ ବିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲେ ତୁହି ଛାଡ଼ିସନେ !—ଯାଇ ହୋକ,
କାଳ ପୁନ୍ରତ ଠାକୁର ଏଲେହି କିନ୍ତୁ ଆମାଯ ବଲିସ ଭାଇ ।

ଦୁଇ ବଞ୍ଚୁତେ ପରାମର୍ଶ ହଲ ।

ସକଳ ଥବର ରାଥବାର ମତ ସମୟ ସନତେର ହତୋ ନା । ତାକେ ଶ୍ରେଣ ବଲା
ଯେତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କୁନୋ ବଲା ଚଲେ ନା ! ଶ୍ରୌଇ ଥାକତୋ ତାର ଚୋଥେ ସକଳ
ସମୟ ଜେଗେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୌକେ ପାର ହେଁ ଯେ ନିତ୍ୟ ଦିନେର ସଂସାର, ଯେଟାଯ ଦମ୍ଭ ଦିଲେ
ଯଦ୍ରେର ମତ ଚଲେ—ସେଟାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାର ଚେତନାଓ ନେଇ, ଅଭିଜ୍ଞତାଓ ନେଇ । ଯା
କରେ ତମସା ।

ଏ ବାଡ଼ୀଟା କେନାର ପର ଥେକେ ସିଁଡ଼ିର ମାଥାଯ ଯେ ସରଟା ଏତକାଳ ପରିତ୍ୟକ୍ତ
ଅବଶ୍ୟାମ ପଡ଼େ ଛିଲ, ସେଇଟିଇ ହଲ ଠାକୁର ସର । ବାଡ଼ୀତେ ଶିବେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମସା
କରିବେଇ ।

ঠাকুরের জগ্নি সোনাৰ সিংহাসনেৰ ফৰমাস গেল স্বাকৃতা-বাড়ী, শব্দা
প্ৰস্তুত হলো, পুষ্পপাত্ৰ প্ৰমুখ তামাৰ বাসন-কোসন এলো, ধূপধূনো কেনা হল,
শৰ্পথ-ঘণ্টা জমা হল,—তমসা পেলো মনেৱ যত একটি কাজ।

দিনেৱ যে সময়টা সনৎ নিয়মিত বাড়ীতে থাকে না, সেই অবসৱেই হয়
এই সকল ব্যবস্থা। স্বামীকে একটু চমক দেবাৰ ইচ্ছায় তমসা অতি কষ্টে
এমন ব্যাপারটা মুখ টিপে চেপে রাখল।

সৱলাদেৱ পুৱোহিত একদিন এলেন। রাঙা পাড় তসৱেৱ শাড়ী পৱে
গলায় আঁচল দিয়ে তমসা তাঁৰ পায়েৱ কাছে প্ৰণাম কৱল।

ভট্চায়ি মশায় বল্লেন—শিবটি এনেছি মা, কৈ তোমাৰ ঠাকুৱ-ঘৰ ?

তাড়াতাড়ি উঠে তমসা ঠাকুৱ-ঘৰেৱ কাছে এসে দাঢ়াল ! বানেশ্বৰ
শিবটি সিংহাসনেৱ ওপৱ বসিয়ে ভট্চায়ি মশায় প্ৰথম পূজা সেদিন নিজেৱ
হাতেই সাৱলেন।

‘দিন যায়। তমসা পূজা কৱে। ঠাকুৱেৱ ভোগ দেয়।

সেদিন কি একটা ছুটিৰ বাব। তমসা তার স্বামীকে বল্ল—এসো,
দেখবে এসো।

সনৎ বল্ল—কি ?

তমসা তার কানেৱ কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্ল—প্ৰিয়তমাৰ পাগলামি !

ঠাকুৱ ঘৰেৱ দৱজাৰ কাছে দাঢ়িয়ে সনৎ পৰম বিশ্বয়ে হেসে উঠল—
অন্তুত মেয়ে ত তুমি, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এত কাণ কৱেছ ?

আঘাপ্ৰসাদে তমসাৰ বুক ভৱে’ উঠল।

সনৎ শুধু হাসতেই লাগল। দেবতা বলে’ তার কোনো শ্ৰদ্ধাও নেই,
ধাৰণাও নেই,—কোনো গ্ৰাহক সে কৱল না। নিত্বান্তই ছেলেমানুষি চপলতা
মনে ক’ৱে সে হাসতেই শুধু বল্ল—ঘৰ সাজানোটা খুব আটিষ্ঠিক
হয়েছে !

তমসাও হেসে উত্তৰ দিল—থ্যাক্ষ ইউ !—আচ্ছা তুমি দাঢ়াও এখানে
একটুখানি, যাৰাৰ সময় দৱজাটা বন্ধ কৱে যেও। আমি সৱলাকে থবৱ দিয়ে
আসি, আজ সক্ষে্যবেলা ভট্চায়ি মশাই আৱতি কৱবেন।

তমসা তাড়াতাড়ি ছুটলো ছাদে।

পায়ে যে চটিজুতো ছিল তা সনতেৱ মনেই ছিল না। হাসিমুখে সে
ঠাকুৱ-ঘৰে ঢুকে গেল। শিবলিঙ্গটিৰ আকাৰ-প্ৰকাৰ দেখবাৰ শোভ সে আৱ

সহরণ করতে পারল না। কাছে গিয়ে বসে সিংহাসন থেকে সেটি তুলে নিয়ে
সে বাইরে এল। তমসা যে রাগ করতে পারে, এ কথা তার মাথাতেই
চুকলো না।

ইতিমধ্যে ঝি-চাকরের কি একটা কলহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।
সনৎ এল তাড়াতাড়ি তাদের থামাতে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই থাম্ব কিন্তু
সনৎ গেল শিবের কথা ভুলে!

গোলমাল থামিয়ে সে ইজি চেয়ারের ওপর এসে বসলো একখানা বই
হাতে নিয়ে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তমসাকে ঘরে চুকতে দেখে শিবের কথা তার মনে
পড়ল। পকেট থেকে পাথরের ঝুঁড়িটি বার করে' সে বল্ল—সংস্কারটাই
তোমাদের কাছে বড়, আইডিয়াটা নয়! নেলে এর মধ্যে কৌ আছে
বল ত?

দেয়ালের ধারে হতভম্বের মত তমসা বসে পড়ে বল্ল—কি ওটা তোমার
হাতে?

সনৎ বল্ল—শিব গো, তোমার সেই ঝুঁড়িটা।

দেখতে দেখতে তমসার মুখখানা কঠিন, তীব্র, ক্রক্ষ হয়ে এল। চোখছুটো
উঠলো ফুলে, মুখখানা হয়ে উঠলো রক্তের মত। উত্তেজনায় সে একেবারে
চীৎকার করে' উঠলো—তোমার কি ভয় নেই? কি করলে তুমি? ওর
যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে!

সনৎ সামাজি একটু অপ্রস্তুত হয়ে—ছেলেরা যেমন করে' গুলি খেলে
তেমনি করে'—বাঁ হাতের মাঝের আঙুলের ওপর ঝুঁড়িটা রেখে ডান হাত
দিয়ে একবার টেনে ছেড়ে দিতেই সেটা জোরে গিয়ে লাগল দেয়ালের
গায়।

অর্ধমুচ্ছিত অবস্থায় তমসা শিউরে উঠে ভয়ান্তি হরিণীর মত ঘর ছেড়ে
চলে' গেল।

দেবতার এত বড় অপমান।

মাস থানেক কেটে গেছে।

নদীতে আর শ্রোত নেই। ক্ষীণ ধারাটি বয় মৃত্যু গতিতে। একটা ক্লান্তি
এসেছে।

বহুর পার হবার আগে শ্রান্ত পথিক যেমন সেই দিকে তাকিয়ে থাকে তমসাও তেমনি করে' ভাবে। সমস্ত জীবনটাকে পার হয়ে যাবার পরিশ্রম যে অনেকখানি ! তমসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইপিয়ে ইপিয়ে উঠে।

আপিস থেকে ফিরে সনৎ ঘরে চুকে নিজেই আলো জালে !

—একি, তুমি অঙ্ককারে বসেছিলে এতক্ষণ ?

তমসা প্রথমে উত্তর দিল না। পরে বল্ল—একটু একটু করে' কেমন অঙ্ককার জমুছিল দেখছিলাম।

কাছে এসে সনৎ বল্ল—কি হলো তোমার, বলতো ? এসো, আমার কাছে বসবে এসো। দিন রাত আজকাল তোমার সাড়াশব্দ শোনাই যায় না। কেন বলতো ?

তুলে ধরে সনৎ তাকে কাছে এনে বসালো। বল্ল—শুধু ত রোগা হওনি, শ্রীহীন হয়ে গেছ। চুলগুলো হয়েছে ঠিক খড়ের আটি, গায়ের চামড়া খস খস কচ্ছে, চোখ বসে যাচ্ছে—তোমায় সেই অস্তুত লাবণ্য গেল কোথায় ? কাল ত আবার ডাক্তারের কাছে গেছলাম, তিনি বললেন, রোগের কোনো চিহ্নই নেই। এ-সব তবে কি, তমসা ? বলি, শুন্চ ?

উ !—তমসা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চোখদুটি তার গভীর কিঞ্চ অর্থহীন। একটা শূন্য দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর বুলিয়ে, সে আলোর দিকে তাকালো। কথা বলবার যে একটা প্রাণবেগ, সেটা যেন তার ফুরিয়ে গেছে।

সনৎ বল্ল—কি ভাবচো তমসা ?

ভাবচি ? কৈ না ! তারপরই সে তাড়াতাড়ি বল্ল—আলোটা নিবিয়ে দিলেই ত হয়, মিথ্যে জলছে।

অঙ্ককারে থাকবো ? আগে ত কই তুমি আমাকে অঙ্ককারে থাকতে দিতে না ?

দিতাম না ? ও ।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তমসা সরে বসলো। থাবার দেওয়া হয়েছিল ; কি এসে খবর দিতেই সনৎ উঠে বাইরে গেল।

নিজের হাত ও পায়ের আঙুলগুলোর দিতে তাকিতে তাকিয়ে তমসা কি যেন দেখছিল। হাড়ের কাঠির মত আঙুলগুলো যেমন শক্ত, বিশ্রী, তেমনি শক্তিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, তার বিবশ আড়ষ্ট দেহটা দিন দিন একটু একটু করে' যেন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ରାତେ ଆଲୋ ନିବିଷେ ନିଃଶବ୍ଦେ ସ୍ଵାମୀ-ଶ୍ରୀ ବିଛାନାର ଓପର ପଡ଼େ ଥାକେ । ଟୁଟୁ ଥାକେ ଆୟାର କାହେ, ପାଶେର ସରେ । ସନତେର ଚୋଥେ ଯୁମ ଆସେ ନା, କୋନୋ ପ୍ରଶ୍ନ କରତେ ଗିଯେ ତାର ଘେନ ଜିବ ଆଟିକେ ଘାୟ । ଭାରି ଜମାଟ ଅନ୍ଧକାର ତାର ବୁକେର ଓପର ଚେପେ ବସେ ।

ଅନେକ ରାତେ ଗାୟେର ଓପର ହାତ ରେଖେ ସେ ବଲେ—ଆମି କି କୋନୋ ଅପରାଧ କରେଛି ତମସା ? କୈ, କିଛୁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା ?

ଉଦାସ କଠେ ତମସା ବଲ୍ଲ—ଆମାରୋ ନା !

ତବେ—ତବେ ତୁମି ଏମନ ହୟେ ଗେଲେ କେନ ? ତବେ ଏମନ କରେ' ଆମାର କାହିଁ ଥିକେ ଆଲ୍ଗା ହୟେ ତୁମି ମିଲିଯେ ଯାଇଁ କେନ ?

ତାଇତ ! ଏ କଥା କହି ତମସାର ମନେ ହୟ ନି ତ !

ଚକ୍ରଳ ହୟେ ଉଠେ ନନ୍ଦ ତାର ମୁଖେର ଓପର ଚୁମ୍ବନ କରତେ ଲାଗଲ । ତମସା କୋନୋ ସାଡ଼ା ଦିଲ ନା, ବାଧା ଦିଲ ନା, ନିଃଶବ୍ଦେ ଶ୍ରି ହୟେ ପଡ଼େ' ରହିଲ । ସନତେର ମନେ ହଲୋ, ଓଷ୍ଠ ତାର ଶୀତଳ, ଆବେଗ-ହୀନ, ଚୁମ୍ବନ ବିଷ୍ଵାଦ । ତମସାର ସମସ୍ତ ଦେହଟାଇ ଅନାସତ୍ତ, ଉଦାସୀନ । ଆନନ୍ଦେର କୋନ କମ୍ପନ ତା'ର ମଧ୍ୟେ ନେଇ ।

ତମସା ?

ଉ ?

ରୋଜ ଏମନି କରେ' ସମସ୍ତ ରାତ ତୁମି ଜେଗେ ଥାକୋ ?

ହଁ । ଯୁମ ଆସେ ନା ଯେ !

ଆବାର ଖାନିକଷଣ ଚୁପ-ଚାପ । ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଡୁବ ଦିଯେ କୋଥାୟ ସେନ ତମସା ତଲିଯେ ଘାୟ ! ଛାଯାଚିତ୍ରେର ଗତିତେ ନାନା ରକମ ଅନ୍ତୁତ ଚିନ୍ତା ତାର ମାଥାୟ ଆସେ । ମେ ଭାବେ, ତାର ଏହି ସାଜାନୋ ସଂସାର ସେନ ଲଞ୍ଚିତ ହୟେ ଗେଛେ ! ସ୍ଵାମୀର ଉପାର୍ଜନ ଆର ନେଇ, ପାଓନାଦାରରା ବିରକ୍ତ ହୟେ ଉଠେଛେ । ସର ଗେଲ, ଆସବାବ ଗେଲ, ଶ୍ରୀ ଗେଲ,—ବାବେ ସେନ ଚାରିଦିକ ଓଲୋଟ-ପାଲୋଟ ହୟେ ଚଲେଛେ ।

ଭାବତେ ଭାବତେ ମେ ହଠାଂ ଉଠେ ବସେ । ସର ଅନ୍ଧକାର, ସଫିଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଛେ ! ଶବ୍ଦଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ମନେ ହୟ—ମାଥାର ମଧ୍ୟେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସାମେରେ ସେନ କ୍ଷତ-ବିକ୍ଷତ କରିଛେ ।

ନନ୍ଦ ଯୁମିଯିଛେ ! ଆବାର ମେ ତାର ପାଶେ ଗିଯେ ଶୋଯ ! ଏହିଟୁକୁ ପରିଶ୍ରମେଇ ମେ ହାପାତେ ଥାକେ ।

.....উঃ, এ কি—টুটু যে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে! ডাক্তার এলেন, ইং—কি বললেন, ডাক্তার বাবু? ও কি, মুখ ফিরিয়ে চলে' যাচ্ছেন কেন?

তমসা বড় বড় চোখে অঙ্ককারের দিকে তাকাল।

... মাথার ওপর অশ্রুজলের আকাশটা টল্টল করছে। টুটুকে কাঁধে নিয়ে সে চলেছে রিভ, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত, মুকুতুমি পার হয়ে। টুটু মরে গেছে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। কাঁধ পেরিয়ে পিঠের দিকে টুটুর মাথাটা ঝুলছে! চোখে তার চির-নিদ্রা, চির-অঙ্ককার!.....শ্রান্তে এল, নিঞ্জন নদীর কলে শ্রান্ত।..... চিতার আগুন জললো, কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠলো। ওপর দিকে, তারপর নদী-তরঙ্গ এসে টুটুকে লেহন করে' নিয়ে গেল!

তমসা কাপছে! চৌঁকার করবে? আওয়াজ কই? প্রাণপণে সে একবার নড়বার চেষ্টা করল, পারল না। বিছানায় সাপ চুকেছে কি, এমন করে' কামড়াচ্ছে কেন?

ঘড়িটা টিক টিক ক'রে রাত্রির অঙ্ককারকে বিন্দু করছে। দুলছে, নিদ্রিত গোলাকার এই পৃথিবীটা তার চোখের উপর দুলছে!

.....এ কি, আগুন লাগলো কেমন করে? দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল চারিদিক। বাড়ী পুড়লো, ঘর পুড়লো, ইট-কাঠে আগুন লেগে পঢ়াপট শব্দ হতে লাগল। যাঃ, সব যে গেল! স্বামী গেল টুটুকে বাঁচাতে,—কৈ, আর ত বেরোল না! ওগো শুন্ধ, উত্তর দাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বেরিয়ে এসো!

সনৎ আচম্বকা উঠে বসল। তমসার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, সে থর-থর ক'রে কাপছে,—এক গা ঘাম! হাত-পাণ্ডলো বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তমসা, এখনো যুমোওনি তুমি?

কম্পিত কর্ণে তমসা বল্ল—যুমোইনি? সকাল হল যে!

জান্নলা দিয়ে সনৎ বাইরে তাকাল। পরে বল্ল—সকাল নয়, শেষ রাতের চান্দের আলো, কাকগুলো ডাক্ছে, আবার এখনি থেমে যাবে!

ও, থেমে যাবে এখনি? আচ্ছা—অসমাপ্ত কথা তার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল।

সকাল বেলা সনৎ খবরের কাগজ পড়ছে, আর জান্মার গরাদে মাথা
কাঁও করে বাসি-মুখে তমসা বসে রয়েছে। একটু আগে টুটু এসে মায়ের
কাছে কি একটা আবার ধরেছিল, তমসা তাকে ধমক দিয়ে আয়ার কাছে
পাঠিয়ে দিয়েছে। টুটুকে আজ কাল তার কেমন যেন ভাল লাগে না।

কাগজের ওপর থেকে এক সময় মুখ তুলে স্বিন্দ কঠে সনৎ বলতে গেল—
কাল থেকে প্রায় উপবাস চলছে, মুখ হাত-পা ধূয়ে এবার কিছু—

বাবুদের মত তমসা হঠাৎ ফেটে উঠল—আমার খুশি, না খেয়ে থাকবো,
তোমার কথা বলবার কি দরবার ? খবরদার বলে দিচ্ছি কোন কথা কইবে
না আমার সম্বন্ধে !

ঝঞ্চ কর্কশ হিংস্র মুখের চেহারা ! দেখলে সত্যই ভয় করে। থতমত
খেয়ে সনৎ বল্ল—তবে শুধু মুখ ধোওগে ?

না, বেশ করবো—খুব করবো—আমি এখানে বসে থাকবো। চুপ করে'
বসে থাকবো। এইটুকু অধিকার আমার নেই, কেন বল ত ? আমায় কি
কিনে এনেছ ?

একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সনৎ বল্ল—তুমি নিজেই রাগ করছ,
আমি ত তা বলিনি তমসা !

থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না, আর ভাল মাঝুষীতে কাজ নেই !
চের হয়েছে, অনেক হয়েছে—এবার ছুটি দাও।

হ-হ ক'রে সে কেঁদে ফেললো।

এমনি করে' সে আজকাল কথায় কথায় বিপর্যয় কাও বাধিয়ে বসে।

আফিস ঘাওয়া সনৎ বন্ধ করল।

বি-চাকর বামুন-আয়া পর্যন্ত তটস্থ হয়ে রইল। স্বশৃঙ্খল সু-সজ্জিত
সংসারটির মধ্যে প্রতিক্ষণেই ছন্দপতন হতে লাগল।

বেলায় ভাত বেড়ে দিয়েছে, অনেক কষ্টে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সনৎ তাকে
এনে খেতে বসালে। খেতে বসেও কেলেকারী ! ভাত-তরকারী ছড়িয়ে
জল ফেলে একাকার করল। সনৎ বল্ল—সবইত ফেলে দিলে ! ছুটি
খাও। আর নয় ত আমি থাইয়ে দেবো ?

থাইয়ে দেবে ? কেন, আমি কি খুকৌ ? আমি কি কিছু জানিনে ?
এমূলি করে আমায় অপমান করা ?

থালাটা তুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল ; পা দিয়ে ঠেলে দিল জলের পাত্রটা।

হাত ধুয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে সনৎ ভাঙ্কাৰ আনতে ছুটলো। ভাঙ্কাৱেৰ
বাড়ী গিয়ে সে দেখা পেল না, সেখান থেকে ছুটলো কবিৱাজেৰ বাড়ী।
বৃন্দ কবিৱাজকে নিয়ে সে যথন ফিরে এল, দেখল, ভিতৱে ৈ-চৈ কাঞ্চ বেধে
গেছে।

ঘৰেৰ জিনিসপত্ৰ তচ্নচ কৱা, বিছানা, বাল্ল, দেৱাজ, সমস্ত গৃহ-আসবাৰ
একেবাৱে লঙ্ঘণ্ডণ।

ঝি এসে কাদতে কাদতে তাৰ একটা হাত দেখিয়ে বল্ল—ধৰতে গেছলাম
দাদাৰাবু...আয়না ছুড়ে মাৱল...একেবাৱে রক্তাৱক্তি। কাচে কেটে গিয়ে
বুড়ো মানুষ...

সনৎ একেবাৱে শুন্ধিত হয়ে গেল। বল্ল—টুট কই?

ঝি বল্ল—লোহাৰ সৌভাগ্য নিয়ে ছেলেকে মাৱতে গেছল, আয়া নিয়ে
পালিয়েছে!

বৃন্দ কবিৱাজ মশাইয়েৰ কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। দৱজাৰ কাছে এসে
দেখলেন, আলুখালু অবস্থায় উপুড় হয়ে তমসা পড়ে রঞ্চেছে।

ধৌৱে ধৌৱে বললেন—কি হল মা তোমাৰ?

তমসা এবাৰ উঠে বসলো। ছুটি চোখে তখন তাৰ অশ্বৰ ধাৱা নেমে
এসেছে। ব্যাহুল হয়ে সে বলে উঠল—বড় কষ্ট পাক্ষি, অসহ হয়ে উঠেছে।

কবিৱাজ ‘মধ্যম-নাৱায়ণ’ তেলেৰ ব্যবস্থা ক’বৈ গেলেন।

তেলেৰ শিশি হাতে কৱে’ এনে সনৎ যখন তাৰ মাথায় মাথাতে বসলো,
তমসা এক শুয়োগে শিশিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেৰে চুৱমাৰ
কৱে’ দিল।

কিন্তু সে রাত আৱ কাটলো না! সময় নিকট হয়ে এসেছিল।

আলোটা জালাই ছিল। নিশ্চিতি রাত। সবাই গভৌৰ নিদ্রায় অভিভূত।
তৃতীয় প্ৰহৱেৰ চান নিমগাছেৰ মাথায় জ্যোৎস্না মাথিয়ে আকাশে জেগে
বসেছিল।

ছাঁৎ কৱে এক সময় সনতেৱ ঘুম ভেড়ে গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে
একটু আগে তাৰ তন্ত্রা এসেছিল। উঠে বসে সে দেখল, পায়া ভাঙা
আলমাৰিৰ মাথায় ওপৱ একটা টুল, তাৰ ওপৱ অসম্ভৃত অবস্থায় তমসা
দীড়িয়ে, হাতে একটা কাসাৱ গেলাস। গেলাস দিয়ে ঘড়িটাকে শাসিয়ে
চোখ লাল কৱে সে চাঁকাৱ কৱে উঠল—অনাচাৰি! নাস্তিক! তোমাৰ

ভালবাসা ? তোমাৰ ভালবাসায় ধৰ্ম আছে ?—বলতে বলতে বড় ঘড়িটাৱ
কাচেৱ ওপৱ সে প্ৰচণ্ড শক্তিতে আঘাত কৱল ।

ঘড়িটা তৎক্ষণাৎ চুৱমাৱ হয়ে দেয়াল থেকে মেৰোৱ উপৱ সশব্দে ভেজে
পড়ল । কিন্তু নিজে সে আৱ টাল সামলাতে পাৱলনা । টুল শুন্দি উটে
হড়মুড় কৱে আছাড় থেয়ে প'ড়ে গেল ।

জিনিস-পত্ৰ সৱিয়ে তাৱ ভিতৱ থেকে সনৎ যথন তাকে টেনে তুললো,
তমসাৱ সৰ্বাঙ্গ তথন রক্তাৱক্তি । কপালেৱ রক্ত চোখ বেয়ে ঠোঁটেৱ ওপৱ
নেমে এসেছে । তমসা খিল খিল কৱে হাসছিল ।

ছায়াবাজি

ছেট শহরটির সীমান্তে,—কি একটা অখ্যাতনামা ইষ্টিশানের কাছাকাছি ।

জল-হাওয়া বোধ হয় একটু ভালই । পূজা-পর্বে তাই চাকুরে বাবুদের ভিড় লাগে । সেবার বড়দিনের ছুটিটাও বাদ গেল না ।

ছুটি মাত্র দিন দশেকের । এই কটা দিনকে উত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে নেওয়া চাই । দেশে ফিরেই ত আবার সেই ঘানি-টানা ! জন্মনাতেই দুদিন গেল । তৃতীয় দিনে তবু যাহোক একটি মিলন-কেন্দ্র ঠিক হল ।

আজ্ঞা দিতে দয়া ক'রে অনেকেই আসেন । কুড়ি বছরের কাঁচা কেরাণী থেকে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ঘোগীনবাবু পর্যন্ত । আজ্ঞাটি যে উচুদের তাতে আর কোন সন্দেহ নেই এবং দুটি জিনিস ছাড়া যে কোন বিষয় নিয়েই সেখানে আলোচনা চলতে পারে—কুচি-বিন্দু কোনো কথা ও নীতি-বিরোধী কোনো কাজ !

বেশ তাই তাই । মাত্র আটটা দিন বৈ ত' নয় ! শীতটা সে দিন সত্যসত্যই একটু বেশী মাত্রায় পড়ে গিয়েছিল । উত্তুরে হাওয়া কি—যেন একরাশ ছুঁচ । এর উপর বন্ধুর বৃষ্টি যোগ দিয়ে সুক্ষ্মের আগে থেকেই ভারি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে । ঘর-দোর ইন্দি-ছিন্দি বঙ্ক ক'রেও শীত-কাতর বাঙালী-দেহের কাপুনি যেন আর থামতেই চায় না । বাইরের জর্মাট নিশ্চিত রাত্রি একাকার ক'রে একটানা স্বরে শ্রাবণের ধারার মত তখন অবিরল বর্ষণ হচ্ছিল ।

বাইরের ফাঁকা মাঠের হাওয়া লেগে দরজাটা মাঝে মাঝে সশব্দে নড়ে উঠেছিল । ঠিক অম্বনি কোন্ এক সময় দরজা টেনে তাড়াতাড়ি একটি লোক ঘরে ঢুকে পড়ে বললে—অরাজক আর কাকে বলে ! দেখছেন মশায় দেখছেন একবার, গরীবের উপর অত্যেচারটা একবার দেখছেন ?

অকস্মাত লোকটির এমনি অনধিকার প্রবেশে সকলেই একটু চমুকে উঠেছিল । নরেনবাবু একটু সাহসী, কয়েক বৎসর পূর্বে দিন কয়েকের জন্য তিনি সৈন্য বিভাগের দপ্তরে কেরাণীগিরি করেছিলেন । প্রয়োজন হলে তাঁর মিলিটারি রোক এখনও মাঝে মাঝে চেপে ধরে ।

বললেন—কে মশাই আপনি ? কি চান् ?

লোকটি কথাটা গ্রাহণ করলে না। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে সকলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—আপনারা সকলেই বাঙালী দেখছি; ভারি খুসী হলাম।

তাউইমশাই ধার্মিক লোক। বললেন—আহা বস্তু, বস্তু এই চৌকির ওপর ভাল ক'রে। বিদেশে কোন বাঙালীকে দেখলেই মনে হয় কতকাল ধ'রে যেন চেনাচিনি। আপনি কোথা থেকে আসছেন?—আরে মশাই, দুর্ভোগ কেন আর বলেন! শহরে গিছলাম ডাক্তার বাড়ীতে। জগতগঞ্জের মাঠ পেরোতেই দেখছেন না বড়বৃষ্টিতে একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেলাম!

বিভাস ছেলেটি ভাবপ্রবণ, কবিত্বময় এবং দরদী। সে বললে, ভিজে গেছেন একেবারে, ছুটতে ছুটতে এলেন বুরি?

লোকটা বললে—এখনও যে হাপাচ্ছি—বুরতে পেরেছেন না? যদি না ছুটি এই বৃষ্টিতে...কাশির রোগ আছে মশাই, বুরালেন ত?—ব'লে সে হঠাৎ কাশতে শুরু ক'রে দিল।

যাই হোক, কী আর হবে! বাঙালীর কাছে বাঙালী এসেছে, অনাদরও করা চলে না। তাউইমশাই তখনই তার জন্ম গরম দুধ, মোহনভোগ, এক পেয়ালা চা আর পানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

অর্থনীতিক অমরেশবাবু একটু ক্লপণ। তাই তিনি ঠিক সময়টি বুঝে একটি সিগারেট বার ক'রে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, ধরান্। ভারি ঠাণ্ডা! কিন্তু আমাদের অকর্মণ্য দেশের পক্ষে এমনি জল-হাওয়াই দরকার! ঠাণ্ডা না হলে পরিশ্রম করা চলে না, আর পরিশ্রম নৈলে পয়সা রোজগারও—। দেখুন না বিলেতের ওরা—

ডেপুটি যোগীনবাবু বিলাতের নাম শুনেই এবার কথা বলবার স্বয়েগ পেয়ে গেলেন। গড়গড়ার নল থেকে মুখ তুলে বললেন—তা নয় মশাই তা নয়। আমাদের এই অলস বাঙালী জাতটা হচ্ছে কুণ্ডা ব্যাঙ। এদের স্বভাব হচ্ছে ম্যালেরিয়ায় ভোগা আর কাজ হচ্ছে পরনিদ্রা। কোনো দিন কি এরা উন্নতি করতে পারবে ভেবেছেন? ইঙ্গিয়া গভর্নমেন্টের ক্যালেণ্ডার ঘঁটুন, দেখবেন মাজাজিরা আজকাল কি রকম—

স্বয়েগ পেলেই যোগীনবাবু এমনিভাবে স্বজ্ঞাতিদের ভুলুষ্টি করতে ছাড়েন না।

অঙ্গণবাবু অনেকদিন বেকার থাকবার পর চাকরি পেয়েছেন। স্মৃতরাং আধুনিক শিক্ষা-দৌক্ষা, সমাজ-রাজনীতি প্রভৃতির ওপর তিনি মর্শান্তিক চট। একদিকে তিনি যেমন সমাজবিপ্লবী সাম্যবাদী, অন্তদিকে স্বজাতির নিল্বা তিনি এতটুকু সহ করতে পারেন না। যোগীনবাবুর কথায় ফস ক'রে জলে উঠে বললেন—আমি বরং মুটে মজুরের কাছ থেকে দেশের নিন্দে সহ করতে পারি কিন্তু রায়সায়েব কিংবা ডেপুটির কাছ থেকে দেশের সমস্কে খোঁটা শোনা—অবশ্য যোগীনবাবুকে আঘাত করবার জন্যে আমি একথা বলছিনে।

বিভাস ব'লে উঠলো—দেশকে আমরা ভাল ক'রে কেউই জানিনে। শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ-রাজনীতি কিংবা আজকের এই নবজাগ্রত তরুণের দল—ঠিক এদের ভেতর দিয়ে দেশকে দেখলে ভুল করা হবে। দেশকে দেখতে হবে চোখ বুজে ভাবের দিক দিয়ে। রবিবাবুর কথায় আমাদের দেশ সত্যিই ভুবন-মন-মোহিনী! পায়ের তলায় নৈল জল, মাথায় সোনার কিরীট, পূর্ব প্রান্তে—অমরেশবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওসব চলবে না, বুঝলে বিভাস? আজকের যুগে আর যাই চলুক—কোনো সেটিমেণ্টাল্ আলোচনা চলবে না; আমাদের সবাইকেই নিতান্ত স্পষ্ট হতে হবে। এখনকার সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো, কেমন ক'রে আমরা বাঁচবো!

আগস্তক লোকটি চুপ ক'রেই এতক্ষণ বসেছিল। শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ সে যেন সজাগ হয়ে উঠলো। একটু নড়েচড়ে তার আরক্ষ চোখ ছুটে তুলে বললে—ঠিক ব'লছেন, সব চেয়ে বড় সমস্যা—না, একে সমস্যা ব'লে ছোট করবো না—আমাদের অহোরাত্তের চিন্তা হলো কেমন করে আমরা বাঁচবো! যে দিকে দেখছি, সবাই যেন মৃত্যুর দিকে ছুটে চলচে। আজ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু ভেবেছে, যা কিছু কাজ করেছে, যা কিছু আবিক্ষার করেছে—সমস্তই তার নিশ্চিত মরণযাত্রার সহায় হয়ে উঠেছে:

তাইত! এ লোকটি এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিল যে! নিতান্ত সাধারণ মানুষটি সহসা সকলের মাঝখানে কেমন ক'রে যেন বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। যোগীনবাবু মুখ থেকে নলটা নামালেন। সৈনিক নরেনবাবুর রোক উবে গেল। অর্থনীতিক অমরেশবাবুর কথার সূত্রটা যে এমনি ভাবপ্রবণতার পথ ষেঁসে চললো—এজন্যে ক্ষুঁশ হয়ে তিনি এদিকে চেয়ে রইলেন। তাউই-

ମଶାଯେର ଏକଟୁ ଆଫିଂ ଥାଓୟାର ଅଭ୍ୟାସ, ତିନି ତାହି ଚୋଥ ବୁଝେ ଘାଡ଼ ହେଟ୍
କ'ରେ ରହିଲେନ । ବିଭାସ ତଥନ ବୋଧ କରି ମନେ ମନେ ଆଓଡ଼ାଛିଲ—

‘ନୀଳ ସିଙ୍ଗୁ-ଜଳ, ଧୌତ ଚରଣ-ତଳ ।’

ବାଈରେ ବର୍ଷଣ-ଧାରାର ଶବ୍ଦ ତଥନଙ୍କ ଥାମେନି । ଆହତ ଦସ୍ତ୍ୟର ମତ ଗୋ-ଗୋ
କ'ରେ ହାଓୟା ବହିଛିଲ ।

ଏକଟୁ ଥେମେ ଲୋକଟି ବଲଲେ—ଆଜକେର ପୃଥିବୀତେ ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟେ ହୟେ
ଗେଛେ, ମାନୁଷ ତାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ ଏକେବାରେ ଭୁଲେ ଗେଛେ । ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତା ହୟେ
ଉଠେଛେ ଆମାଦେର ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି । ଏ କେନ ବଲତେ ପାରେନ ?

ସମାଜ-ବିପ୍ଳବୀ ଅର୍ଥଣ ଏବାର ଭୟାନକ ଜୋରେ ମାଥା ଚାଡ଼ା ଦିଯେ ଉଠିଲୋ ।
ବଲଲେ—ଏ ଶୁଦ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଲୋଭୀର ପାପେ, ବୁଝଲେନ ? ଆମାର ମନେ ହୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଆଜ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିତେ ହବେ । ସାମ୍ୟବାଦହି ହଞ୍ଚେ ଆଜକେର
ଯୁଗେ ବାଁଚବାର ସବ ଚେଯେ ବଡ଼ ଉପାୟ । ଏର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ଭାବେର ଘୋର ନେହ !

‘ଲୋକଟି ଏକଟୁ ହେସେ ବଲଲେ—ମାନୁଷକେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଲେଇ ଯେ ସେ ବଡ଼
ହୟେ ଉଠିବେ, ଏ ଭୁଲ ଆପନାଦେର ଭେଦେ ଯାଓୟା ଦରକାର । ମାନୁଷ ବାଁଚେ ମାନୁଷେର
ପ୍ରାତିର ମଧ୍ୟେଇ । ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନଟିଇ ଏ ଯୁଗେର ସବ ଚେଯେ
ବଡ଼ ମୂଳଧନ । କିନ୍ତୁ ଏକଟି ବଞ୍ଚିର ଅଭାବେ ଆଜଓ ଏରା ସାର୍ଥକ ହୟେ ଉଠିତେ
ପାରେନି । ସେ ହଞ୍ଚେ, ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ମାନୁଷେର ସହଜ ପ୍ରେମ । ଜୀବନେର ପ୍ରତି
ଏକାନ୍ତ ମମତା ।

ଅମରେଶବାବୁ ଏବାର ଭୁଲୁ କୁଁଚକେ ଅବଜ୍ଞାର ହାସି ହେସେ ବଲଲେନ—କିଛୁ
ମନେ କରବେନ ନା, ଏବାର ଆପନାକେ ବେଶ ବୁଝିତେ ପେରେଛି । ଐ ପ୍ରେମ ଜିନିସଟି
ହଞ୍ଚେ ଏକେବାରେ ଧୋୟା । ଇହା, ଶ୍ରୀପୁରୁଷେର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଓଟା ବଲିତେନ ତା ହଲେନ୍
ନା ହୟ—

ବିଭାସ ଏତକ୍ଷଣ ବୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁ-ଜଳେ ସ୍ଵାତାର କାଟିଛି । ସେ ବ'ଲେ
ଉଠିଲୋ—ଅମରେଶବାବୁର କାଛେ ଚକ୍ରକେ ଚାକ୍ରି ଛାଡ଼ା ବାଦବାକି ଜଗତଟାଇ ହଞ୍ଚେ
ନିତାନ୍ତ ଧୂତ୍ରମୟୀ !

ଅମରେଶ ବଲଲେ—ବିଭାସଚଙ୍ଗେର ଚୋଥେର କାଜଳ ଆଜଓ ମୋଛେନି
ଦେଖିଛି !

ବିଭାସେର ବଦଳେ ଓହି ଲୋକଟିଇ ଉଭର ଦିଲେ । ବଲଲେ—ଏଟା ଚୋଥେର
କାଜଳ ନୟ, ଏ ହଞ୍ଚେ ସତିକାରେର କାଲ୍ଚାର । ଆମରା ବଞ୍ଚିଜାନେର ଅନ୍ତର ଦିଯେ
କାଲ୍ଚାରକେ ହତ୍ୟା କରେଛି । ସ୍ଵାଧୀନତା ମରେଛେ ସଭ୍ୟତାର ପାଯେର ତଳାୟ ।

আজ বাইরের চেয়ে নিজেদের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আগ্নবিশ্বেষণই হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীব্যাপী হত্যাশালা থেকে মুক্তি পাবার উপায় !

অমরেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন—প্রেমকে আপনি কি রকম ভাবে নিতে চান् ?

লোকটি বললে—প্রেম হচ্ছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এ'কে না হলে কারো চলবে না। জীবনের প্রকাণ্ড বৃক্ষ এই বস্তি থেকেই রস টেনে নিজেকে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত-প্রসারিত ক'রে দেয়। একে বাদ দিয়ে চল্লে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতাই নেই।

শেষ কথাটির ওপর এত জোর পড়লো যে সকলেই একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন।

লোকটি বলতে পারে ভালই কিন্তু সব জড়িয়ে তাকে তেমন ভাল লাগে না। অবিশ্বস্ত ঝটার মত এলোমেলো কতকগুলো মাথার চুল, শূকনো চেহারা, চোখছচ্টো লাল, দাঢ়ি-গেঁফে মুখখানা একাকার ; চেহারাটা যেন হত্যী ! লোকের সহানুভূতির চেয়ে সন্দেহই যেন বেশী আকর্ষণ করে।

ডেপুটি যোগীনবাবু নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গড়গড়াটা সরিয়ে রেখে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন,—প্রেমের আলোচনা তিনি এখন আর সহিতে পারেন না।

তাউইমশাই ব'লে উঠলেন—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভাল করতে, বুঝলে বেয়াই ?

বেয়াই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—তুমি বসে থাকো হে। আফিং খেতে ভালবাসো গাজাখুরি কথাগুলোও ওই সঙ্গে ভাল লাগবে !

সমাজবিপ্লবী এবং দেশভক্ত অরুণ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে,—যোগীন-বাবুর জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখ হলো ওঁর মা-বাপ কেন বিলেতে জন্মাননি।

কিন্তু তার কথাটা কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যেন ভেসে গেল। নবাগত লোকটির শেষ কথাটা তখনও যেন ঘরের চারিদিকে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সকল কথার আড়ালে কি যে একটি গভীর কথা সে বলতে চায়—আজকের এই অঙ্ককার দুর্যোগের রাতে তার জীবনের কোনু মুক একটি বেদনাকে হয়ত সে এই অপরিচিত অজ্ঞাত আলাপীদের

কাছে ভাষায় বেঁধে দিয়ে যেতে চায়,—এই কথাটিই ক্ষণে ক্ষণে সকলের মনে হচ্ছিল।

অমরেশ বললেন—আপনি যার কথা বলতে চান সে রকম প্রেম ত পৃথিবীতে নিতান্তই অসম্ভব বস্তু। তা নিয়ে স্বপ্ন দেখাই চলতে পারে, সত্য হয়ে উঠতে পারে কি কোনো দিন?

পারে! লোকটি বললে—আমরা আকাশে উড়তে পারি, জলের তলায় ঘুঁক করতে পারি, গাছের হাসিকাঙ্গা আবিষ্কার করতে পারি, এত বড় শক্তি আমাদের রয়েছে—কেবল মানুষকে ভালবাসবার শক্তিই আমাদের নেই।

অরূপ বললে—আছে, নিশ্চয়ই আছে। আছে ব'লেই আমরা আজও সেই শক্তির কল্পনাও অন্ত করতে পারছি।

বিভাস বললে—জগতটা হচ্ছে শুধু আনন্দের প্রকাশ, আনন্দ থেকেই আমাদের উন্নতি এবং পরম্পরার প্রীতিই যে আনন্দের স্বরূপ—এই ভাব, এই স্বপ্নও আমাদের ভুললে চলবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ভারত একদিন—

চুপ কর হে, চুপ কর—অমরেশ তাকে আবার থামিয়ে দিলেন—তোমার ভাব-রসের বৃসিক সকলেই নয়। জ্যৈষ্ঠারের ছেলে তুমি, কত ধানে কত চাল ত আর জানো না ভাই!—আচ্ছা, আপনার কথাই আবার বলুন, শোনা যাক। আপনার নিজস্ব যে একটা কাল্চার আছে এ কথা আমি মেনে নিচ্ছি। জীবনে বোধ হয় আপনি দুঃখ পেয়েছেন খুব, কি বলেন?

লোকটি একটুখানি হাসলে। এ হাসির মধ্যে কোথায় যে একটি স্বনির্বাচিত বেদনা লুকিয়ে আছে, কিংবা এ হাসি সংসারের সমস্ত উদ্বেগের প্রচলন একটি বিজ্ঞপের প্রকাশ, অথবা এ হাসিটুকুর মধ্যে নিজের প্রতি কোনো অনুকম্পা ছিল কি না,—কিছুই বোঝা গেল না।

তাউইমশাই শুধু একবার ঘাড় তুলে আবার হেঁট হয়ে রইলেন। তিনি ধর্মালোচনার অপেক্ষায় কাল যাপন কচ্ছিলেন।

লোকটি বললে—কিছুই না। সত্যকারের দুঃখের কি কোনো বর্ণনা আছে, আপনি বলতে চান?

—সে কি! নেই? এই যে সংসারের এত—

আবার হেসে লোকটি বললে—সংসারের অনেক দুঃখই আছে; যার

অস্ববস্ত্র নেই, যার স্বাধীনতা নেই, যার আশ্রয় নেই, তার জীবন হয়ত শুধু বিধাতার রসিকতা। কিন্তু আমি এদের মোটেই দুঃখ বলি না। নেলে—

অমরেশ ব'লে উঠলেন—ক্ষমা করবেন, এক মিনিট আগে আপনাকে হঠাতে একটু ভুল বুঝেছিলাম। আপনি যা বলছেন তা যে শুধু আমরাই বুঝচিনে তা নয়, আপনি নিজেও এ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না। অবশ্য আজকের ঠাণ্ডায় বাদলায় আপনার হেঁয়োলী যে একেবারেই খারাপ লাগছে তা নয়; কিন্তু লেখাপড়া আমরাও কিছু কিছু জানি, একটু ভেবেচিস্তে বললে খুসী হই।

সমাজতন্ত্রবাদী এবার চট ক'রে অর্থনীতিকের দলে ভিড়ে গেল। বললে—সত্যিই তাই। অর্থপিশাচ ধনিকেরা আজ সর্বত্র যে মানুষের টুঁটি টিপে রক্ত খাচ্ছে, সাম্রাজ্যলোভীরা পরাধীন জাতিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে,—এরা যে সব দুঃখের স্ফুরণ করেছে সেগুলো কিছুই না, আর মানুষের সামাজিক কল্ননার সৌধীন চিন্তা, সেই হবে দুঃখের বিশ্লেষণ? এ সত্যই দুঃখের কথা।

লো'কটি বললে—মার্জনা করবেন, এসব আমার কথা মাত্র। আপনাদের কাছে যে এর কোনো দাম হবে এ সন্দেহও আমার নেই। তা ছাড়া এ আমার মতামতও নয়। মনে আসচে তাই ব'লে যাচ্ছি, কাল হয়ত অন্ত কোথাও ঠিক এর উল্টো কথাই বল্বো।—পরে একটু হেসে বললে—আমার একটা গুণ আছে, আমি প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি।

বিভাস এবার একটু সরে এসে বসলো। মুখ্যদৃষ্টিতে চেয়ে শুধু বললে—আপনার নাম কি?

—নাম? আমার নাম সিদ্ধেশ্বর পাঠক। কেন বলুন ত?

—আপনার মত লোকের দেখা পাওয়া সৌভাগ্য!

অমরেশ তখন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একদিকে চেয়েছিলেন। এবার বললেন—আপনার সমাজ নেই, প্রচলিত সংস্কার আপনি মানেন না, আপনার কোনো ধর্ম নেই, দুঃখটাও আপনার কাছে একটা বাজে কথা।

সিদ্ধেশ্বর বললে,—বাজে কথা ত বলিনি। আমি বলতে চাই জগতে সব চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে ভয়ানক চেতনা। এ যে জীবনের কত বড় ব্যথা—

অমরেশের মাথা আবার গোলমাল হয়ে গেল, কৌতুহল দমন ক'রে বললেন—এ আপনি সত্য বলচেন?

অঙ্গ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। হঠাৎ অমরেশের প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে বললে—নরনারীর প্রেমের ব্যাপারেও বোধ হয় আপনার কোনো বিভাস নেই?

রাত ওদিকে অনেক হয়ে গেছলো। তাউইমশাই কি জানি কেন, এতক্ষণ মাঝে মাঝে উস্থুস্ক কচ্ছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললে—নেই বললেই ত আমার পক্ষে ভাল হতো। আর প্রেম ব'লে সত্যিই যে কোনো বালাই নেই, এই কথাই আমি সকল দিকে প্রচার করতে চাই। বিশেষতঃ নরনারীর সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যা, এত বড় ফাঁকা কথা বোধ হয় আর কিছু নেই।

বিভাস কাতর হয়ে ব'লে উঠলো—সে কি দাদা, এ আবার আপনি কোন্‌ পথে ছুটচেন? আপনার জীবনে প্রেম কি একেবারেই বাজে কথা? সত্যিই কি সেখানে প্রেম নেই?

সিদ্ধেশ্বর শেষের প্রশ্নটিতে একেবারে যেন হতচকিত হয়ে গেল। উজ্জীয়মান পাখীর ডানা কেটে নিলে তার যে অবস্থা হয়, সেও তেমনি যেন হঠাৎ ভুলুষ্টি হয়ে অসহায়ক্রিয়, আচ্ছন্ন কর্ণে বলতে লাগলো,—আছে ভাই; আছে ব'লেই তাকে এত বড় আঘাত করলে সাহস করি! আচ্ছা, রাত এগারোটা বাজতে একটু দেরী আছে, কি বলেন? প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা কখন ছাড়ে কে জানে!

অমরেশ বললেন—খানিকটা দেরী আছে বটে ছাড়তে।

বিভাস বললে—তা থাকুক, আপনার প্রেমের গল্প না শুনে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। বলুন!

এক অত্যাশৰ্চর্য বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প সিদ্ধেশ্বর স্বরূপ ক'রে দিল। কিন্তু গল্পটি প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছিল তখন হঠাৎ ওপাশের জানালার ধারে অনেকগুলো লোকের গলার আওয়াজ শোনা গেল।—

বাবুজি?—বাবুসাহেব?

সকলে চমকে উঠে জানলার দিকে চাইলে। তাউইমশাই আঁককে উঠে বললেন—কোন্‌ হায়?

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু মিনিট দুই পরেই দেখা গেল, একটি অন্দনরত ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন জমাদার, একজন দারোগা আর দুটি কনষ্টেবল ওদিক দিয়ে ঘুরে এসে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। দারোগাটি নমস্কার জানিয়ে

বললে—ক্ষমা করবেন, এখানে একটি লোককে খুঁজতে এসেছিলাম। যজ্ঞেশ্বর ঘটক এখানে কার নাম ?

সকলেই বজ্ঞাহতের ঘত তাকিয়ে রইলো। রোকন্দমান ভুলোকটি চোখ মুছে বললেন—এখানে সে নেই দারোগাবাবু।

সিদ্ধেশ্বর ইতিমধ্যে কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ জানে না।

অমরেশ বললেন—সিদ্ধেশ্বর পাঠক বলে একটি লোক—

—ইংসাই, ওই লোকটাই। মাঝে মাঝে এই নামে চলে। কোথায় সে মশাই ? কোথায় বলুন ত ?

এই ত বসেছিল এখানে এতক্ষণ। বৃষ্টিতে ভিজে বেচারা...আর ত দেখতেই পাচ্ছি না। বোধ হয় ইষ্টিশানের দিকে গেছে। একটু আগে গাড়ী ছাড়বার সময় জিজ্ঞেস কচ্ছিল। কি দরকার তাকে বলুন ত ?

দারোগাবাবুর দল ক্রতবেগে প্রস্থান কচ্ছিল। তিনি বললেন,—দাগী আসামী মশাই, কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে।—হতভাগা বদ্মাইস, চরিত্রহীন !

তিনিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন! বাইরে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়ে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

তাউইমশাই বললেন—মনের গন্ধ পেয়ে তখনি আমি টের পেয়েছিলাম, বুঝলে মিলিটারি ? কিন্তু যাই বল, ডেপুটি আমাদের খুব মানুষ চেনে। নৈলে যে লোক ধর্ম মানে না—

মিলিটারী নৱেনবাবু প্রস্তরবৎ বসেছিলেন।

অকস্মাত সেই মুহূর্তে ওদিক থেকে বিভাস চৌঁকার ক'রে উঠলো,—তাউই-মশাই, একি বলুন ত ? আমার মনিব্যাগ ? এই যে পকেটে ছিল...অনেক টাকা.....

—ওঁয়া ?

কন্দশাসে বিভাস বললে—ব্যাক থেকে ফিরে আর বাড়ী চুকিনি। অনেক টাকার নোট ছিল তাউইমশাই !

—বাঃ চমৎকার !—বসে বসে প্রেমের গন্ধ শুনছিলে বুঝি ? দক্ষিণা দিতে হলো ত ? এখন কি করবে ?

অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ তখন একেবারে চূপ।

ରୋଗ

ଆପିସେ ନା ଗେଲେଇ ନୟ । ଶରୀରଟା ଭାଲୋ ଯାଚେ ନା ଅନେକ ଦିନ ଥେକେ । କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ଦେଖା ମାତ୍ରଇ ଇନ୍ଦାନୀଂ କେରାନୀ ମହଲେ ସାଡା ଓଠେ,—ଏବାର ବେଶ ଭମିଯେ ବ'ସେ ଏକଟା ଗଲ୍ଲ ବଲୋ ଦେଖି ! ଏକ ଏକଦିନ ଏମନ ହୟ ଯେ, ସବାଇ ମିଳେ ନାହୋଡ଼ିବାନ୍ତା ; କାଜକର୍ମ ଛେଡ଼େ ସକଳେ ଶୁଣିଯେ ବ'ସେ ଆପିସ ଘରେ ଶୁଧୁ ଗଲ୍ଲ । କିନ୍ତୁ ଗଲ୍ଲ ବଲତେ ବସଲେଇ ଯେ ଗଲ୍ଲ ବଲା ଯାଇ, ଏ ଆମି ମନେ କରିନେ । ତାହାଡା ଷେଟା ବଲଲୁମ, ସେଟା ହୟତ ଜମଲୋ ନା ; କିଂବା ଷେଟାକେ ଗଲ୍ଲ ମନେ କ'ରେ ବଲଲୁମ, ଲୋକେ ସେଟା ଶୁନେ ହୟତ ବଲଲେ, ଏ ବଞ୍ଚି ଆର ଯାଇ ହୋକ,—ଗଲ୍ଲ ନୟ । ଶୁତରାଂ ଗଲ୍ଲ ବଲା ଏକଟା ସମସ୍ତା ବୈକି । କଲ୍ ଟିପଲେ ମେସିନ ଘୋରେ, କିନ୍ତୁ ଗଲ୍ଲର ଦାବି ନିଯେ କୋନୋ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଲା ଟିପଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ମାଥାଇ ଘୋରେ ।

ସେଦିନ ଆମାଦେର ପାଡାୟ ନବକେଷ୍ଟବାବୁର ଡାକ୍ତାରଥାନାୟ ଏକଟୁଥାନି ବନେଛି ମାତ୍ର, ଅମନି ଓରା ଧରେଛେ,—ଗଲ୍ଲ ବଲୋ । କୁଣ୍ଡ ଶରୀର ନିଯେ କୋଥାୟ ବା ଯାଇ, ତାଇ କାହାକାଛି ଡାକ୍ତାରଥାନାୟ ଦୁ'ଦଣ୍ଡ ସମୟ କାଟାତେ ଏଲୁମ,—ଏଥାନେଓ ଏହି ବିପତ୍ତି । ତୋମାର ମେଜାଜ-ମର୍ଜି ଯେମନଇ ଥାକ୍, ଅନୁଥବିନୁଥ ଯାଇ ହୋକ, ତୁମି ଯେହେତୁ ଗଲ୍ଲ ଜାନୋ, ସେଇ ହେତୁଇ ତୋମାକେ ଗଲ୍ଲ ବଲତେ ହବେ । ଅନୁଷ୍ଠ ହ'ଲେଓ ତୋମାକେ ବଲତେ ହବେ, ଇଚ୍ଛେ ନା ଥାକଲେଓ ବଲତେ ହବେ ।

ଡାକ୍ତାରବାବୁର ଆସତେ ଦେଇ ହଚ୍ଛେ, ଶୁତରାଂ କିଛୁକ୍ଷଣେର ଜନ୍ମ ବେରିଯେ ପଡ଼ଲୁମ । ଆବାର ଆମାକେ ଘୁରେ ଏଥାନେଇ ଆସତେ ହବେ । ବଲା ବାହଲ୍ୟ, ଏକଟୁ ବିରଙ୍ଗ ହୟେଇ ଆମି କାହାକାଛି ଏକ ପାକେ ଏସେ ଟୁକଲୁମ । ପାକେ ଆସାଓ ବିପଦ, ଚେନା ଲୋକ ଦେଖିଲେଇ ଧ'ରେ ବସବେ, ଗଲ୍ଲ ବଲୋ । ତବେ ପାକେ ଆଜକାଳ ବଡ଼ ଏକଟା ଆସାଓ ହୟ ନା । ତା ଛାଡା ଏଲେଓ ଯେ ଏକଟୁ ନିରିବିଲି ବସବାର ଜାଯଗା ଥୁଁଜେ ପାବୋ ତାଓ ଅସ୍ତ୍ରବ । ଆଜକାଳ ଆବାର ମେୟେରାଓ ପାକେ ଭୌଡ଼ କରେ । ଫଳେ, ବିକେଳବେଳାଟା ପାକେ ଏମନ ମେୟେ-ପୁନ୍ରଷେର ଭୌଡ଼ ହୟ ଯେ, ନିରିବିଲି ଇଟାଚଳା ଏକେବାରେ ଦୂରାଶା ।

ହଠାତ୍ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲୋ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାୟ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ରାସ୍ତାଟାର ଧାରେଇ ଏକଥାନା ବେଞ୍ଚି ଥାଲି । ରୋଗା ଶରୀର ନିଯେ ଢୁକେଛି, ଏକଟୁଥାନି ବସବାର ଜାଯଗା ପେଯେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହୋଲୋ । ତାହାତାଡ଼ି ଏଗିଯେ ଏସେ ବେଞ୍ଚିଥାନାର କୋଣେ ଥୁଣୀ ହୟେ ବ'ସେ ପଡ଼ଲୁମ । ଚାରିଦିକେ ଧୈ ଧୈ କରିଛେ ମେୟେ ଆର ପୁନ୍ରଷ । ଛୋଟ ଛେଳେ-

ମେଘେରୀ ଏଥାନେ ଓଥାନେ ଖେଳା କରଛେ । ସାରାଦିନ ଶୁମ୍ଭାଟେର ପର ମଧୁର ବାତାସ ବହିଛେ ।

ଆମାର ବେଞ୍ଚିର ପିଛନ ଦିକେର ପଥ ଦିଯେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତଭାବେ ବାୟୁସେବୀର ଦଳ ଆନାଗୋନା କରଛେ । କା'ରୋ ଦିକେ ତାକାବାର, କିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରବାର କୋନାଓ କୌତୁଳ ଆମାର ନେଇ । ଖାନିକଟୀ ସମୟ କୋନୋ ମତେ କାଟାବୋ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୱ ।

ଆଧ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ କେଟେ ଗିଯେଛେ, ଏମନ ସମୟ ସହସା ଆମି କି ଯେନ କି କାରଣେ ଏକଟ୍ଟ ସଚେତନ ହୟେ ଉଠିଲୁମ । ଆମାର ଆନ୍ଦାଜଟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଭୁଲ କିନା ଆମି ଠିକ ବୁଝିତେ ପାରିଲୁମ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେ ହୋଲୋ, ଆମାର ପିଛନ ଦିଯେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଘ-ପୁରୁଷ ଆସିଛେ ଆର ଯାଇଛେ, ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଶେଷ କ'ରେ ଏକଜନ ଯେନ ଏକଟ୍ଟ ଅନ୍ତରକମେର । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵଯେର କଥା ଏହି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ନୟ, ମେଘେ । ତାର ଆନାଗୋନାଟୀ ସେମନ ଦ୍ରତ୍ତ, ତେମନି ଘନ ଘନ । ଚୁପ କ'ରେଇ ରହିଲୁମ । ଘାଡ଼ ଫିରାଲେ ପାଛେ ଆମାର କୌତୁଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଏଜନ୍ତ ସଥାସନ୍ତବ ବୈରାଗ୍ୟ ବଜାୟ ରେଖେ ନିଜେର ମନେଟି ବ'ସେ ରହିଲୁମ । ତଥନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୟନି, ଶେଷ ବେଳାକାର ଆଲୋ ବେଶ ଆଛେ ।

ପାଚ ସାତ ମିନିଟ ପରେଇ ଦେଖି, ଠିକ ସେଇ ମେଘେଟି ହଠାତ ଥମକେ ଛ'ପା ଏଗିଯେ ଆମାରଙ୍କ ବେଞ୍ଚିର ଓ-କୋଣେ ଏସେ ବସିଲା । ବୁଝିତେ ପାରା ଗେଲ, ଅନେକକଣ ଥେକେଇ ସେ ଇତ୍ସତଃ କରଛିଲ । ମେଘେଟି ଶୁଣ୍ଣି—ତବେ ପରିଚିନ୍ଦଟୀ ତେମନ କିଛୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୟ । ତାର ହାତେ କାଗଜ-ମୋଡ଼ା ଏକ ମୁଠୋ ପାନ ଛିଲ, ତାର ଥେକେ ଏକଟିର ପର ଏକଟି ପାନ ନିଯେ ମୁଖେ ପୁରିତେ ଲାଗିଲା । ବୟସ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚଶିର ମଧ୍ୟେ, କିନ୍ତୁ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବେଶ ସହଜ । ଏକ ସମୟ ମୁଖ ଥେକେ ପାନେର ରମ ପଡ଼ିଲା ଆୟଚିଲେ—ଭକ୍ଷେପ କରିଲା ନା । ଆଜକାଳ ପାନେର ଦୋକାନେର ଆଯନାର ସାମନେ ମେଘେରୀ ଦୀଢ଼ିଯେ ପାନ କିନିଛେ, ଏ ମେଘେଟିଓ ଖୁବ ସନ୍ତବ ଦୋକାନ ଥେକେଇ ପାନ କିନେ ଏନେଛେ । ଆଶା କରା ଯାକ ଭଜ ଘରେରଇ ମେଘେ । ମେଘେଟିର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଶୀ ବେଶ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ—କିନ୍ତୁ ଯାକ, ଅନ୍ତଦିକେଇ ଆମାର ମୁଖ ଫେରାନୋ ଛିଲ । ଏବାର ଡିଟବୋ । ଏତକଣେ ହୟତ ନବକେଷ୍ଟବାବୁ ଡାକ୍ତାରଥାନୀଯ ଏସେ ପୌଚେଛେନ । ଗିନ୍ଧୀ ମାଥାର ଦିବିଯ ଦିଯେ ବଲେଛେନ, ସନ୍ଧ୍ୟର ଆଲୋ ଜଲିଲେଇ ବାଡ଼ୀ ଫିରୋ । ରୋଗୀ ଶରୀରେ ଯେନ ଠାଣ୍ଡା ଲାଗିଯୋ ନା ।

ଏହି ଉଠି ଆର କି । ଏମନ ସମୟ ହଠାତ ମେଘେଟି ଆମାର ଦିକେ ଫିରିଲା । ବଲଲେ, ଏକଟି କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେ କିଛୁ ମନେ କରିବେନ ?—ହ୍ୟା, ଆପନାକେଇ ବଲଛି ।

ମୁଖ ଫିରିଯେ ତାକାଲୁମ । ସଲଜ୍ ଶାନ୍ତ ଚେହାରା । କଠିନର ସହଜ, ଶିଷ୍ଟ ।
ମେ ପ୍ରସ୍ତୁ କରିଲୋ, ଆପନାର କି ମନେ ଆଛେ, ରାଁଚୀତେ ଆପନାକେ ଦେଖେଛିଲୁମ ?
ମେଥାନେ କି ଆପନି ଚାକରି କରିଲେ ?

ରାଁଚୀତେ ?—ଆମି ଅବାକ ।—କବେ ବଲୁନ ତ ?

କେନ, ଗେଲ ବହର ? ଆପନାର ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା ?

ଗେଲ ବହର ! ଆପନି ବୋଧ ହ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛେନ, ଆମି ନଇ । ସାତ ଆଟ
ବହରେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ରାଁଚୀ ଯାଇନି ।

ମେଯେଟି ବଲିଲେ, ଓ, ତାହଲେ ଆମାରିଇ ଭୁଲ—ଆମାଯ କ୍ଷମା କରିବେନ ।—ଏକଟୁ
ଥେମେ ମେ ଆବାର ପ୍ରସ୍ତୁ କରିଲୋ, ଏଥାନେ ଆପନି କୋଥାଯ ଥାକେନ ?

ବଲଲୁମ, ଏହି କାହାକାହି—ଓହି ପୂର୍ବଦିକେର ଗଲିତେ । ପୋଓୟାଟାକ ରାନ୍ତା ।

ମେ ବଲିଲେ, ଏବାର କଲକାତାଯ କୀ ଗରମ ଦେଖିଛେନ ? ବୃଣ୍ଡିର ନାମ-ଗନ୍ଧାରେ ନେଇ !
ରୋଦ ଏକଟୁ କମତେ ନା କମତେଇ ଲୋକେରା ପିଲପିଲ କ'ରେ ପଥେ ବେରିଯେ ପଡ଼େ !

ମେଯେଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଦ୍ର ବୈ କି । ତବେ ଫରାସୀ ଦେଶେ ନାକି ଏହିଭାବେଇ
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭାରତବର୍ଷ, ତାହି ଏକଟୁ ଆଡ଼ିଷ୍ଟ ହଚ୍ଛିଲୁମ । ତବେ ତାର
କଥାବାର୍ତ୍ତାୟ ଏମନ ସରଲତା ଛିଲ ଯେ, ଆମାକେଓ ଏକଟୁ ସୌଜନ୍ୟ ରଙ୍ଗା କରିତେ
ହୋଲୋ । ବଲଲୁମ, ଆପନାଦେର ବାଡୀ କୋନ୍ ଦିକେ ?

ବେଶୀ ଦୂରେ ନୟ, ଏଥାନ ଥେକେ ଧରନ ମିନିଟ ଦଶେକେର ପଥ !

ବାଡୀତେ କେ କେ ଆଛେନ ଆପନାର ?

ମେଯେଟି ହାସିଲୋ । ବଲିଲେ, ଗେରଙ୍ଗ ଘରେ ସାଧାରଣତ ଯାରା ଥାକେନ ତୁରାଇ
ଆଛେନ ? ଆମି ଆମାର ବାବାର ଓଥାନେଇ ଥାକି ।

ବଲଲୁମ, ଆପନାର ସ୍ଵାମୀ କି କରେନ ?

ସ୍ଵାମୀ !—ଓକଥା ଥାକୁ, ଆପନି ଅନ୍ତ କଥା ବଲୁନ ।—ପାନ ଚିବାନୋ ବନ୍ଧ କ'ରେ
ମେଯେଟି ଏକଟୁ ଯେନ ଅନ୍ତମନଙ୍କ ହେବେ ଗେଲ ।

ଭାଙ୍ଗାରଥାନାୟ ଏତକ୍ଷଣେ ବୋଧ ହ୍ୟ ନବକେଷ୍ଟବାବୁ ଏମେହେନ : ଭାବଲୁମ ଏବାର
ଆମି ଉଠି । କିନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ମେଯେଟି ବଲିଲେ, ଆପନାକେ ଅନେକକ୍ଷଣ ଧ'ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରିଛିଲୁମ, କିନ୍ତୁ ଏମନ ଭୁଲ ହେବେ ଆମି ଭାବିନି । ଅବିକଳ ଆପନି ମେହି ଭଦ୍ର-
ଲୋକଟିର ମତୋ ଦେଖିତେ । ଏମନ ମିଳ ଦେଖା ଯାଯ ନା ।

ବଲଲୁମ, କେ ମେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ?

ଚେନା ଲୋକ, ଖୁବଇ ଚେନା । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ର୍ୟ,—ଚିନିତେ ପାରଲୁମ ନା । ଚିନିତେ
ପାରିଲେ ଭାଲୋ ହୋତେ । ଅନେକ କଥା ଛିଲ ।

এবার আমি মুখ তুলে তাকালুম, এবং মেয়েটিও আমার চোখের উপর চোখ রাখলো। দেখলুম সে-চাহনি অত্যন্ত নির্মল, এবং প্রসন্ন। নিজের সন্দেহের জন্য নিজেকেই আমি ধিক্কার দিলুম। মেয়েটি আমার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রেই বললে, আপান আমার একটু উপকার করবেন ?

আকুঞ্জন ক'রে তাকালুম। কৌতুকজনক বটে।

মেয়েটি বললে, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, বিশ্বাস করুন।

সোজা হয়ে নড়ে চ'ড়ে বসলুম। গলা পরিষ্কার ক'রে বললুম, আপনাকে দেখে ত' মনে হচ্ছে না, কোনো কষ্ট পাচ্ছেন ?

মেয়েটির কঠস্বরে কাপন লাগলো। বললে, বাইরে থেকে কিছু টের পাবেন না। মেয়ে মানুষ বেশী কষ্ট পায় ভেতরে, সকলের মাঝখানে থেকেও সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট পায়। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

আমাদের পিছন দিকে অবারিত লোকজন আনাগোনা করছে। দেখে যাচ্ছে অনেকে, কারো বা চোখে মুখে কিছু সরল কৌতুহল দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার বিলৰ্ব নেই। শান্তকণ্ঠে বললুম, আপনি ত' স্বামীর কাছে এসব আলাপ আলোচনা করতে পারতেন ?

স্বামী যদি বন্ধু না হয়, তার কাছে কি মনের কথা কেউ বলে ? তা ছাড়া এমন কথাও আছে, স্বামীর কাছে কোনোমতেই বলা যায় না ! স্ত্রীর মন আর স্ত্রীলোকের মন এক নয় !

মেয়েটির চিন্তাশীলতা দেখে আমার চমক লাগলো। এ নিতান্ত রাস্তাঘাটের পান-থাওয়া ঢলচলে মেয়ে নয়। উচ্চশিক্ষার পালিশ আছে। আস্তে আস্তে বললুম, আপনার জন্তে আমি কি করতে পারি বলুন ?

পানের রস আবার গড়িয়ে এসেছে তার ঠোটের কোণ বেয়ে। মনে হচ্ছে ঈষৎ অসত্ক, একটুখানি অমনোযোগী। বসবাব ভঙ্গীও যেন একটু অগোছালো। কিন্তু সেদিকে ভক্ষণ না ক'রে সে বললে, আগে কথা দিন আমার একটি সামাজি অনুরোধ রাখবেন ?

অনুরোধ ? কি রকম ?

ঘে-ঘন্টণা আমি সহ করছি, আপনি তার প্রতিকার করুন এই অনুরোধ আমাচ্ছি। আপনি দয়া ক'রে আমার অনুরোধ রাখুন !

মেয়েটির আকুলতা দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এবার বোধ-

হয় আমার রোগা শরীরে ঠাণ্ডা লাগছে। নবকেষ্টবুরু ডাক্তারখানা হয়ে
তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবো।

আপনি কি উঠছেন ?

আজ্জে ইংৰা, আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন, আমার জন্মে ! মেয়েটি ব্যাকুল
হয়ে হাতখানেক স'রে এলো। বললে, যাবেন না ! আরেকটু বশুন—!
তবে যে বললেন, আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন ?

আবার আমাকে বসতে হোলো। বললুম, অনুরোধ রাখবো একথা ঠিক
বলিনি !

আপনি যে কথা দিলেন তখন ?

কথা ! কই, না ?

মেয়েটি তেমনি আকুল কঠে বললে, একটি মেয়ে যদি আপনার চোখের
সামনে ছটফট করে, আপনার মনে কোনো দাগ পড়ে না ?

এবার আমি একটু হাসলুম। বললুম, তাহলে সত্য কথাই বলি। তখন
থেকে আগাগোড়া আপনার মনের কথাটা আমি ঠিক ধরতে পাচ্ছিনে।

উত্তেজনায় মেয়েটির কঠ কেপে উঠলো। বললে, চোখ দিয়ে আপনি
আমাকে দেখছেন, মন দিয়ে ত' দেখছেন না ? গুলৌর আঘাত খেয়ে রক্ত-
মাথা হরিণ মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছে। সে কি চায়—আপনি বোঝেন
না ?

বুঝি—সে মৃত্যু চায় ! কিন্তু বিকেলবেলা পাকে হাওয়া খেতে এসে
আপনার মতন হাসিখুশী মেয়ে ত' আর মরতে চায় না !

মেয়েটি বললে, কী দুর্ভাগ্য আমার ! আপনি আমার সেই চেনা লোকটি
নন, এই দুঃখ। এইজগ্নেই আমাদের প্রফেসর বলেন, পুরুষের চোখ দিয়ে
মেয়েদের মনকে জানাটা কিছুতেই সত্য হয় না !

বললুম, আপনি কি তবে মরতে চান ?

নিশ্চাস ফেলে সে বললে, ইংৰা, মরতে চাই।

উত্তপ্ত কঠে বললুম, যে-ব্যক্তি মরতে চায়, সে ত' পান চিবিয়ে লোকের
সঙ্গে আলোচনা করতে বসে না ! পাকে এসে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে
যে মেয়ে মরবার আলোচনা পাড়ে, সে মেয়ের অবিশ্ব মরাই উচিত, তবে
কিনা সে মেয়ে সহজে মরে না !



আমার তিরস্কারে সে দমলো না। বললে, কেন মরে না ?

ବଲଲୁମ, ନା, ମେ ଯରେ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ମରବାର ଭୟ ଦେଖିଯେ ମେ ଅନ୍ତେର କାହିଁ ଥେକେ ସ୍ଵବିଧା ଆଦାୟ କରେ । ତବେ ଆପନାକେ ସ୍ପଷ୍ଟଇ ବଲି, ଆମାର ପକେଟେ ଟାକାକଡ଼ି ବିଶେଷ କିଛୁ ନେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣବେଳେ ଦାମଟା ଆଛେ । ଏର ପରେଓ ଯଦି ଆପନାର କୋନୋ ବକ୍ରବ୍ୟ ଥାକେ, ତାହଲେ ପୁଲିଶକେ ଡେକେ ଏବାର ଆମାକେ ସବ କଥାଇ ପ୍ରକାଶ କରତେ ହବେ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟଇ କରିନି ଏତକ୍ଷଣ ମେଘେଟିର ଦୁଇ ଚୋଥ ବେଯେ ବରଞ୍ଚିରିଯେ ଜଳ ନେମେ ଏମେହେ । ଫୁଁପିଯେ ଫୁଁପିଯେ ମେ ଏବାର ବଲଲେ, ଆମାର ମରବାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଓ ନେଇ ବଲତେ ଚାନ ? ଆମାକେ ବାଁଚାବାର ଚେଷ୍ଟା କେଉ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମରତେ ଗେଲେ ସବାଇ ବାଧା ଦେଇ ।

ବଲଲୁମ, ଆପନାର ଆୟୁହତ୍ୟାର ସବ ପଥଇ ତ' ଖୋଲା ଆଛେ ।

ଜାନି !—ମେଘେଟି ଏଦିକ ଓଦିକ ତାକିଯେ ଚାପା କଠେ କେଂଦ୍ରେ ଫେଲଲୋ । ପୁନରାୟ ବଲଲେ, ବିଷ ଆଛେ, ଦଢ଼ି ଆଛେ, ଆର ଆଛେ ପୁକୁରେର ଜଳ, କେରୋସିନ ତେଲ, ରେଲେର ଲାଇନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକେର ତାର—କିନ୍ତୁ—କିନ୍ତୁ ଆପନି ଆମାକେ ବ'ଲେ ଦିନ କୋନୋ ଏକଟା ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଟାଯ କୋନୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ !

ଆଶେପାଶେ ଲୋକ ଚଲାଫେରା କରଛେ । ଭୟେ ଭୟେ ଆମି ଚୁପ କରଲୁମ । ଅଧୀର କାନ୍ଦା କେଂଦ୍ରେ ମେଘେଟି ଆବାର ବଲଲେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚି, ଆମାର ଜଳେ ପୁଡ଼େ ଯାଚେ ସବ,—ଆମାକେ ଦିନ ଏମନ କିଛୁ ଯାତେ ଆମାର ଦୁମ ଆର ନା ଭାଙେ, ଆମି...ଆମି କେବଳ ଚିରକାଳେର ଜଣ୍ଟେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ତେ ଚାଇ ।

ମେଘେଟି ଏମନ ଫୁଁପିଯେ ଫୁଁପିଯେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲୋ ଯେ, ହତବୁଦ୍ଧିର ମତୋ ଆମି ସ୍ତର ହୟେ ବସେ ରହିଲୁମ । ଆମାର ବାକ୍କରନ୍ତ ହୟେ ଗେଲ ।

ପିଛନ ଥେକେ ଏହି ସମୟେ ହଠାତ୍ ଏକଟା ଡାକ ଶୋନା ଗେଲ । ସଚେତନ ହୟେ ଦେଖି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଲୋ ମବେମାତ୍ର ଜଲେଛେ, ଏବଂ ଏକଟି ହିନ୍ଦୁଶାନୀ ଛୋକରା ପାର୍କେର ରେଲିଂସେ ବାଇରେ ଦୀଢ଼ିଯେ ଡାକଛେ, ଏ ଦିନି ?

ମେ ତାର ହିନ୍ଦିଭାବ୍ୟ ଜାନାଲୋ, ଦୁ' ଆନା ପାନେର ଦାମ ମେ ପାବେ । ବହୁ ଟାଇମ ମେ ପଯ୍ୟସାର ଜଣ୍ଟ ଏଥାନେ ଦୀଢ଼ିଯେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ ।

ଚୋଥ ମୁଛେ ମେଘେଟି ଏବାର ବଲଲେ, ଦେଖଚେନ ତ' ମେହି ଥେକେ କୁକୁର ଲେଗେଛେ ଆମାର ପେଚନେ ।

କୁକୁର !—ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୁମ, ତା'ର ମାନେ ?

କୁକୁର, କୁକୁର ଆମାକେ ତିଷ୍ଠିତେ ଦିଲ୍ଲେ ନା !

କିନ୍ତୁ ଆର କୋନ ଜବାବ ଦେବାର ଆଗେ ତିନ ଚାରଟି ଭାଙ୍ଗିଲୋକେର ସଜେ

একজন বৰ্ষীয়সী সন্দ্রান্ত মহিলা তাড়াতাড়ি এসে আমাদেরকে ধিরে দাঢ়িয়ে চেচামেচি ক'রে উঠলেন, এই যে এখানে...পেয়েছি...সর্বনাশী, এই তোর মনে ছিল? সারাদিন ধ'রে বাড়ীস্বক্ষ লোক পথে-পথে থোজাখুঁজি করছে...মরণ নেই তোর? ।

আমি বিমুঢ়, হতচকিত। ভদ্রলোকেরা মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করলো।

বৰ্ষীয়সী মহিলা বললেন, তুমি কে বাবা জানিনে, তবে আমার মেয়ে বোধ হয় তোমাকে পেয়ে গল্প ফেঁদেছিল! চল পোড়ারমুখী, বাড়ী চল, রাস্তাঘাটে এই কেলেঙ্কারী, তোর মরণ হ'লেই বাঁচি!

ওর মধ্যে একজন গিয়ে পানওয়ালাকে তার প্রাপ্ত্য দিয়ে দিল। তারপর জন দুই ভদ্রলোক এবং মহিলাটি মেয়েটিকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে অগ্রসর হলেন। দুমিনিটের মধ্যেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল।

একটি প্রিয়দর্শন যুবক আমার কাছে এসে দাঢ়াল। বললে, আপনাকে কোনো অপমান করেনি ত? ও আমারই বোন।

বললুম, না না, অপমান করবেন কেন? ভারি ভদ্র মেয়েটি।

ছেলেটি বললে, ওকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে ভারি মুস্কিল। গেল বছর এম-এ পাশ ক'রে ও ওই রুকম হয়ে যায়। কিছুদিন আগে রঁচী থেকে পালিয়ে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা এবার যেন আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। শুধু বললুম, আমার বিশ্বাস, স্বামীর প্রতি আপনার ভগীর একটু অভিমান আছে!

স্বামী!—ছেলেটি বললে, ওর বিয়ে হয়নি এখনও। বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাত সাতদিন আগে ওর একটুখানি পরিবর্তন দেখা গেল! ঠিক পাগল নয় কিন্ত। অত্যন্ত সামান্য, এই ধৰন, এক পাসেন্ট এদিক ওদিক। শুষ্ঠ আর পাগলের মাঝখানে এত সূক্ষ্ম তফাত যে, আমাদের নিজেদের কথা ভাবলেও ভয় করে। ওকে আপনি ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে আমি আড়ষ্ট দেহে নবকেষ্টব্যুর ডাক্তারখানার দিকে অগ্রসর হলুম। গল্পটা জমলো না, বাধা পেয়ে গেল।

শিক্ষার

ছেলেমাহুবের মনে যে-দাগ পড়ে সেই দাগ কোনওদিন যোচে না। মার
খেলেও যে-দাগ, ভালোবাসা পেলেও সেই দাগ। ও-ছটো সংমানভাবেই গাধা
থাকে।

তক্কদিদির বাঁকা চোখে থাকতো খরদৃষ্টি,—কিশোর বালক আনন্দ
নিরোগ স্বাস্থের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টি ভ'রে উঠতো ইর্ষ্যায়। আনন্দ
গা ছমছম ক'রে উঠতো ভয়ে। সে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতো এই দূর
সম্পর্কীয়া দিদির সামনে।

চিরকালের জন্য এই দাগ বসে গেছে।

তক্কদিদি জমিদারের বউ। বাপের বাড়ীটি হোলো গরীবের ঘর,—বিধবা
মা শুধু আছেন। বছরের মধ্যে তিনি চার বার তক্কদিদি তাঁর ক্ষণ এবং
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠতেন ডাঙ্গারি চিকিৎসার
জন্য। উদের মধ্যে একটি মেয়ের আবাল্য মৃগীরোগ, এবং কোলের ছেলেটির
আজন্ম পুঁয়ে রোগ। সুস্থ সন্তান ক'কে বলে, তক্কদিদি সেটি জানতেন না।
ক্লপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়া তাঁর জমিদারিতে আর সবই ছিল।

কিন্তু এই দুটি অভাবের একটি পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর নিজেরই
সর্বাঙ্গে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এবং একথা বলা চলে,—প্রত্যজ্ঞেও, ভাস্তি
ভাস্তি অলঙ্কার কম বেশী দুই সের সোনাকপোয় ভরা থাকতো, এবং রাত্রের
দিকে কোলের শিশুটি কেঁদে উঠতো বার বার তাঁর সোনার গহনার খেঁচায়।
স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক কি প্রকার, সেটি খুব স্পষ্ট নয়।

গহনার ভাবে তিনি ইঁপাতেন,—কেন না মাহুষটি হোলেন সুলাঙ্গ ও
খর্বকাঙ্গা,—আর তাই দেখে দরিদ্র পরিবারের সবাই অবাক বিশ্বে চেরে
থাকতো।

সেবার অত্যন্ত গভীর মুখে তিনি বাপের বাড়ীতে চুকেই প্রথম কঠোর
সন্তান করলেন তাঁর বিধবা ও নিক্ষণায় জননীকে,—এতটুকু বিবেচনা নেই
তোমাদের ঘটে? আমার যে চরিত্র ব্যামো, মনে নেই তোমাদের? একজন
লোক পাঠাতে পারোনি ইষ্টিশানে? বাড়ানুক আঙ্গের মাথা খেয়েছো?

মা বললেন, তেমন ত' কেউ নেই, কে যাবে মা?

কে যাবে। যরেছে বুঝি সব? আগে বললেই' পারতে! আমি না
হয় নাই আসতুম!

মান হাসি হেসে মাচুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তঙ্গদিদির এই উগ্র কঠোর
প্রথম সম্ভাষণে বাড়ীশুক সবাই হতবাক।

এবাবেও তাঁর সঙ্গে আছে সেই ঝিয়ের মেঘেটা। ওর নাম হিমি।
এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে মহলে সে খুব পরিচিত। মেঘেটা তঙ্গদিদির দু'চোখের
বিষ হলেও বার বার সঙ্গে আসে, এবং তারই জন্য তঙ্গদিদির অবস্থানকালটি
বেশ সরগরম থাকে। হিমি হোলো ওঁদেরই গাঁয়ের এক প্রজার মেয়ে, বছর
এগারো বারো বয়স, এবং অতিশয় স্বাস্থ্যবতী। বস্ততঃ, ওর স্বাস্থ্যের কাঠিণ্ঠই
হোলো ওর যেন অপরাধ। হিমি এসে পৌছলেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে
মিলে যায়, এবং তঙ্গদিদি কুকু বিদ্বেষে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেঘেটা বিশেষ
কারো অপ্রিয় ছিল না।

তঙ্গদিদির ছেলেমেয়েদের চেহারায় জমিদার গোষ্ঠি-স্বলভ কোনও ছাপ
নেই। সবগুলিই কুফবর্ণ কঙ্কাল ও হতশ্রী। প্রথমেই খাবার জন্য তারা
বাহানা ধয়লো,—কেউ শুয়ে পড়লো আনাগোনাৰ পথে, কেউ ঢুকলো রান্না-
ভাঁড়াৰ ঘরে, কেউবা নোংৱা ক'রে বসলো একেবারে সকলেৰ মাৰখানে।
কিন্তু সেই হটগোলেৰ মধ্যে প্রথমেই ছুটে এসে তঙ্গদিদি হিমিৰ গালে ঠাস
ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন,—হারামজাদি, দাড়িয়ে দাড়িয়ে মজা দেখছিস্?
ওদেৱ সামলাতে পারিসনে?

আন্দু ব'লে উঠলো, ওর কোনো দোষে নেই তঙ্গদিদি!

থাম, ছোট মুখে বড় কথা ক'সনে! তঙ্গদিদি কঠোর কষ্টে এক ইাক
দিলেন। আন্দু কাঁচুমাচু হয়ে সেখান থেকে স'রে গেল।

মেঘেটাই যে কেবল বিনা দোষে মার খেলে তাই নয়, ওই চপেটাঘাত
পড়লো সমস্ত বাড়ীখানারই গালে,—অন্ততঃ ওর প্রতিধ্বনি সেই কথাটাই
প্রকাশ কৱলো; সেই কাৱণে হিমিৰ উপরে এই নির্বিচাৰ লাঙ্গনাটা সবাই
যেন একটি মুহূৰ্তে নিজেদেৱ মধ্যেই ভাগ ক'রে নিল।

হিমি কিন্তু একটু অন্য ধৰণেৱ। মার খেলে সে জ্ঞাপ কৱে না এতটুকু।
বিড়ালকে মারলে বিড়াল স'রে যায় বটে, কিন্তু নিজেৱ হাতে লাগে। হিমিৰ
দেহ পাথৰেৱ মতো শক্ত আৱ নীৱেট। এৱ আগে দেখতে পা ওবা গেছে
ঠাণ্ডাৰ বৰ্ষাৰ ওৱ কিছু হয় না। অবস্থেই মেঘেটা স্বস্ত থাকে। আধ সেৱ

চালের পাঞ্জাভাত খায় এক খাবল নূন আর তেঁতুল দিয়ে। যেখানে সেখানে প'ড়ে লোহার মতো ঘুমোয়। ডাকলে বরং পাড়ার লোক আগে কিন্তু তার ঘূম ভাঙ্গে না।

মনিবের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে তৃষ্ণ রাখাই ভৃত্যের কর্তব্য,—কিন্তু হিমি ছিল অন্তরকম, এটি তফদিদি অনুভব করতেন। তার মনে হোতো হিমি তাকে গ্রাহ করে না। রাগও ছিল সেইখানে।

কোলের ছেলেটার পুঁয়ে রোগ, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা ছিল শিবেরও অসাধ্য। কিন্তু ওই কাজটিই ছিল হিমির। আড়াল থেকে আদু সকৌতুকে দেখতো, কাঁচুনে ছেলেটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে হিমি তাকে কাঁচাচ্ছে আরো বেশী, এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটাকে টিপে টিপে দু'এক ঘা বসিয়ে দিচ্ছে, আবার চেঁচালেও মুখ টিপে ধরছে। একসময় ছুটতে ছুটতে আসেন তফদিদি। চীৎকার ক'রে বলেন, আমাকে ভাত তুলতে দিবিনে মুখে? কেন তুই ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারিসনে? বদমাই নচার—।

হিমি গোঁজ গোঁজ ক'রে বলে, অত কাঁচলে আমি কি করবো?

ফের আমার মুখের ওপর কথা?—তৎক্ষণাত তফদিদি রাগে অঙ্ক হয়ে ঘান এবং পলকের মধ্যে একপাটি জুতো এনে হিমির পিঠে সজোরে বসিয়ে দেন।

হিমি একটু নড়ে না, কাঠের মতো ব'সে থাকে। ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আদু গাঢ়াকা দিয়ে চ'লে যায়।

তফদিদির উচ্চকর্ত্তার দাপটে বাড়ীশুল্ক সবাই তটসৃষ্টি।

ওরই মধ্যে হিমি আবার একটু খামখেয়ালীও বটে। কাজ করে যখন, তখন সে অক্লান্ত। বাজার করে, ওষুধ আনে, নোংরা কাঁথা কাচে, বাসন মাজে, এঁটো পাড়ে, জল তোলে, রান্নাবান্নার জোগাড় দেয়, ঘর-দোর ঝাঁটায় কিন্তু তার মেজাজ যদি ভালো না থাকে, তাহলে সেদিন আর রক্ষা নেই। বাজার থেকে পচা মাছ কিনে আনবে, ওষুধের শিশি ভেঙে আসবে, বাসন-পত্র ফেলবে বনবনিয়ে, জলের বালৃতি কাঁৎ করবে শোবার ঘরে, রান্নাঘরে এঁটোকাটা ফেলে রাখবে, —সেদিন ওকে দিয়ে আর কোনও কাজ করাবার উপায় থাকবে না। ছোট ছেলেটা যদি সেদিন কেঁদে কেঁদে ককিয়েও থায়, হিমি ভ্রক্ষেপও করবে না, বরং নিজে এক সময় ছাদের চিলেকোঠার গিরে চুপটি ক'রে বসে থাকবে। আর নম্বত সেদিন এমন ঘূম ঘুমোবে বে, একে-

বাবে পাথরের ডেলা। সকালের দিকে শোবে, বিকেলেও তার ঘুম ভাসবে না।

কিন্তু আশ্চিৎ-অনাথা ঝিয়ের এই স্পর্ধা তঙ্গদিদি বরদাস্ত করবেন, তেমন মাহুষ তিনি নন। কাঠের চেলা নিয়ে তিনি একসময়ে উঠে যেতেন সেই চিলেকোঠায় এবং কোনও বিচার বিবেচনা ক'রে দেখার আগেই তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেঘেটাকে সায়েস্তা করতে আরম্ভ করতেন। হিমি অনড় হয়ে মার খেতো।

আন্দু চুপ ক'রে একান্তে দাঢ়িয়ে থাকতো। আশ্চর্য, এত মারধর, কিন্তু মেঘেটা কোনওদিন কাঁদলো না। লোহার মতো কঠিন নিশ্চল হয়ে থাকতো, আর পিঠের ওপর দিয়ে গাছপাথর চ'লে যেতো। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে তঙ্গদিদির ত্রিসীমানা থেকে দূরে দাঢ়িয়ে লক্ষ্য করতো অন্ত আঞ্চোশে তঙ্গদিদির চোখ ছুটো দপদপ ক'রে জলছে। অমনি এক উভ্রেজনার কালে একদিন অন্দু প'ড়ে গিয়েছিল তঙ্গদিদির মুখোমুখি। তঙ্গদিদি কেমন এক-প্রকার তৌত্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটিকে প্রশ্ন করলেন, তোর অস্ত্র করে না কেন? কি খান তুই? কি জন্তে ভালো থাকিস?

স্বস্তি থাকাটাই যেন অপমানজনক। ভয় পেয়ে থতিয়ে মুখখানা লুকিয়ে আন্দু সেখান থেকে স'রে গেল।

রোষে ক্ষেত্রে উভ্রেজনায় তঙ্গদিদি ফোস ফোস ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে আবাল্য ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। একটি মেয়ের মৃগীরোগ—কথায় কথায় সে বেঁবেচুরে যাও। পরের ছেলেটি জ্বর আর আমাশয়ে শয্যাগত। শাস্তি ছিল না তাঁর। অথচ কৌ পরিমাণ অলঙ্কার তাঁর সর্বাঙ্গে! তঙ্গদিদির ওই কুকু চলাফেরার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গের গহনাগুলি ঝমর-ঝমর ক'রে বেজে ওঠে। গহনাগাঁটি খুলে রাখা জমীদারের স্তৰীর পক্ষে নাকি সম্মানজনক নয়। তাঁরা পুরদেশের মতো জমীদার।

মাঝরাত্রে সহসা একদিন চীৎকার ক'রে উঠলেন তঙ্গদিদি। রাত তখন বোধ হয় বারোটা। মা এলেন ছুটে, বুড়ো দাদুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য। তঙ্গদিদির মাথা ধরেছিল সন্ধ্যাবেলা থেকে। হিমির ওপর ছক্ষু হয়েছিল, সে মাথার কাছে ব'সে তঙ্গদিদির মাথা টিপে দেবে। ছেলে-মাহুষ যেয়ে, মাথা টিপতে টিপতে এক সময় তজ্জ্বার চুলে পড়েছে। তঙ্গদিদি তৎক্ষণাত বাঘিনীর মতো উঠে দাঢ়ান এবং সেই অস্ককারে হিমির শরীরের

কোখায় যেন কিভাবে আঘাত করেন, মেঝেটা নিজের পের্টটা ছুই হাতে চেপে শুমের ঘোরে এক প্রকার আর্ডনাস করতে থাকে। টেচামেচিতে সবাই ছুটে এলো। তঙ্গদিদি তারই ওপর হিমিকে এর মধ্যে দু'বা বসিয়ে দিবেছেন। তঙ্গদিদির মা মেঝেটাকে টানতে টানতে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আন্দু ঠাহর ক'রে দেখলো, হিমি মুখের আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু চোখে তার এক ফেঁটাও জন নেই। আশ্চর্য, মেঝেটাকে কোনমতেই কাঁদানো যায় না! কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য সে রাত্রে সবাই মিলে তঙ্গদিদিরই সেবা করতে লাগলো।

একদিন হিমি আবার এক অপার্ট ক'রে বসলো। তঙ্গদিদির নতুন পচন্দসহ শাড়ীখানা কাচতে গিয়ে বালতির খোচায় ছিঁড়ে ফালা দিয়ে শুকোতে দিল। ঘটনাটা তখন ঠিক টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিকেলে গাধুয়ে এসে শাড়ীখানা জড়াতে গিয়ে তঙ্গদিদি একেবারে শিউরে উঠলেন। একাজ হিমি ছাড়া আর ক'রো নয়। তিনি বললেন, দাঢ়া, এবার তোর তেজ আগি ঘোচাবো।

বাড়ীস্থ থরহরিকস্প। কিন্তু বিশ্বায়ের কথা এই, হিমির কোনও গ্রাহণ নেই। একটি বালিকার জীবনে মারপিট যেন স'য়ে গেছে,—ওটাকে অনিবার্য ব'লে জীবনের সঙ্গে সে মিলিয়ে নিয়েছে। কোনও লাঙ্গনাতেই তার ভয় অথবা উদ্বেগ—কোনটাই নেই।

একটি ছোট স্বস্থ ও সবল মেয়ের ‘তেজ ঘোচাবার’ জন্য সকলের বড় অস্ত্র হোলো, তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে রাখা। তঙ্গদিদি সেই ব্যবস্থাই করলেন। তাঁর ছক্ষু এ বাড়ীতে অলজ্যনীয়। সেইদিনই সক্ষ্যাতেকে হিমির আহারাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হোলো। শুধু তাই নয়। সেই শীতের সক্ষ্যায় নিজে এসে তঙ্গদিদি হিমির কাঁধাকুঠি নিয়ে চ'লে গেলেন। তিনি নামজাদা জমিদারের স্ত্রী,—অবাধ্য এবং দুঃশীল প্রজাকে কেমন ক'রে সারেন্টা করতে হয়, তাঁর জানা আছে বৈকি। তাঁর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হিমি এলো, এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি ক'রে দেখলো তার বিছানার পুঁটিলিটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। দেখে শুনে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে স্টান গিরে দাঢ়ালো তঙ্গদিদির সামনে। বললে, আমার বিছানা কই?

তঙ্গদিদি চুপ। তিনি মেদিন কিছু অস্থ, তাঁর হাতের অবস্থা মেদিন ভালো ছিল না। উত্তেজনা ঘটলে অস্থ বাড়তে পারে।

হিমি পুনরায় বললে, আমি বুঝি আজ থেকে থাবো না কিছু? সবাই
থাবে, আর আমি থাবো না কি জগ্নে?

তরুদিদির পক্ষ থেকে কোনও জবাব নেই।—

হিমি বললে, বেশ, আমিও ব'লে রাখলুম, থেতে না দিলে আমিও কোন
কাজ করতে পারবো না।

হিমি চ'লে গেল। লেপ ঢাকা দিয়ে তরুদিদি নিঃশব্দে পড়ে রাইলেন।

ছুটিন পরে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই মনে হচ্ছিল। এক কাসি ভাতের
কম ঘে-মেয়ের পেট ভরে না, তার সম্পূর্ণ উপবাস চলছে। হিমি থাচ্ছে না
একবারও, সেদিকে তার চেষ্টাও নেই। সে ছটফট করবে, পায়ে ধ'রে কাঁদবে,
এবং তার বদলে তাকে আরও উৎপীড়ন করা হবে—এই ছিল প্রত্যাশা।
কিন্তু হিমি সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ, তার অক্ষেপও নেই কোনওদিকে। ডাকলে সে
কাছে আসে না, এবং—বিশ্বয়ের কথা—থাচ্ছের প্রতি তার কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও
দেখা যায় না। বাড়ীর সবাই ওই মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দিকে আড়ষ্ট হয়ে
চেয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত মেয়েটার চেহারা মনে ক'রে ক'রো ক'রো মুখে অন্ধক
রোচে না। কিন্তু তরুদিদির সেদিকে এতটুকু গ্রাহ নেই। তাঁরও জিদ বেড়ে
গেছে। তিনি এবার ওই অবাধ্য মেয়েটার সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত চান।
দেখা যাচ্ছে তাঁর হাতের ব্যামোর কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেমন যেন
একপ্রকার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেন, এবং কৃগ ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে
তিনি গোয়েন্দাৰ মতো এদিক ওদিক ছোক ছোক ক'রে ঘুরে আসেন, কথামু
কথায় সকলকে সাবধান ক'রে দেন কঠিন কঠৈ—থবরদার, কেউ ওকে থেতে
দেবে না! আমি এর শোধ তুলবো।

দিন চারেক হ'তে চললো, হিমির মুখে অন্ধজল নেই। অবাক ক'রে দিল
মেয়েটা সকলকে। সে পরম নিশ্চিন্তে একপাশে প'ড়ে থাকে, এবং আহারাদি
সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। পরনের সেই নয়হাতি ধূতিখানার এক প্রান্ত
মেঝের উপর বিছিয়ে রাখে সে অকাতরে ঘুমোয়। তরুদিদির মনে পরাজয়-
বোধ জেগে উঠে। তিনি চান কেউ ওকে গোপনে থেতে দিক, এবং তিনি
আহত সর্পের মতো তাকে ছোবল মারুন। কিন্তু এমন ভুল কেউ করে না।
তরুদিদি, তখন দাতের উপর দাত ঘষতে ঘষতে রাখের দিকে এক একবার
হিমিকে পাহারা দিয়ে আসেন। দেখা যায়, হিমি পরম নিশ্চিন্তে ঘিয়েছে।

তা'র নিটোল কঠিন দেহের কোথাও অনশনের ক্ষমতা নেই।—বলিষ্ঠকায়া আহ্বয়ানতা কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে তক্কদিদির দৃষ্টি হিংস্র চক্ৰ সপনগ ক'রে যেন অঙ্গকারে জলতে থাকে। অতঃপর আপন বিবাহ দীর্ঘবাস চেপে তিনি ফিরে এসে লেপের মধ্যে ঢোকেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চীৎকার ক'রে সারারাত সবাইকে গালি দিতে পারলে হয়ত তিনি কড়কটা অস্তিবেষ্ট করতেন।

সেই নিঃসাড় এবং নিষ্ঠক গভীর রাত্রে ও মহলের বিছানার ভিতর থেকে আন্দু এবার আন্তে আন্তে মাথা তুলে তাকায়। না, কেউ কোথাও জেগে নেই। শেষবারের মতো টহল নিয়ে তক্কদিদি নিজের ঘরে গিয়ে দৱজা বক করেছেন, আর তিনি উঠবেন না।

আন্দু পা টিপে-টিপে ওঠে। তারপর কুলুঙ্গী থেকে একটি কাগজের বাল্ল নিয়ে চলে যায় দালান পেরিয়ে সেই ছোট ছাদের পাশে। সন্তর্পণে গিয়ে হেঁট হয়ে হিমির কানে কানে সে ডাকে। হিমি জেগেই থাকে আগের থেকে। আন্দু চাপা গলায় বলে, বাঞ্ছের মধ্যে ভাত-চচড়ি আছে। চৌবাঞ্ছা থেকে জল থেঁয়ে নিস।

তেমনি পা টিপে-টিপে আন্দু নিঃসাড়ে পালায়। মেয়েটা খাবার আগে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসে।

পিঞ্জালয়ে তক্কদিদির বসবাস এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে আসতো। সকলের অশ্রুকা কুড়োতেন তিনি, সকলকে পরোক্ষভাবে অপমানণ করতেন। যারা তাঁর পায়ের তলায় দলিত হोতো, তাদেরই কাছে তিনি পূজা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর ঘুণার পাত্র ছিল সবাই। তিনি নিজে ছিলেন যেহেতু খৰকায় ও সুলাঙ্গ, সেজন্ত কারো মাথা উচু হোক—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আন্দুকে কাছাকাছি দেখলে তিনি চাপা উভেজনায় ফুলে উঠতেন।

তাঁর যাবার আগের দিন হিমি আবার একটা ভৈষণ অপরাধ ক'রে বসলো। বোধ হয় মাসীমাই কাপড় শুকেতে দেবার জন্তু ছাদে উঠছিলেন। সিঁড়ির ঘরের পাশে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন, খেজুর গুড়ের একটি নাগরির মধ্যে হাত চুকিয়ে হিমি গোপনে টাউ টাউ ক'রে গুড় খাচ্ছে। প্রাক্ত আধখানা নাগরি সে তখন শেষ ক'রে এনেছে।

খবরটা মাসীমা কোনমতেই চাপতে পারলেন না। উঠে পালাতে গিয়ে হিমি সিঁড়ির উপরেই ছড়মুড়িয়ে প'ড়ে গেল কাপড়ে বেধে। খবর পেয়ে

তঙ্গদিদি ছুটে এলেন। তাঁর বি চুরি ক'রে থাছিল, এত' তাঁরই পক্ষে অপমান! ক্রতপদে তিনি ভাঙ্গার ঘরে টুকে একখানা বাঁটি নিয়ে ছুটে এলেন। অমন মেয়েকে আজি তিনি কেটেই ফেলবেন। অনেকের ধারণা, সবাই মিলে তঙ্গদিদির হাত থেকে বাঁটিখানা সময় মতো সেদিন কেড়ে না নিলে তিনি মেয়েটাকে সত্যিই হয়ত কেটে ফেলতেন। তাঁরা বড় জমিদার,—বছরে দশ-বিশটে দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলা। তাঁদের নামে আলীপুর কোটে ঝুলেই থাকে। ওর ওপর না হয় আর একটা বাড়তো,—এই যা। কিন্তু বাঁটিখানা হাত থেকে কেড়ে নিলেও তঙ্গদিদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কারও উপায় ছিল না। তিনি উচ্চকষ্টে একবার ইঁক দিলেন, সবাই সামনে থেকে ন'রে যাও বলছি। ও আমার বি, আমার ভাত-কাপড়ে মানুষ, ওর ব্যবস্থা আমার হাতে। তোমাদের কোনও এক্সিয়ার নেই।—বলতে বলতে তিনি একগাছা বাঁকারি নিয়ে এলেন।

সিঁড়িতে প'ড়ে গিয়ে হিমির বেশ চোট লেগেছিল। ইঁট বেটে গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে। স্মৃতরাং ওই সিঁড়ি থেকে মেরেটা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁরই ওপর যখন সপাসপ বাঁকারির ঘা পড়তে লাগলো,—অদূরে দাঢ়িয়ে আন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো আর্ত কান্নার আওয়াজ। দাতের উপর দাত রেখে হিমি ব'সে আছে মাথা নীচু ক'রে,—পিঠে আর মাথার আর পায়ে পড়ছে বাঁকারির ঘা। রক্ত ফেটে পড়ছে তা'র চামড়া দিয়ে।

কিন্তু কেবল হিমিই মার থাচ্ছে না,—মার থাচ্ছে আন্দুও। সংসারে এক একটি প্রাণী এমন জন্মায়। মার থার একজন মুখ বুজে, আঘাত থেরে কাঁদে অস্তজন। আন্দু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে,—তঙ্গদিদি রোষকষায়িত চক্ষে তা'র দিকে তাকান।

এতদিন পরে তঙ্গদিদির মা এবার টেচিরে ওঠেন,—ও ছাড়া তুই কি আর বি খুঁজে পাসনি তক? এবার যখন আসবি, ওকে যেন আর এ বাড়ীতে আনিস্বনে। মরণ হ'লেই মেয়েটার মুক্তি হয়!

তঙ্গদিদির মা কেঁদে ফেললেন। হিমির মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

কিন্তু কানাকাটি সবই মিথ্যে হোলো। একটি দিনের মধ্যেই হিমি দিব্য গা-বাড়া দিয়ে উঠলো। গায়ে পিঠে তাঁর দড়া দড়া দাগ, ইঁটুর কাছে কালশিরে,

বাবাৰিৰ ঘাঁঘে কপাল ফোলা,—কিন্তু সে স্থৰ। লোহা পুড়ে পুড়ে ইস্পাতে
পরিণত হয়েছে।

ঘাবাৱ সময় জিনিসপত্ৰ গুছিয়ে নিয়ে সকলেৰ সঙ্গে হিমি গাড়ীতে গিয়ে
উঠলো হাসিমুখে। গাড়ী ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে তা'ৰ পথেৱ দিকে আন্দু
চেয়ে রাইলো।

এৱপৰ তক্ষদিনি বাপেৱ বাড়ীতে এসেছেন অনেকবাৱ। বছৰেৱ পৰ
বছৰ। কিন্তু হিমি আৱ একটিবাৱও আসেনি সঙ্গে। সে গ্ৰামেৱ মেয়ে।
গ্ৰাম থেকেই মাঘৰে সঙ্গে দেন কোথায় ভেসে গেছে। তা'ৰ জন্য তক্ষদিনিৰ
কোনও উষ্বেগ নেই। হিমিকে ভুলে গেছে সবাই।

অনেক বছৰ চ'লে গেছে তাৱপৰ।—

সে-বাড়ী বিক্ৰি হয়ে গেছে। মাসিমা মাৰা গেছেন অনেক কাল আগে।
তক্ষদিনিৰ আৱ কোনও খোজ থবৱ পাওয়া যায় না। ছড়িয়ে পড়েছে
সবাই নানাদিকে।

আন্দু হয়েছে এখন আনন্দমোহন। বিয়ে ক'ৰে সে ঘৰসংসাৱ পেতেছে
অন্তৰ। সে এখন ইলেকট্ৰিক অফিসে চাকুৱি কৰে। কোটপ্যান্ট প'ৱে
একখানা খাতা হাতে নিয়ে সে পাড়ায়-পাড়ায় লোকেৱ বাড়ীৰ বেন-ইলেকট্ৰিক
মীটাৰ প'ড়ে খাতায় টুকে নেয়। সাইকেল চ'ড়ে তা'কে আনাগোনা কৰতে হয়।

মাৰে মাৰে তাকে যেতে হয় অনেক অলিগলিতে। হয়ত বা অনেক
নোংৱা পল্লীৰ মেয়েছেলেৰ সমাজে। ইতৱ-ভদ্ৰ মানতে গেলে অফিসেৰ কাজ
চলে না। তবে কিনা কাজ হোলো তা'ৰ মাত্ৰ দুমিনিটেৰ। মিটাৱেৱ নথৱ
মেলানো, আৱ কাৰেণ্ট থৱচেৱ পৱিমাণ পাঠ ক'ৰে খাতায় টুকে নেওয়া,—
ব্যস, ছুটি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু দুমিনিটে ছুটি পাওয়া গেল না। পিছনে দাঢ়িয়ে
একটি মেঁয়েছেলে প্ৰশ্ন কৱলো, কত উঠলো এবাৱ ?

খাতায় টুকতে টুকতে আনন্দমোহন জবাৰ দিল, আশি ইউনিট।

কথাটা শুনেও স্বীলোকটি দাঢ়িয়ে রাইলো। আনন্দমোহনেৱ সময় কম,
এখনও বছ বাড়ী বাকি। খাতা বছ ক'ৰে সাইকেলখানাৰ দিকে হাত
বাড়াবাৱ সময় স্বীলোকটিৰ দিকে তা'ৰ এবাৱ চোখ পড়লো। সে একটু
খতিয়ে গেল। স্বীলোকটিৰ মুখে মধুৰ হাসি, দুই কানে হীৱেৱ ফুল, গলায়
অড়োয়া হাৱ। যৌবনেৱ লাবণ্য ঠিকৱে পড়ছে !

চেনো ?

আনন্দমোহন তোক গিলে বললে, হিমি না ?

না,—হেমাঞ্জিনী ! চিনতে পেরেছ দেখছি ! বোল আঠারো বছর হ'জে চললো না ?

ইঁয়া, তা হবে বৈ কি । কতকালের কথা ।—আনন্দমোহন ভদ্রকষ্টে জবাব দিয়ে একবার সাইকেলখানার দিকে তাকালো ।

তোমার সেই তরুণদিনের কি খবর ? সেই জমিদারের বউ ?

আছেন তিনি এক ব্রক্ষম ! দেশেই আছেন ! তবে আমার ভগ্নিপতিতি মারা গেছেন বছর কয়েক হোলো ।

হেমাঞ্জিনী একটু হাসলো । তারপর বললে, আমাকে উপোষ করিষ্যে রাখতো, আর তুমি ভাত চুরি ক'রে অর্ধেক রাতে আমাকে খাওয়াতে,—মনে পড়ে ?

কাষ্ট হাসি হেসে আনন্দ জবাব দেয়, ইঁয়া, ইঁয়া, কত ছেলেমাছুবিই করা গেছে !—আচ্ছা, এগারোটা বেজে গেল, এবার যাই !

ও কি কথা !—হেমাঞ্জিনী বললে, এতকাল পরে দেখা, সেই ভাতের দাম শুধবো বৈকি !

আনন্দ মুখ তুলে তাকালো ।—বিলক্ষণ ! গেসব পুরনো কান্দি ! সেসব কি আর মনে করতে আছে ? এবার আমি যাই । বেশ ত, অন্ত সময়ে আবার দেখা হবে ।

কঠিন হাসি হেসে হেমাঞ্জিনী বললে, না গো না, দেখা যখন পেয়েছি, সে-দেনা এখনই শোধ করবো । ভেতরে এসো ।—বলতে বলতে হঠাৎ আনন্দের হাত থেকে খাতাখানা সে কেড়ে নিয়ে পুনরায় বললে, ঘরে না এলে এ খাতা এখনই ছিঁড়ে ফেলবো ।

আনন্দ বললে, এমন করলে আমার চাকরি যাবে, তা জানো :

যাক, আমি তোমার এ পাড়ায় ভালো চাকরি দেবো । আমাকে দেখিয়ে অনেক রোজগার করতে পারবে ।

আনন্দ বললে, একজনের উপর রাগ আছে তোমার অনেক কাল আগে, তাই ব'লে আমাকে এসব অপমানের কথা বলছ কেন ?

অপমান ? হেমাঞ্জিনী হেসে বললে, ঠিক জানো এটা অপমান ? যদি বলি এটা ভালোবাসা ?

কিন্তু আনন্দকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঝপ ক'রে তা'র
একখানা হাত ধ'রে হেমাঙ্গিনী তাকে উঠোন থেকে ঘরে তুলে আনলো।

অদূরে কয়েকটি মেয়েছেলে জোট পাকিয়ে বসেছিল, এবার খিলখিলিয়ে
বললে, দেখো ! দিনহৃপুরে মাগির কাও দেখো ।

ভিতরে এসে আনন্দ প্রতিবাদ জানালো,—আরে, আরে, শোনো,
বারেটার মধ্যে আমাকে আপিসে পৌছতে হবে। আঃ কি হচ্ছে এসব ?
সাইকেলখানা বাইরে পড়ে,—চুরি যেতে পারে। ছাড়ো, ছাড়ো—

হেমাঙ্গিনী উন্নসিত কর্ষে বললে, সাইকেল গেলে আমাকে আবার
সাইকেল কিনে দেবো ! কিন্তু তুমি হায়ালে আর যে তোমাকে পাবো না !

আনন্দ বললে, তোমার মতলব কি ? তুমি যা ভাবছো আমি তা নই ।
সরো, যেতে দাও আগাকে ।

কোনও কথায় কান না দিয়ে হেমাঙ্গিনী ভিতর থেকে ঘরের দরজাটা বক্স
ক'রে দিল। তারপর ফিরে দাঢ়িয়ে বললে, যাবে বৈকি, তুমি কি আর
থাকতে এসেছ ? তবে ঘণ্টাখানেক বাদে যাবে ।

আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না !

খিলখিল ক'রে হেমাঙ্গিনী হেসে উঠলো,—লাগবে, একটু সবুর করো,—
চোখ বুজে আসবে ভালো লেগে ! আগে পুতুলটিকে স্যঙ্গে কাছে নিয়ে
কলঙ্কের কালি মাথাই,—দেখবে তখন, দরজা খুলতে আর মন উঠবে না !

বাঘিনী আজ যেন তা'র শিকারকে ধরেছে। তা'র কঠিন কামড়ের
থেকে পালাবার পথ ছিল না। সেই আবছায়াময় ঘরের গুমোটের মধ্যে
হেমাঙ্গিনীর হিংস্র দুই চক্ষু দপদপ ক'রে জলছিল,—ঠিক যেমন জলতো ডফ-
দিদির দুই চক্ষু। দুই নারীর মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র এতকাল
ধ'রে থেকে আছে, সেই কথা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে আনন্দ যেন খেই হারিয়ে
ফেলছিল।

বিশ্বসংসারের বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে ততক্ষণে। শিকারটা প্রায় মৃত।
ক্ষিপ্তোন্নত জন্মটা ধীরে ধীরে হৎপিণ্ডের রক্তালোল-জিহ্বাগ্রে লেহন করছিল।
ঘরময় তখন ঘুরছে যেন একটা সুদূর মৃদুকষ্ঠের জড়িত প্রলাপ : কাপুরুষ !
মার খেতুম নেড়িকুকুরের মতন, দূরে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে তোমরা দেখতে !
আজ বিষ নিয়ে যাও, ব্যাধি নিয়ে যাও,—ছারখার হোক তোমাদের পরিবার !

আনন্দের মৃত্যু ঘটে গেছে !

বাসনা

শীতের রাত্ কিনা, প্রাইফরমে লোকজন ছিল কম। আরে ভাই শোনো, প্রাইফরমে নেমেই আমি গুৰু পেয়েছি, দু'জন গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে। সবচেয়ে ছুঁচো গোয়েন্দা হোলো বাঙালী—সব চেয়ে সাংঘাতিক। মহীশূরে যাও বাঙালী গোয়েন্দা, কাশীরে যাও গোয়েন্দাৰ কৰ্তা হোলো বাঙালী। ভালো কাজেও যেমন, তেমনি সবচেয়ে নোংৱা কাজে বাঙালীৰ খ্যাতিও সবচেয়ে বেশী।

তারপর? রঞ্জিত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো।

হেমন্ত চলতে চলতে বললে, শোনো। রাত তখন প্রায় নটা হবে—এখন সাড়ে বারোটা। আমি আৱ কি কৱি, পৱেৱ ট্ৰেনেৱ দেৱী তখন প্রায় দুষটা। ওয়েটিং রুমেৱ অক্ষকাৰে এক বেঁকে গিয়ে শুলুম, অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় দুদিন পেটে কিছু পড়েনি। তিনশো মাইলেৱ মধ্যে অন্ততঃ বা'ৱ দশেক গাড়ী বদল কৱেছি। শুম এসেছে এবাৱ, কিন্তু কী মশা ভাই, চোখ বুজবাৱ জো নেই। রিভলভাৱটা সংগে রয়েছে, ডাকাতিৱ টাকাও কিছু ছিল। ভাবছিলুম, শোন-ডাই-ব্যাক্সেৱ খোটা পুলিশ দাবোগাটা আমাৰ গুলী থেয়ে এতক্ষণ হয়ত মাৰাই গিয়ে থাকবে। এই নিয়ে গোটা পাঁচেক হোলো!

বাজাৱেৱ ব্লাস্টাটা পেৱিয়ে দুজনে সকল একটা গলিৱ মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। নোংৱা দুর্গন্ধয় নালী একদিকে, অন্যদিকে খোলাৰ খাপৰাঘৰ সাবি বেঁধে চলেছে। রঞ্জিত পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

শোনো, শৈয়ে আছি চুপচাপ গাড়ীৰ অপেক্ষায়—গাড়ীৰ অনেক দেৱী, এমন সময়ে দু'জনেৱ এক বেটো রুমেৱ মধ্যে এসে দাঢ়ালো। রিভলভাৱটা একবাৱ ছুঁয়ে ভাবলুম, দিই বেটাকে ঝেড়ে একহাত। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে মিষ্টি গলাম বললে, আপনি কোথায় যাবেন, শুব?—বললুম, শুশুৰবাড়ী। অৰ্ধাৎ কলকাতাৰ। আপনি কে? বললে, আমি টিকিট চেকাৱ। আপনাৰ টিকিটখানা একটু দেখান। কোথেকে আসছেন শুব আপনি? বললুম, টিকিট পৱে দেখাচ্ছি—আছা, আমাকে পুরি-মেঠাই থাওয়াতে পারেন?

কী উৎসাহ লোকটাৰ, আমাকে ঝাবে ধৱাতে পারলৈই ত চাকৱিৱ

উল্লতি ! বললে, পারি বৈ কি—না না. আপনি ভদ্রলোক, খেতে চেষ্টেছেন,
বিলক্ষণ, পয়সা দেবেন কেন ? আমিই এনে দিছি !—লোকটা ছুটলো ।

রঞ্জিত চাপা গলায় অধীর প্রশ্ন করলো, তারপর ?

হৃষ্টা আৱ কতুকু ? থাবাৱ এনে দিয়েছে—থাছি মজা ক'ৰে, এমন
সময় ট্ৰেন এসে পড়লো । আমাৱ মতলব ঠিকই ছিল । গাড়ীখানা কলকাতা
ষাবে, দাঢ়ালো অনেকক্ষণ । ওৱা ভেবে নিয়েছে আমি গাড়ী ধৰবো না ।
স্বতৰাং পৱিপাটি ক'ৰে খেঘে হাত ধুয়ে পান চিবিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি,—
এমন সময় গাড়ী ছাড়লো । গাড়ীতে স্পীড, দিছে—দিছে—দিছে—প্রায়
স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাই, এমন সময় হঠাত উঠে আমি ছুটতে ছুটতে একখানা
থার্ডক্লাস কামৰাব হাতল ধ'ৰে বাগিয়ে উঠে পড়েছি । আমি জানি, ওৱা
পৱের স্টেশনে টেলিফোন কৰবে, স্বতৰাং বুৰতেহ পাছ,—প্রাণেৰ দায়ে
কিছুদুৰ গিয়ে চলন্ত ট্ৰেন থেকে আবাৱ আমাকে লাফিয়ে পড়তে হোলো ।
মাইল তিমেক ইটতে ইটতে তোমাৱ বাড়ীতে গিয়ে পৌছলুম । একটা
স্বিধে এই পেলুম, থার্ড ক্লাস যাত্ৰীৱা তখন মুড়ি দিয়ে অগাধে শুমোছে ।

রঞ্জিত এক জায়গায় এনে থামলো । সামনে মেটে চালাঘৰেৱ ছোট
দৱজা । রঞ্জিত অতি সন্তুষ্ণে খুটখুটি ক'ৰে দৱজায় তিনবাৱ টোকা দিল,
তাৱপৰ বললে, এ ছাড়া তোমাকে আৱ কোথাও জায়গা দিতে পাৱবোনা হে,
—অবিশ্বিএটা ভালো জায়গা নয় । তবু এখানে দিন দুই চাৱ ভালোই বিশ্বাম
নিতে পাৱবে । পুলিশেৰ চোখ এখনো এখনো পড়েনি ।

রঞ্জিত আৱ একবাৱ দৱজায় শব্দ কৰলো । পৱে বললে, আমাৱ কাছে
তোমাৱ বিপদ ঘটলৈ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে আমি মুখ দেখাতে পাৱবো না,—
দেশশুল্ক আমাকে ছি ছি কৰবে । তুমি যে আবাৱ দলেৱ পাও কিনা !

যথাৱীতি ধৌৱে ধৌৱেই দৱজাটা এবাৱ খুললো । ভিতৱ্বেৰ কেৱোসিনেৱ
ডিবেৱ স্তৰিত আলোয় একটি স্বীলোককে দেখে রঞ্জিত বললে, কেউ আছে ?

মেঘেটি চাপা গলায় বললে, আছে দু'জন ।

ষাবে এক্ষুণি ?

হাসিমুখে মেঘেটি বললে, কাঁচা বদেস, সহজে ষাবে না !

হেমন্তকে দেখিয়ে রঞ্জিত বললে, এ আমাৱ বন্ধু, ধাকবে তোমাৱ
এখানে । একে পশ্চিমেৰ ঘৱটাৱ রেখো । সাবধান ।

রঞ্জিতেৰ পিছু পিছু হেমন্ত ভিতৱ্বে এসে দাঢ়ালো । ভিতৱ্বটা সম্পূৰ্ণ

বুকচাপা। দারিদ্র্যের বীভৎসতা চারিদিক থেকে যেন এরই মধ্যে তার গলা
টিপে ধরেছে, কিন্তু তা'র বিপ্লবী জীবনের একটি রাত্রির এই বিচ্ছি অভিজ্ঞতা
তাকে যেন কেমন এক প্রকার অভিভূত ক'রে দিয়েছে। কথা বলবার বা
প্রতিবাদ জানাবার শক্তি তা'র ছিল না।

রঞ্জিতের কথায় রাজি হয়ে মেঘেটি চ'লে যাচ্ছিল, পিছন থেকে রঞ্জিত
শুনৱায় ডাকলো, শোনো, শিবানী—

মেঘেটি ফিরে দাঢ়ালো। কপালে তার কাঁচপোকার টিপ, মুখখানা
পাউডার ঘষা, পরণে চকচকে চেক শাড়ী, গায়ের জামাটা ব্যবসায়ের উপযোগী,
হই ঠোটে পানের দাগ, মুখের শ্রী যেমন হোক, মাংসল স্বাস্থ্যটা প্রথমেই চোখে
পড়ে। রঞ্জিত বললে, শোনো, আমার বন্ধু কিছু থাবে না, ও খেয়ে এসেছে।

শিবানী বললে, ও কি কথা, ঠাকুরের ভোগ দেবো না? আমার ভাত
আছে, ভাগ ক'রে থাব।

না আজ থাক, কাল ওকে রেঁধে দিয়ো।

তোমরা কি দুজনেই থাকবে?

রঞ্জিত বললে, না, আমি এক্ষণি পালাবো।

কিন্তু তোমার সংগে কথা আছে যে? দাঢ়াও, আমি ছেলে দুটোকে
তাড়িয়ে আসছি এক্ষণি—তোমরা ওঘরে গিয়ে ব'সো।

আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একটা বাজে।

শিবানী হাসিমুখে বললে, বেশ যা হোক, পোড়ারমুখীকে না হয় পায়ের
তলায় রাখলেই একদিন।—এই ব'লে সে ছুটে চলে গেল।

পশ্চিমের ঘরে ঢুকে রঞ্জিত নিজেই আলোটা জাললো। সামনেই
একখানা ভাঙা তস্তা। তার উপর একখানা ছেঁড়া চাটাই ছাড়া আর যা
কিছু শয্যাদ্রব্য আছে, তা শ্রশানের পরিত্যক্ত সামগ্রীর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া
কঠিন। মেটে দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট দুটি কাঠের জানালা। ঘরের
একদিকে একরাশি জালানি কাঠ, এপাশে গোটা হই কলাইয়ের বাসন।
চৌকির নীচে এত জঙ্গাল যে, সাপের আড়া বললে ভুল হয় না।

হেমন্ত বললে, জায়গাটা অন্তু বটে। কিন্তু মেঘেটি কে বলো ত?

রঞ্জিত বললে, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ব্যবসা যারা চালায়, মেঘেটা
তাদেরই একজন।

হেমন্ত একটু ধ্যানে বললে, তোমার সঙ্গে ভাব হোলো কেমন ক'রে?

ওর স্বামী এককালে আমার বিশেষ পরিচিত ছিল। লোকটা ওকে ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করেছে।

ত্যাগ করলো কেন?

রঞ্জিত হাসিমুখে বললে, তুমি কি এক রাত্রেই সবটা শুনে নিতে চাও?

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে বললে, তুমি তা'হলে স্বীকার করো, একজনের পারিবারিক জীবনের সর্বনাশ করেছ? একটা জীবনকে তুমি অধঃপতনে নামিয়েছ।

রঞ্জিত বললে, ওরে ভাই, জীবন বড় জটিল। তুমি পাঁচটা লোককে খুন ক'রে কতগুলো নিরীহ মানুষকে পথে বসিয়েছ, তা জানো?

সেখানে যে একটা আদর্শ আছে!—হেমন্ত প্রতিবাদ জানালো।

আদর্শের জন্যে আরো অনেক রকমের আঙ্গুবলি আছে, হেমন্ত।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। শিবানী দ্রুতপদে ঘরে এসে দাঢ়ালো। বললে, ওরা গেছে,—বাঁচলুম, গা ধিন্ ধিন্ করে ওদের উৎপাতে।

রঞ্জিত বললে, দিয়ে গেল কিছু?

শিবানী বললে, ওদের মধ্যে একটা ছেলে খুব বড়লোক। টাকার পরোয়া করে না। প্রায়ই এখানে আসে।

হেমন্ত বললে, এইভাবে লোকের কাছে টাকা নিতে ভালো লাগে?

ইয়া—শিবানীও তৎক্ষণাত জবাব দিল।

ঘেঁঘা করে না?

একটুও না।

ঘেঁঘা করে না কেন?—হেমন্ত জানতে চাইলো।

শিবানী বললে, ডাকাতি ক'রে কেউ বা টাকা নেয়, কেউ বা টাকা নেয় ভালোবেসে! মেয়েদের পক্ষে শেষেরটাই স্বিধে!

হেমন্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, কিন্তু এ টাকা ত দেহ বিক্রির টাকা।

শিবানী একবার রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েমানুষের জন্মই ত সেই জন্যে! এ আর নতুন কি? কি বলুন, দাদা!

দাদা! হেমন্ত ধেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠলো। এ আবার কি প্রকার সম্ভাষণ!

রঞ্জিত শাস্তি কঠে জবাব দিয়ে বললে, অনেকে তোমার কথা বুঝতে চাইবে না শিবানী।

আচ্ছা, আমি ভাই এবাব পাবাবো।

শিবানী বললে, এই মধ্যে ?

ইয়া—তার আগে আমাৰ বন্ধু জয়ন্তৱ সঙ্গে তোমাৰ আলাপ কৱিয়ে দিই।
আজকে ও ঘুমোক—বড় ঝান্ট। কাল থেকে জয়ন্তৱ সঙ্গে তুমি খুব ঝগড়া
কৱো।

ৱঞ্চিত পলকেৱ মধ্যেই হেমন্তৱ নামটা বললে দিতে পাৱলো।

পৰে সে বললে, আৱ শোনো একটা কথা,—এটা কিন্ত একটু লুকিয়ে
ৱাখতে হবে।

এই ব'লে ৱঞ্চিত হেমন্তৱ কাছ থেকে রিভলবাৰ এবং টাকা ও গহনা সমেত
একটা পুঁটুলী বা'ৱ কৱে শিবানীৰ সামনে ধৱলো, শিবানী হাসিমুখে বললে,
আবাৱ বুঝি সেই সব উৎপাত। শুটাৱ গুলী ভৱা আছে ?

হেমন্ত বললে, ইয়া, পুৱোপুৱি ভৱা।

রিভলভাৱটা নিয়ে শিবানী অত্যন্ত অভিজ্ঞ হাতে এক প্ৰকাৰ মোচড় দিয়ে
বোতামটা আটকে দিল, যাতে গুলী না ছিটকে বেৱোয়। হেমন্ত তাৱ নিপুণ
হাতেৱ কাজ দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল। ৱঞ্চিত বললে, আমি চললুম,
আবাৱ ঠিক সময়ে আসবো। শিবানী, এসো, দৱজাটা দিয়ে যাও।

শিবানী গেল ৱঞ্চিতেৱ পিছু পিছু। গেঘেটাকে এত বিচিত্ৰ মনে হচ্ছে
যে, খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন একটা সাবলীল অন্তৱজ্ঞতা,—তা'ৱ
চেহাৱা অনেকটা যেন পাৱিবাৱিক। হেমন্তৱ মনে পড়ছে তা'ৱ এক সম্পর্কেৱ
বৌদ্বিদিকে। স্বামীগতপ্ৰাণা সচৰিত্রা বধু, কিন্ত আপন দেহেৱ আকৃ সমষ্কে
মে এতই উদাসীন যে, বিসদৃশ লাগে। এ স্বীলোকটি সম্পূৰ্ণ বিপৰীতস্বভাৱা,
কিন্ত এৱ দেহতৰঙে কোন ভজী নেই, চোখে কোনো মাদকতাৱ কলা-
কুশলতা নেই,—যেটি এদেৱ পক্ষে একান্ত স্বাভাৱিক। হেমন্ত অবাক হয়ে
থাকে।

বাইৱেৱ দৱজা সঘনে বন্ধ ক'ৱে শিবানী আবাৱ এসে ঘৱে চুকলো।
তাৱপৱ হাসিমুখে বললে, আপনাৱ বন্ধুকে আমি দাদা বলি, উনি আমাৱ
সহোদৱেৱ চেয়েও বড়।

হেমন্ত বললে, এ কি আমি বিশ্বাস কৱবো ?

শান্ত নভ হাস্তে শিবানী জবাৰ দিল, দৱকাৱ হ'লে আপনাৱ এ বিশ্বাস
ভেঙ্গেও দেবো, জয়ন্তবাৰু।

হেমন্ত সবিশ্বয়ে বললে, এমন দরকার কি হয়, যার জন্মে নৈতিক পবিত্রতাকে নষ্ট করা চলে? কি বলছ তুমি?

শিবানী তাকালো হেমন্তের মুখের দিকে, তাকিয়ে এমন হাসিই হাসলো যে, বর্ষায়সী স্ত্রীলোক অজ্ঞান শিশুর দিকে চেয়ে ঘেমন ক'রে হাসে। তারপর বললে, আপনি বিপ্লবী না?

হেমন্ত বললে, লোকে বলে বটে!

আপনার দাঢ়ি-গোফ নেই, বয়স অতি কম, কিন্তু আপনাকে মুসলমান সেজে ঘূরতে হচ্ছে, দাঢ়ি-গোফ মুখে পরতে হয়েছে, এর কারণ কি? উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্মে আপনি সবই ছাড়তে পারেন, এই না?

হেমন্ত বললে, অনেকটা—

শিবানী বললে, আমারও ধর্ম আছে একটা, তা'র জন্ম আমি যে কোনো পাপ আর নোংরা কাজ করতে পারি। আপনার কাছে যেটা অন্তায়, আমার কাছে সেটা গ্যায়।

কিন্তু নারীধর্ম?

আছে বৈ কি!

যেয়েদের সতীত্ব?—হেমন্ত ইঁপিয়ে ইঁপিয়ে বললে।

শিবানী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটা মহৎ কাজের অন্ত যদি দু'চারটে চামড়ার সতীত্ব যায়, কোন ক্ষতি নেই।

মহৎ কাজের দাম সতীত্বের চেয়ে কি বড়?

নিশ্চয়! একশোবার।—শিবানী জবাব দিল।

ঘরের পাশের গলিতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রাত হয়ত দুটো বেজে গেছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে বুৰতে পেরে সহসা শিবানী ফুঁ দিয়ে দপ ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিল, তারপর অবলীলাক্রমে হেমন্তের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, চুপ।

কে? আমার রিভলভার?

চুপ, ভয় পেয়ো না, ওরা হয়ত রাঙ্গিরের খন্দের! হয়ত অন্ত কেউ।

দু'জনে নিঃসাড় হয়ে রইলো। পায়ের শব্দ জানালার নৌচে এসে থেমে গেল। তারপর জানালার গায়ে সেই প্রকার তিনবার টক টক শব্দ। পরিচিত আঙুলের আওয়াজটি পলকের মধ্যে অনুভব ক'রে শিবানী তক্তার উপর উঠে চাপা গলায় সাড়া দিল, কে বিল?

জানালার বাইরে মৃদু চাপা গলা শোনা গেল, ঈঝা, ছোড়দি।

শিবানী আঁচল খুলে এক গোছা টাকার নেট নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, নিয়ে যাও। আবার এসো শনিবার রাত্তিরে।

এরপর দুঃজনে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পায়ের শব্দটা আবার ধৌরে ধৌরে একসময় মিলিয়ে গেল। হেমন্ত অঙ্ককারে বুবাতে পারলো, তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে শিবানী হাসছে। একসময় শিবানী বললে, তুমি বললুম, তখন তোমাকে, কিছু মনে করেছ? তোমার আমার বোধ হয় একই বয়স হবে।

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী পুনরায় বললে, তোমার বন্ধু তোমাকে বোধ হয় নরকে ডুবিয়ে গেছে, কি বলো?

হেমন্ত বললে, অস্ততঃ এটা স্বর্গলাভ নয়!

অঙ্ককারে শিবানী আবার হাসলো! তারপর বললে, এবার তুমি যুমোও। একলা থাকতে ভয় করবে?

ভয়!

ভয় যদি করে, তোমার কাছে শু'তে পারি। কতদিন ধ'রে ঘুম পাড়িয়েছি কত ছেলেকে!

শিবানীর গলার আওয়াজটা যেন অন্তুত শোনালো। যেন অনেক দূরের, অনেক দীর্ঘস্থানের স্বরের। হেমন্ত বললে, না না, আমি বেশ থাকবো।

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেঘেটা অসাধারণ সহজ। এত সহজ যে, গা ছম ছম করে। প্রকাশ পেয়েছে, শিবানী হলো। রঞ্জিতের বন্ধু-স্ত্রী, অর্থাৎ কথাটা এই, সে সন্দ্রান্ত মেয়ে। অনেক মেয়ে গৃহত্যাগ করে, অনেক মেয়ের বনাবনি হয় না গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে অথবা স্বামীর সঙ্গে,—কিন্তু সেজন্তে তাদের নীচে নেমে আসতে হবে, অথবা পথের পতিতাবৃত্তি তুলে নিতে হবে, এ কোন্ যুক্তি? পুরুষেরা মেয়েদেরকে নষ্ট করে, লোকের এই হাশ্চকর বিশ্বাস কেন? মেয়েরা পুরুষের লালসার খোরাক যোগায়। কেন যোগায়? কামিনীর লালসা মেটাতে হয় ক'দের? পুরুষকে নীচে নামায় ক'রা? এযুগে মেয়েদের তুলে ধ'রেছে ধারা—তারা আর যেই হোক, মেয়ে নয়!

সবচেয়ে আনন্দের কথা এই শিবানী আশ্চর্য রকম তেজস্বিনী, তার কথায় আর আচরণে শিক্ষা ঠিকরে বেরোয়। তার পতিতাবৃত্তি নেওয়াটা যেন স্থিতিস্থিত, অনেকটা যেন অক্ষের নিউর্ল ফ্লাফলের মতো।

মেঘেটা অবাক করেছে হেমন্তকে। হেমন্ত ঘুম আসে।

রঞ্জিত এগিয়ে গিয়ে বললে, এই ঘরে এসো—এইটে হলো শিবানীর—থাকে বলে শয়ন-মন্দির। এখানেই আছে তোমার রিভলভার, তোমার টাকার পুঁটলী। পুলিশ আজ ভোরে এখানে ছলিয়া জারী করছে তোমার নামে, মনে রেখো। তোমাকে ধরাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা। ছবি লটকে দিয়েছে ধানায় ধানায়।

হেমন্ত বললে, তাই নাকি? শিবানী কোথায়?

রঞ্জিত বললে, শিবানী! শিবানী দিনের বেলা এখানে থাকে না।
কোথায় যায়?

তার ছোট ছেলে আছে কাছেই গাঁয়ে—সেখানে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে।

হেমন্ত বললে, স্বামীকে ছেড়ে শিবানী কি এইভাবেই এখানে পেট চালায়?
পাগল! তাহলে ত' সমস্তা মিটেই যেতো। নিজের জগ্নে নম্ব গো,
তাকে খাওয়াতে হয় অনেক লোককে। তুমি যে এখানে থেকে থাচ্ছ,
তোমাকে খাওয়াচ্ছে কে?

এর জন্ত তাকে ধর্ম খোয়াতে হবে?

ধর্ম! শিবানীর ধর্ম শিবানী! ওর পিঠের চামড়া খুলে দেখো, কতদিনের
কত অপমানের দাগ। স্বৰ্ণ মাহুষ দুর্গমের দিকে পা বাড়ায় কেন? কিসের
লোভে। কী পাবার আশায়?

রঞ্জিত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে ঠাসা বই-কাগজ। কতকালের পুরনো বই, কত অসংখ্য
কাগজের টুকরো। মাটির দেওয়ালে ঝোলানো দেশনেতাদের কাচিকাটা
ছবি। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেম, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাই,—এবং একালের
সুভাষ বন্ধু, সুর্য সেন—সকলের। দেওয়ালের গায়ে ইতিহাস, কত তাদের
ভাষা আর স্বপ্ন, কত অনাচারের কাহিনী, কত মর্মস্তুদ আঙ্গোৎসর্গের
ইতিকথা। কত কি ধেন হেমন্ত খোজে, কত বিশ্বের চিঙ্গ সে আবিষ্কার
করে! আশৰ্য, এই তৌর্ধপথ তার একদিন জানা ছিল না—এ ধেন সমগ্র
বাংলার বিপ্লববাদের হৃদয়মন্দির। হেমন্ত অভিভূত হয়ে থাকে।

এই ঘাথো, তোমার ছবি কত যত্নে আল্বামের মধ্যে রাখা। এটা
তোমার পাঁচ বছর আগের ছবি, তুমি তখন প্রথম কাজে নেমেছে।

হেমন্ত আল্বাম নিয়ে নিরীক্ষণ করে। ছবির নীচে শিবানীর হাতে লেখা,
ঠাকুর, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। শিবানী বিপ্লবীদের পূজা করে,

বিপ্লবীদের কল্যাণের জন্য আভ্যর্যাদা বিকিয়ে দেয়। অনেক নৌচে থাকে সে, থাকে সকলের পিছে। গত রাত্তির কাহিনী হেমন্তের মনে পড়ে। জানালার নৌচে থেকে চাপা কর্তৃ ডাক আসে, ছোড়নি! শিবানী টাকা দেয় তাদের হাতে। তারা বিপ্লবী, তারা অঙ্ককারের চর, তারা নিশাচর। তার ঘরে আসে মাতাল, আসে লস্পট, আসে অনাচারী। শিবানী টাকার পরোয়া করে না, দেহনানের সংকোচ করে না, সতীত্ব-নারীত্ব কোনোটাই গ্রাহ করে না।

কাল রাত্রে একসময় শিবানী বলেছিল, দেহ ছাই! নোংরা হোক, পাঁকে ডুবুক, দেহ জলে পুড়ে যাক, কিন্তু ভিতরের আলোটা না নিভলেই খুশি থাকবো। ময়লা জঙ্গল পুড়ে থাক হোক সেই আগুনের শিথায়।

বাইরে কয়েকজন ফেরৌওলা আসে।—কেউ মাছ-আনাজ আনে, কেউ আনে দই-মিষ্টি, কেউ আনে চাল-ডাল। ওদের মধ্যে একজন এসে অলঙ্ক্ষে একখানা চিঠি আর একখানা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। অবাক হয় হেমন্ত। কে ও লোকটা? রঞ্জিত বলে, ওরা কেউ ফেরৌওলা নয়, ওরা সবাই দলের লোক। পাটিমেষ্টারুরা এখানে আছে ছড়িয়ে, ওরা তারাই—ওরা খাবার জিনিষ সাপ্তাহ ক'রে যায়।

চিঠি কার?

আমার নামের। একটা ফিকিরের আয়োজন আছে।

কি?

কাল হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। ছোট হাকিম তোড়জোড় করছে কাল একটা মারামারি বাধাবার। আমরা ফ্ল্যাগ তুলবো ঠিকই। সভাও করবো। ছোট হাকিম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কিন্তু আমরা আইন ভাঙবো।

হেমন্ত প্রশ্ন করলো, সভাপতি কে?

রঞ্জিত বললে, এখানকার যিনি লক্ষ্মীবাঈ—তিনি!

মেঘে?

ইঝা, মেঘে। বাসনা গড়াই! নাম শোনোনি?

হেমন্ত উদ্দীপ্ত চক্ষে বললে, বাসনা গড়াই? এখানকারই মেঘে নাকি? কাগজে দেখেছি আশ্চর্য তার কীর্তি! আচ্ছা, বাসনা গড়াই না এদিককার তেভাগা আন্দোলন চালাচ্ছে? রঞ্জিত বললে, তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে। আসলে ক্লিফ্টন সাহেবকে খুন করেছিল বাসনা গড়াই ওর বাজলোঁয় ঢুকে। এই নিয়ে বাসনা গড়াই চারটে ইংরেজকে মারলো।

হেমন্ত হেসে বললে, সত্যি, মহিলাটি ভয়ানক ইংরেজ-বিষেষী !

রঞ্জিত বললে, ইংরেজকে ও কুমিকীটের চেয়েও ঘেঁষা করে !

হেমন্ত বললে, কাল তোমাদের সভা কখন ?

সকাল দশটায়। রেলের মাঠে সভা—বছ গ্রাম থেকে লোক আসবে।
ফ্যাগ ভুলতে না দিলেই দাঙ্গা।

আমিও যাবো সভায়।—হেমন্ত প্রস্তাব জানালো।

রঞ্জিত বললে, দূর পাগল !

হেমন্ত বললে, ভয় কি ! দাড়িগোঁফ থাকবে লাগানো ! নতুন একখানা
লুঙ্গি শুধু দিয়ো। গায়ে চাদর দিয়ে দেখে আসবো তোমাদের সভা।

ধরা পড়লে ঝাসী মনে রেখো।

সে ত' একদিন হবেই। তার আগে পর্যন্ত বেঁচে আছি, এটাও ঠিক।

খবরের কাগজটি খুলে দেখা গেল আগামী কালকার সভার বিবরণ।
ভোরে প্রভাত ফেরী, জাতীয় সংগীতের শোভাযাত্রা, স্বদেশী চিত্রপ্রদর্শনী এবং
আরো কত কি। বেলা দশটায় এই জেলার অগ্নিক্ষেপ-নেতৃত্বী বাসনা গড়াইয়ের
সভানেত্রীত্বে রেলময়দানে পতাকা উত্তোলন। বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে পৌছেছেন
এখানে। আহাৰাদিৰ পৱ বিশ্রাম ক'রে বিকালের দিকে রঞ্জিত চলে গেল।
বলা বাহ্যিক, সোজা গেল সে মদের দোকানের দিকে। মেগানে গিয়ে দেশী
মদ কিনে গেলাস নিয়ে দোকানেই ব'সে গেল। পান করে সে প্রচুর।
গোয়েন্দাৱা তা'র সম্বন্ধে কোনো ছুঁচিস্তা পোষণ করে না। রঞ্জিত মাতলামি
করতে করতে সন্ধ্যার পরে বস্তিৰ দিকে অভিযান করে। গোয়েন্দাৱা
নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যায়।

সন্ধ্যার পরে শিবানী ফিরে এলো। হেমন্ত অপেক্ষা কৰছিল তা'র জন্য।
কী ভালো লেগেছিল শিবানীকে সাঁৱাদিন ! পলকের জন্য হেমন্তৰ ইচ্ছা
জাগলো, ছুটে গিয়ে শিবানীৰ দুই হাত ধ'রে বলে, আমি তোমার সেই ঠাকুৱ,
সেই হেমন্ত মিত্র—যার ছবিৰ নিচে তুমি প্ৰণাম জানিয়ে রেখেছ। শিবানী,
তোমার ওই উৎপীড়িত পশুপদবলিত দেহেৱ নীচে দু'খানি পায়েৱ তলায়
আমিও যাবাৰ সময় আমাৱ প্ৰণাম রেখে যেতে চাই। কিন্তু হেমন্ত আঘাসহৱণ
ক'রে তা'র মুখেৱ পৱচুলটা ঠিক ক'রে নিল। বিপুলবীৱ মনে দুৰ্বলতা না
আসে। আঘাপৱিচয় প্ৰকাশ কৱলে হেমন্তৰ কিছুতেই চলবে না। যেমন
সে এসেছে তেমনি নিৰ্বিলৈ সে যেন চ'লে যেতে পাৱে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল শিবানীর বাইরের ঘরে।
সন্তুষ্ট জন দুই মাতাল এসেছে আজ সক্ষ্যায়, তাদেরই অড়িত কঠের কলরব।
মাঝে মাঝে কাঁচের আওয়াজ, মাঝে মাঝে সোভার বোতল খোলা। ওরই
সঙ্গে চূর্ণ আঙ্কোশের ছিটে, গানের টুকুরো, বক্তৃতার ভগ্নাংশ, উচ্চহাস্তের তাল,
—অর্থাৎ ওই জীবনেরই আচুম্বিক। মাঝখানে সহসা শিবানীর কাতরোক্তি
গুনে হেমন্ত বেরিয়ে এলো। অচুমান মিথ্যা নয়। মৃদু করুণ কঠে শিবানী
প্রতিবাদ আনাচ্ছে,—কিন্তু মারধোর চলেছে তা'র ওপর। সংযম রক্ষা করা
কঠিন। হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে ঢাড়ালো। ভিতরে শিবানীর
চাপাকঠের কী কাতরোক্তি—কী ফুঁপিয়ে কান্না! হেমন্ত লাফিয়ে পড়তে
পারে পশুর ওপর এখনি,—কিন্তু হট্টগোলে যদি পুলিশ আসে তবে আর রক্ষা
নেই। শিবানীর জীবন ছারখার হবে। ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা গেল,
কে বাইরে?

হেমন্ত পলকের মধ্যে নিজের ঘরের দিকে চ'লে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা
খুলে শিবানী এলো বেরিয়ে। পশ্চিমের ঘরে তুকে দেখলো, অঙ্ককারে চৌকির
ওপর ব'সে রয়েছে হেমন্ত। কাছে এসে শিবানী বললে, সারাদিন দেখোনি
তাই রাগ করেছ, না?

হেমন্ত মুখ তুললো। শিবানীর মুখে ও নিঃশ্বাসে কড়া দেশীমদের গন্ধ
বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেমন্ত বললে, ছি, আমি কেন রাগ করবো? আচ্ছা, ওরা
কি তোমাকে মারছিল?

শিবানী বললে, ইয়া,—তুমি তখন দরজার পাশে ঢাকিয়েছিলে, না?

মারছিল কেন তোমাকে?

আগে বলো, তুমি দরজার পাশে ঢাকিয়েছিলে কেন?

পশুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্তে।

তোমার এ রাগ কেন, অমন্ত?

হেমন্ত আবার শিবানীর মুখের দিকে তাকালো। শিবানী কতকটা
অড়িত কঠে বললে, কেউ ছোট নয়, অমন্ত। স্বামী, সন্তান, লম্পট, অনাচারী,
পশু, দেবতা, বিপ্লবী—সব মিলিয়ে পুরুষ। কেউ ছোট নয়।

হেমন্ত বললে, তাই ব'লে তোমাকে মেরে খুন করবে? আমি যে তোমাকে
কান্দতে দেখলুম শিবানী?

শিবানী হেসে বললে, ইয়া, মারলে লাগে, কান্নাও আসে। কিন্তু কী

করবো, এক একটা লোকের অভ্যাস অমনি। মেঘেমাহুষকে পায়ের তলায় ফেলে না খেঁচালে হয় না। মারবার সময় জানে, মার আমি সইতে পারি।

কিন্তু এ-জীবন তুমি কত দিন সইবে শিবানী?

তোমরা যতদিন না আগুন জালাবে! বড় গরীবের দেশ জয়ন্ত, নিজের দেহ না বেচলে টাকা পাইনে। অনেক ছেলে লুকিয়ে রয়েছে, অনেক ছেলে পালিয়ে বেড়ায়—আমি তাদের ফেলতে পারিনে। বড়লোক আছে, তারা ঘেঁসা করে তোমাদের, তারা ছেলেদের ধরিয়ে দেয়—তারা জমিজামগা কেড়ে নেয়, সেপাইদের ডেকে এনে ধান-চাল বের ক'রে নিয়ে যায়। আমাদের ধাচবার কোন উপায় রাখে না।

বাইরে থেকে কর্কশ কঠের ডাক শোনা গেল। শিবানী বললে, এবার আমি যাই, তুমি শান্ত হয়ে থাকো। রাত্তিরে আসবো।

হেমন্ত বললে, আবার যাবে কেন? ওদের তাড়াও!

ইয়া, তাড়াবো। কিন্তু ওরা খুশী না হয়ে যাবে না। ওদের ছটফটানি শান্ত হ'লে ওরা নিজেই চলে যায়, আর একটুও দাড়ায় না।

হেমন্ত বললে, আমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে শিবানী, সব টাকা তুমি নাও। আমি সব দিয়ে যাচ্ছি।

শিবানী বললে, বেশ ত' দিয়ো। যতদিন তোমার টাকা ফুরোবে না ততদিন আমি বিশ্রাম নেবো। কুকুররা এলে তাড়িয়ে দেবো দরজা থেকে। এবার আমি যাই।

হেমন্ত খপ ক'রে শিবানীর হাত ধরলো। বললে, একটা কথা দাও?

শিবানী বললে, কি ব'লো?

কথা দাও, আর কোনোদিন মদ খাবে না?

শিবানী বললে, মদ না খেলে ওদের কাছে যেতে ঘেঁসা করে! ওরা জন্তু হয়ে আসে জন্তুর সঙ্গে লড়াই করার জন্তে,—আমাকে জন্তুর অভিনয় করতে হয়, জয়ন্ত!

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেমন্তের মন সংস্কারাচ্ছন্ন। এটা তা'র কাছে একেবারে নতুন। এটা যেন জীবনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার বিপক্ষে বিজ্ঞোহ। এটা নীতির বাইরে, এটা সমাজের বাইরে। সে বিপৰী, তা'র লক্ষ্য হোলো দেশের মুক্তি, আদর্শের সার্থকতা। একদিন তা'কে গীতা স্পর্শ ক'রে শপথ নিতে হয়েছে,

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ! সে হবে সন্ধ্যাসী—কাষ্মনোবাক্যে । লোভ, মোহ, খ্যাতি, সম্পদ—সমস্ত তার কাছে তুচ্ছ । নারী তা'র কাছে দেবী, দেবী কথনও লালসার বস্ত্র নয় । কিন্তু এখানে বিশ্বাসকে কিছু বদলাতে হচ্ছে । সবচেয়ে পবিত্র ব'লে যে-নারীদেহের প্রতি লোভ প্রকাশ করা তাদের নীতিবিকল্প, নারী নিজেই সেই দেহকে সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ ব'লে খণ্ডে খণ্ডে বিকিয়ে দিচ্ছে পশুদলের ক্ষুধার্ত মুখের কাছে ! পুরুষ দেখছে মেয়েদের স্থান কত উচুতে, মেয়েরা দেখছে তাদের আশ্রয় পুরুষের পায়ের তলায় । শিবানী নিজের দেহ থেকে নিজের প্রাণসত্ত্বকে বিছিন্ন ক'রে নিয়েছে । কী নিরাসক আত্মান তা'র ! নির্মাহ নির্লাভ দেহথানাকে উৎপীড়িত হ'তে দেখে তার বেদনাবোধ নেই । মুক্তিযজ্ঞের যে বিরাট হোমাগ্নি জলেছে সমস্ত দেশে,— শিবানী নিজের দেহকে উৎসর্গ করেছে সেই আগুনে । যে কোন পথ দিয়ে যেমন ক'রে হোক নিজেকে তার উৎসর্গ করা চাই । ছুপুরবেলা রঞ্জিতের কাছে সে শুনেছে, দু-বছর আগে ইংরেজ গোরা বহলোকের মাঝখানে শিবানীর মাঘের উপর পাশবিক অনাচার করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে তার এক ভাইকে জীবন্ত দন্ত করেছে—তার সহোদরা ভগীকে নিয়ে গেছে পন্টনের ঝাঁটুতে । সংবাদপত্রে এসব অনাচারের কাহিনী প্রকাশিত হওয়া আইনবিকল্প ছিল সেদিন । রঞ্জিত বললে, এখানে চরিত্রের নীতিরক্ষার কথা ওঠে না, হেমস্ত । প্রতিবাদের সত্ত্বা আমরা ডাকিনি, ভাই—আমরা প্রতিকার খুঁজেছি । অহিংসা, চরকা, শাস্তিপূর্ণ হরতাল, আইন অমাত্য, অসহযোগ—এতে আমরা ভুলিনি । আমরা মাঝখানে গ্রাম আর পরিবার থেকে ছেলে-মেয়ে এনেছি, আমরা এনেছি চারীদের ডেকে । যাদের ভাত-কাপড় জোটে না তারাই আমাদের অস্ত্র, পেটের ক্ষিধেই আমাদের মূলধন,—যারা নিঃস্ব তারাই সহজে দয়াহীন হতে পারে । যে মেয়েরা সন্দ্রম খুঁইয়েছে, দেহ বিকিয়েছে, লজ্জা ছেড়েছে, তারা নিষ্ঠুর আর ভীষণ হতে জানে । তারা পরোয়া করে না জীবনের, ভয় পায় না মরণের । তোমাকে শিবানীর মতন আরো অনেক মেয়েকে দেখাতে পারতুম ।

শিবানী ঘরে এলো অনেক রাত্রে । সে আন ক'রে শুচিশুল্ক হয়ে এসেছে, এলো চুল থেকে তার ফোটা ফোটা জল ঝরছিল । কপালে টিপ নেই, মুখে পাউডার নেই, পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সে । লঠনটা সে এক জামগায় রাখলো । হেমস্ত বললে, এর মধ্যে এলো যে ?

শিবানী বললে, এবার আর কেউ নয়, কেবল তুমি। তোমাকে নিয়ে
থাকবো। গরম জল করেছি, হাত-পা ধোও।

বাইরে মৃদু মৃদু বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ শীত পড়েছে খুব। বস্তির গলিপথ
আজ সঙ্ক্ষা থেকেই প্রায় জনহীন। তা'ছাড়া গতকাল গিয়েছে সরস্বতী পূজা,
—আজ বিসর্জনের সঙ্ক্ষা।

শিবানী কাছে এসে হেমন্তর দু'হাত ধরে নামালো। গরম জলে তাকে
পরিপাণি ক'রে ধুইয়ে নতুন তোয়ালে দিয়ে তা'র পা মুছিয়ে দিল। শিবানীর
ঘন নেশা তখনও কাটেনি। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে গরম গরম লুচি আর
তরকারি এনে হেমন্তকে সে নিজের হাতে স্বত্ত্বে থাওয়াতে ব'সে গেল।

এর মানে কি, শিবানী ?

যদি কিছু প্রায়শিক্ত হয় ! হাসিমুখে শিবানী জবাব দিল।

তুমি ত' আজো পাপ করোনি।—হেমন্ত বললে।

কেমন ক'রে জান্মলে ?

হেমন্ত বললে, যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিল যুদ্ধ জয়ের জন্যে। পুরাণের গল্লে
আছে, সতীত্বের আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে আত্মবলি দিয়েছে; কিন্তু যহং
আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে সতীত্ব আর নারীধর্মকে বলি দিয়েছে, এও অনেক
পাওয়া যায়। রোজ প্রভাতে পঞ্চকণ্ঠাকে শ্বরণ করি, তাঁদের সতীত্বের আদর্শের
জন্যে নয়, শিবানী। তুমি কান্দছ কেন, বলো ত ?

ঝাঁচলে চোখ মুছে শিবানী বললে, আমার ভালোবাসায় কি তুমি বিশ্বাস
করবে ?

না।—হেমন্ত জবাব দিল।

থাওয়া শেষ হ'লে শিবানী ঝাঁচল দিয়ে হেমন্তর হাত মুখ মুছিয়ে দিল।
পরে ভগ্ন কঠে বললে, তোমাকে হয়ত আর কোনদিন দেখতে পাবো না।
আমার ভালোবাসা নিয়ে যাও তুমি।

ছি—বিপ্লবী জবাব দিল, যাবার আগে মিথ্যে জিনিস আমার হাতে তুলে
দিয়ো না শিবানী।

মিথ্যে !

মিথ্যে বৈ কি। তুমি শুধু ভালোবাসো ইংরেজের হৎপিণ্ডের রক্ত ! আর
মা কিছু ভালোবাসো, সেটা তোমার ঐ মদের নেশা—নেশা কাটলে আর
কিছুই থাকবে না।

শিবানী বললে, কিন্তু আমার ছোট ছেলেটি ?

ওটাও তোমার ভুল—হেমন্ত বললে, ভয়ানক ভুল। মৃত্যু আর অপযুক্ত হটোই তোমার জানা। নিজেকে যে সবচেয়ে ভালোবাসে, তাই কাছে দাখ হোলো স্বামীর, সন্তানের, সম্পদের, খ্যাতির, প্রতিষ্ঠার। তোমার কিছু নেই, তাই ভালোবাসাও নেই। নিজের দেহের উপর তোমার অমুরাগ নেই, তাই তুমি সর্বস্বাস্ত। তোমার ধর্ম তোমার দেহের উপর দাঢ়িয়ে নেই ব'লেই তুমি এত বড়।

হাত কাপছে শিবানীর, তবু আলোটা বাড়িয়ে সে কাছে এনে রাখলো। শিয়রের জানালাটা সে হাত বাড়িয়ে বন্ধ ক'রে দিল। অতি যত্নে মাথার বালিশটা গুছিয়ে সে হেমন্তকে শোয়ালো। তারপর একখানা হাতে হেমন্তর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে সাদরে বললে, তুমি কে ?

আমাকে লোভ দেখিয়ো না, শিবানী।

ছি, ও কি কথা ? চন্দন কাঠ পু'ড়ে গেলেও তা'র স্বগন্ধ ঢাকা পড়ে না, জয়ন্ত। লোভ তোমাকে ছুঁতে পারে না, তাই ত' ছুঁয়েছি তোমাকে ! তুমি বিপ্লবী, তোমার ভয় কি ? -

হেমন্ত বললে, আমার সংস্কার আছে, চেতনা আছে !

রাঙ্গা দুটো আয়ত চোখ হেমন্তর মুখের উপর রেখে শিবানী বললে, থাক ওসব ছাইভস্ব ! তুমি মুখোস থোলো। কপালে কাটার দাগ টেনেছ, চোখের কোলে দিয়েছ কালি, মুখে মিথ্যে দাঢ়ি-গৌফ,—তুমি এবার সত্য হয়ে ওঠো।

আমাকে জেনে তোমার কী লাভ ?

ঝাঁচল দিয়ে শিবানী হেমন্তর কপালের দাগ মুছিয়ে দিল। চোখের কালি দিল ঘুচিয়ে। তারপর অতি সন্তর্পণে হেমন্তর মুখের উপর থেকে আঠা মাথানো দাঢ়ি-গৌফ খুলে সরিয়ে দিল। প্রকাশ পেলো একজন তরুণের স্বরূপার নবর মুখচ্ছবি। গৌফের রেখা তাঙ্গাত কচি, ঠোঁট দুটি পাতলা টস্টসে—দাতগুলি পরিচ্ছন্ন। শিবানীর মাদক-জরোজরো দুই মুঝ চক্র দেখতে দেখতে যেন ঝাপসা হয়ে এলো। জলিত জড়িত কঠে সে শুধু বললে, এই তুমি ? একঙ্গ পঞ্জিতের মতন কথা বলছিলে ? তুমি যে আমার চেয়ে অনেক ছোট !

পায়ের শব্দ হোলো। পা টলতে টলতে রঞ্জিত এসে চুকলো ঘরের মধ্যে :

শিবানী একটুও নড়লো না, এতটুকু সরলো না। হেমন্তর গলা জড়িয়ে বুকের
ওপর মুখ রেখে গদগদ কঠে বললে, কতকালোর পুণ্য আমার !

রঞ্জিত দূরে দাঢ়িয়ে বললে, কেন ?

এই আমি প্রথম দেখলুম !

ক'কে ?

পুরুষকে ! শিশুর যতন পবিত্র পুরুষ। বলো, কে তুমি ? রঞ্জিত কাছে
এসে বললে, মুখোস খুলে দিয়েও চিনতে পারোনি ? তোমার আল্বাম নিয়ে
এসো, ওরই পায়ে তুমি প্রণাম রেখেছ, শিবানী !

হেমন্ত বললে, তোমার কাছে আমার গৌরব অনেক ছোট, একথা আমি
কোনোদিন ভুলবো না, শিবানী !

আকর্ষ আবেগে শিবানীর গলা বুজে গেছে। চোখে জল গড়িয়ে এসেছে
তা'র। ধরা চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে সে বললে, তুমি—তুমি হেমন্ত মিত্র !

রঞ্জিত সেখানেই বসে নেশার ঘোরে চুলতে লাগলো। হেমন্ত এবার একটু
উঠে বসবার চেষ্টা করলো। বললে, কাল তোমাদের সভায় আমাকে
যেতে দিয়ো, রঞ্জিত !

শিবানী বললে, সেটা কাল, আজ নয়। আজ তুমি আমাদের ছ'জনের।

রঞ্জিত জড়িত কঠে বললে, শিবানীর অনেক দিনের সাথ ছিল তোমাকে
দেখবার।

শিবানী বললে, কাল থেকে তুমি আবার রক্তের পথ মাড়িয়ে ষেয়ো,
আজ থাকো আমার কোলের কাছে, থাকো আমার বুকের পাশে। আসো
জেলে তোমাকে আমি দেখবো সারারাত!—এই ব'লে সে সত্যই
হেমন্তকে আরো কাছে টেনে নিল। কাঙ্গালিনী যেন খুঁজে পেয়েছে
হারানো রত্ন !

দাদা ?

রঞ্জিত মুখ তুললো। শিবানী বললে, কালকের সব ঠিক আছে ?
ইঠা।

আর কোনো খবর ?

না।

শিবানী আলোটা এবার নিভিয়ে দিয়ে বললে, তবে বাকি রাতটুকু আমার
প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে ধাকতে দাও, শেষরাজে উঠে ষাবো।

হেমন্তকে কাছে নিয়ে শিবানী চৌকির উপর শুয়ে পড়লো। চুলতে চুলতে
এক সময় রঞ্জিত নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল। কী যেন অসীম পরিহৃষ্টি
তা'র মুখে চোথে।

হেমন্ত অঙ্ককারে একসময় বললে, শিবানী, আবার কান্দছ যে ?

শিবানী ফুঁপিয়ে বললে, বড় সাধের কান্না—একটু কান্দতে দাও !

কেন ?

তুমি যে থাকবে না কাল থেকে ?

হেমন্ত বললে, সকালের শিউলী ঝ'রে পড়ে—তা'র জন্তে দুঃখ কি ?

শিবানী বললে, সমন্ত রাত ধ'রে মৃত্যুর কান্না কান্দা, সকালে ঝ'রে
পড়া !

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী বললে, কি পেলে তুমি খুশী হও ?

কিছু না পেলে বেশী খুশী হই !—হেমন্ত স্পষ্টকর্ত্ত্বে জবাব দিল।

কেন ?

রাখার কোন জায়গা নেই। যা পাবো ফেলে যেতে হবে কাল ভোরে।
ভালো কিছু পেলে ফেলে যেতে দুঃখ পাবো। কিছু চাইনে, শিবানী।

শিবানী বললে, আমাকে যদি নাও ? আমার সব, আমার যা কিছু ?

হেমন্ত সহান্ত্বে বললে, মাংসপিণি !

শিবানী চুপ ক'রে রইলো। তার চোথের জল ঝ'রে চলেছে গড়িয়ে
গড়িয়ে। তার বিরাম নেই। বিপ্লবীরা ডাক শোনে না, কাছে টানলেও থাকে
অনেক দূরে। শিবানী আস্তে আস্তে হাতধানা বাড়িয়ে হেমন্তের মুখের উপর
বুলিয়ে অচুভব করলো তা'র জীবনের সর্বোত্তম দীক্ষাদাতাকে।

হেমন্ত শুধু বললে, কেন্দো না শিবানী !

শিবানী বললে, তোমাকে বাঁচানো যায় না কোনমতে ?

ফাসৌর আসামীকে বাঁচতে বলো কেন ? আমি খুনে।

কাল তোমাকে যেতেই হবে ?

শিবানী !

শিবানী চুপ ক'রে গেল। কিন্তু আবার গলা জড়িয়ে বললে, তোমাকে
বাঁচান যাবে না ব'লেই চোথের জল ফুরোতে চাইছে না।

এবাবে শান্ত হয়ে যুমোও দেখি ?—হেমন্ত অহুরোধ আনালো।

শিবানীর নেশা এবাব কেটেছে। সে ডুকরে ডুকরে কান্দতে লাগলো।

জনরোল উঠেছে রেলের ময়দানে সকালের দিকে। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমাঞ্চ ক'রে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে পথে পথে। বহু গ্রাম থেকে অর্ধনগ্র বৃত্তক্ষ নরনারী এসেছে কাতারে কাতারে। শৃঙ্খলাভঙ্গের ভয় ছিল কর্তৃপক্ষের মনে। স্বয়ং বড় হাকিম সাহেব পুলিশ ফৌজ সঙ্গে নিয়ে রেলময়দানের ঘাঁটি আগলে রয়েছেন। এখন যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চলেছে চারিদিকে, দেশের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা একান্ত দরকার।

কিন্তু এটি স্বাধীনতা দিবস। কংগ্রেস নির্দিষ্ট স্বাধীনতার শপথ আজ গ্রহণ করাই চাই। আগে পতাকা উত্তোলন, পরে সবাই দণ্ডায়মান হয়ে শপথ গ্রহণ,—এ দুটি স্বয়ং সভানেত্রী সম্পন্ন করবেন। জনরোল উঠেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণ শান্তিভঙ্গের জন্য আদোৰী ব্যস্ত নয়।

এক সময় হাজার হাজার কঠের জয়ধ্বনিতে জানা গেল, সভানেত্রী বাসনা গড়াই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। ভিড়ের ভিতরে এক সময় হেমন্ত চোখে চোখে দেখে নিল রঞ্জিতকে ; রঞ্জিত একটু হাসলো। হেমন্তের পরণে লুঙ্গি, পায়ে নরম ক্যার্বিশের জুতো, গায়ে ঢাকা চাদর, মুখে মন্ত্র দাঢ়ি-গোফ, কপালে কাটার দাগ, চোখের কোণে কালি।

সভানেত্রী বাসনা গড়াই পতাকা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে এলেন। দূরের থেকে তাকে সহসা দেখে হেমন্ত স্তন্ত্রিত ! সে শিরানী। ভোর রাতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে,—এবার এসেছে সংস্কারা, . কপালে সিদ্ধুর, পরণে রাঙ্গাপাড় খন্দরের শাড়ী, চোখ দুটি শান্ত, অহিংসভাবে কেমন প্রসন্ন, আনন্দ ! বিস্ময়াহত হেমন্তের চক্ষে আর পলক পড়ে না। সকালের স্নিফ কোমল রোদ্রের আলোয় শিবানীকে মহীয়সী মনে হচ্ছে। চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো, বন্দেমাতরম্। হাকিম ছকুম দিলেন, পতাকা নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলো। পুলিশ ফৌজ সেই অপমানজনক আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করলো। জনসমুজ্জ্বে তুফান দেখা দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাত।

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি পাঠের জন্য বাসনা গড়াই একখানি বড় কাগজ বা'র করলেন। সে কাগজের নকল ছিল বহু লোকের হাতে। শিবানী পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় হাকিম ছকুম করলেন, বন্ধ করো। কিন্তু বন্ধ হোলো না, শিবানী পড়ে চললো। পুলিশ লাঠি চালনা আরম্ভ ক'রে দিল,—জনতা ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। এক সময় লাঠি পড়লো গিয়ে স্বয়ং সভানেত্রীর পিঠে। শপথ-পাঠ তখনও শেষ হয়নি, স্বতরাং লাঠি পড়ল তার মাথায়। মার খাচ্ছে

সাধাৱণ অসাধাৱণ সব লোকই। শপথ গ্ৰহণ কৱতে দেওয়া হবে না, ওতে ইঁৰেজ বসাতলে যাবে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পুলিশ সাহেব তা'র চেয়েও ক্ষিপ্ত। বাসনা গড়াইয়ের কপাল বেঞ্চে গড়িয়ে এসেছে বুকেৰ ধাৰা, কিন্তু শপথ-পাঠ তখনও শেষ হয়নি। শেষ অংশটাৱ কাছাকাছি আসতেই হাকিয় সাহেব হকুম কৱলেন, গুলী চালাও।

হেমন্ত এইটিৱ জন্য অপেক্ষা কৱছিল। ক্ষিপ্তোন্নত জনসাধাৱণেৰ মাৰখানে গুলী চালাবাৱ ফলে গুলী গিয়ে লাগল সভানেত্ৰীৱ গায়ে। বাসনা গড়াই প্ৰতিশ্ৰুতিপাঠেৰ শেষ ছত্ৰে কোন মতে পৌছে অচেতন হয়ে বৰুৱাখা দেহে ঘাটিতে প'ড়ে গেলেন। হেমন্ত পাঁকাল মাছেৰ মতো পিছলে ভিড়েৰ ভিতৱ থেকে ব্ৰাট্ৰ সাহেবেৰ দিকে এগিয়ে এলো, তাৱপৱ পলকেৱ মধ্যে চাদৱেৰ ভিতৱ থেকে বিভূতিবাৱ বা'ৱ ক'ৱে পিছন দিক থেকে—এক-হৃই-তিন-চাৱ একটিৱ পৱ একটি গুলী সাহেবেৰ পিঠেৰ সৰ্বাঙ্গে গিঁথে দিয়ে চাদৱেৰ মধ্যে হাত লুকিয়ে নিল।

কয়েকজন এ দৃশ্য দেখেছে, তাৰেৱ মধ্যে বৰঞ্জিত একজন।

তাৱপৱ আৱ না বলাই ভালো। দূৰেৱ থেকে এক সময় হেমন্ত লক্ষ্য ক'ৱে দেখেছে, বাসনা গড়াইকে নিয়ে যাওয়া হোলো হাসপাতালে। বৰঞ্জিত দূৰেৱ থেকে চোখ টিপে কেবল জানালো, বেঁচে যাবে, ভয় নেই।

* * *

হৃপুৱ বেলায় এক হাঁটলায় তামাক খেয়ে দাঢ়িতে হাত বুলিয়ে মাথাৱ পাগড়ীটা ঠিক ক'ৱে নিয়ে হেমন্ত ধীৱে ধীৱে মসজিদেৱ দিকে চললো। এখনও তা'ৱ নমাজ পড়া হয়নি !

এত হজৰ জানলো সে কি শহৱে আসতো ? চাৱিদিকে তখন ধৱপাকড় চলছে। জেলা ম্যাজিস্ট্ৰেট ব্ৰাট্ৰ মাৱা গেছেন।

খুব সন্তুষ্ট

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মোরাদাবাদ ষ্টেশনই হবে। দিল্লীর দিকে যাবার
পথে ওখানে গাড়ী বদল করবার জন্য নেমেছিলুম। রাত তখন বারোটা।
হেমন্তকৃতুর শেষ প্রান্ত ; পশ্চিম দেশের রাত কুঘাশাৰ রহস্যে অস্পষ্ট।

বিদেশের কোনো জংসন ষ্টেশনে গভীর রাত্রির অবস্থাৰ আলো-আধাৱেৰ
পশ্চাদপটে দ্বিতীয় আৱ একটি বাঙালী ভজলোকেৱ সঙ্গে বন্ধুত্বেৱ ভূমিকাটা
কেমন, সে-আলোচনা এতদিন পৱে আপাতত অনাবশ্যক ! একটু মনে আছে
ওয়েটিং ক্লমে জায়গা না পেয়ে ঠিক দৱজাৰ বাইৱে আলোৱ তীব্ৰতাকে আড়াল
ক'ৱে আমি আমাৱ মালপত্ৰেৰ ওপৱেই ব'সেছিলুম, এবং ঠিক আমাৱ পাশেই
সেই নবলক্ষ বন্ধুটিৱ সঙ্গে আমাৱ প্ৰথম পৱিচয়। ভজলোকেৱ বয়স খুব অল্প
নয়, তবে তাঁৰ চোখে এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্য ছিল, যেটি অস্বাভাৱিক ব'লে বুৰতে
পাৱছিলুম।

তাঁৰ উদ্বেগেৰ মাৰখানে আমাৱ দিকে মুখ ফ্ৰিয়ে সহসা বাঙালী ব'লে
চিনতে পেৱে তিনিই অবশ্য আলাপ কৱলেন ; কত বাজলো বলতে পাৱেন
শ্বার ?

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে বললুম, বারোটা দশ।

মোটে ? ঘড়ি আপনাৱ ঠিক আছে ?

বললুম, মাত্ৰ এক মিনিট ফাস্ট।

তিনি দীৰ্ঘ একটি নিঃখাস ত্যাগ কৱলেন, সেটি চার হাত দূৰ থেকেও
আমাৱ শ্রতিগোচৰ হোলো। তাৱপৰ বললেন ; ক্ষমা কৱবেন, আমি যে
এখানে মাত্ৰ পনেৱো মিনিট অপেক্ষা ক'ৱে আছি, এ আমাৱ মনেই ছিল না।
যেন কতকাল চ'লে গেছে, কত ঘটনা ঘ'টে গেছে। সময়টা মনেৱই একটা
অবস্থা, কি বলুন ?

লোকটিৱ শুল্ক কৰ্তৃত্বেৱে একপ্ৰকাৰ বৈৱাগ্যেৰ আভাস আমাৱ কানে
বাজলো। আমাৱ মনে হোলো, ষ্টেশনেৰ এই আলো-ছায়া আৱ লোক-
কোলাহল পেৱিয়ে ষদি পশ্চিম দেশেৰ ওই ধূলিধূসৰ মাঠে গিয়ে দাঢ়াতে

পারতুম, তবে আজকের পূর্ণিমারাত্রির শৃঙ্খলাকে হয়ত লোকটির বৈরাগ্যের যথার্থ চেহারা দেখা যেতে পারতো।

তাঁর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি, মনে আছে। কেবল মৃছুরে প্রশ্ন করলুম, কতদূরে আপনি যাবেন?

আমি?—ব'লেই ভদ্রলোক চুপ ক'রে গেলেন। প্রশ্নটা বেমানান্তাবে করেছি কি না বুঝতে পারলুম না। কিন্তু এই সামাজিক প্রশ্নের জবাব দিতে যে তাঁর এত দেরি হবে, এও আমার কাছে দুর্বোধ্য। একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি চুপ ক'রে গেলুম।

ভদ্রলোক আবার উদ্ধিষ্ঠ সতর্ক চক্ষে এদিক ওদিক তাকালেন। তাঁরপর বললেন, ওঃ, এখন বারোটা দশ বললেন না? তাহ'লে আর অস্থির হই কেন?—ইঝা, বলা শক্ত, কতদূরে যাবো। মানে, যুরতে বেরিয়েছি কিনা। অনেকটা ভারত প্রদক্ষিণ আর কি। বারোটা দশ বললেন, তাহ'লে ত এখনও আড়াই ঘণ্টা প্রায়!

লোকটির অসংবন্ধ কথা, অনেকটা অসংলগ্নও বটে। কিন্তু আমি চুপ ক'রে গেলুম। স্বমুখে প্রকাও মালপত্রের একটা সুপাকারের পাশ দিয়ে আলোটার একটা ফল। এসে পড়েছিল তাঁর চিবুকে,—বাকি মুখখানা তাঁর ছায়াবৃত। ঠিক স্পষ্ট চেহারাটা দেখা যায় না। কেবল তাঁর অস্থিরতার ফাকে ফাকে চকিত এক একটি মুহূর্তে স্টেশনের প্রতিফলিত আলোয় মুখ চোখ দেখা যাচ্ছিল। লোকটি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান।

এরপর আলাপের কোনো প্রয়োজনই ছিল না কোনো দিক থেকে। কিন্তু স্বজাতির সাম্রিধ্য আর প্রতীক্ষাকালের দৌর্ঘ্যতাই সম্ভবত উভয়ের মধ্যে একটি প্রচলন সেতু রচনা করেছিল। আমার গাড়ী ভোররাত্রের দিকে, এবং তাঁরও গাড়ী আড়াই ঘণ্টা বাদে। স্বতরাং উভয়ের পক্ষে স্টেশনের এই কোলাহল আর শৃঙ্খতার আকাশ যে ক্লান্তিকর, এ অবস্থা দুজনের কাছেই স্পষ্ট।

কথা উঠলো পশ্চিমের আবহাওয়া নিয়ে। সেকথা গড়িয়ে চললো কিছুক্ষণ। তাঁরপর একে একে এলো দিল্লীর দুর্গ, পুরীর সমুদ্র, আসামের জঙ্গল। ভদ্রলোকের অমণের তালিকা কম নয়। রাজপুতনার কোথায় যেন যশলমীরের দুর্গ, আবু পাহাড়ের মন্দির, আর দাক্ষিণাত্যের উপত্যকা—ওসব তাঁর অতি পরিচিত। মধ্যভারতের কোনু অঞ্চলে কয়েক বছর আগে

তিনি রেল কোম্পানীর চাকরীতে স্বত্ত্ব নির্বাণের কাজে গিয়েছিলেন ! সেখানে কোথায় যেন দু'হাজার বছর আগেকার গ্রীকসভ্যতার প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখে এসেছেন । এমনিতরো বল গল্প তিনি নির্বারের মতো ঝরঝরিয়ে ব'লে চললেন ।

মাঝলায় এক সময় প্রশ্ন ক'রে বললুম, বাঙলাদেশে আপনি কতদিন যাননি ?

বাঙলায় ?—তিনি থমকে গেলেন । কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা ক'রে বললেন, ইংয়া, তা প্রায় বছর আটকে হোলো বাঙলা ছেড়েছি । বাঙলায় আর যাবো না ।

হেসে বললুম, বাঙালী হয়ে বাঙলায় যাবেন না ? নিজের দেশ ত বটে ।

মিনিট দুই তিনি নীরব । আমাদের মাথার উপরকার চালা পেরিয়ে প্লাটফর্মের পাশে লাইনের ঠিক উপরে পূর্ণিমার চান্দ দেখা দিয়েছে । চন্দের পাশে রোহিণী তারাটি উজ্জল । শূগলোকে সূক্ষ্ম হিমের একটি চন্দ্রাতপ ভাসছে ।

ভুগলোকটি এতক্ষণ পরে জ্যোৎস্নার দিকে তাকালেন । পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তাঁর মুখে প্রতিফলিত হোলো । সহসা সেইভাবেই আকাশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, বাঙলায় ফিরবো না, কথাটা খুবই কঢ় । কিন্তু ফিরবো না, একথা সত্যি । সেই গান্টা আপনার মুখস্থ আছে ? সেই যে,—‘দিয়েছি সে-স্বর্ণলতায়, আপন হাতে চিতায় তুলে ?’—মনে নেই ?

বললুম, না ।

ভুগলোক সহজ বিখাসের সঙ্গে বললেন, শুনে আপনি আনন্দিত হবেন, কবি তাঁর এই গানটি লিখেছিলেন আমাকে নিয়ে, যানে, আমার স্তুর নাম ছিল স্বর্ণলতা, এবং নিজের হাতেই তাঁকে আমি চিতায় তুলে পোড়াই ।

তাঁর গলার আওয়াজে কোথাও কারুণ্য খুঁজে পেলুম না, শুতরাং সমবেদনা জানানো নির্থক । আমার নির্বিকার মুখের চেহারা দেখে তিনি একবার নিঃশব্দে হাসলেন । তারপর বললেন, কিন্তু মৃত্যুটা তাঁর একটু নতুন ধরণের,—আপনি আমার অপরিচিত, তবুও বলতে আমার আপত্তি নেই ।

স্টেশনের মাথার উপর হেমন্তপূর্ণিমার চন্দ তখন আরো একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে । গভীর রাত্রে স্টেশনের জনতাও কিছু শীর্ণ । পরিআন্ত

একদল কুলী ওপারের প্লাটফরমের প্রাণ্টে ব'সে তুলসীদাসের দোহায় শুরু চড়িয়েছে। দূর থেকে কোথায় শাটিং এজিনের ঘস-ঘস আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

ভুজলোকের মুখে চোখে উঠেগের আর কোন চিহ্ন নেই। তিনি শাস্ত কঠো ব'সে যে-গল্পটি ফাঁদলেন, তা'র আচুপূর্বিক মনে ক'রে বলা কঠিন। কেবল তার সংক্ষিপ্ত চেহারাটা ভূমিকা-বাহল্যবর্জিত হয়ে আজও আমার চোখে ভাসছে। তাঁর গল্পের মোটামুটি ভাষ্টা এই :

তিনি কলকাতার লোক, কলকাতায় লেখাপড়া শিখে মাঝুষ। বাজলা দেশের গ্রাম কেমন তাঁর জানা ছিল না। বিবাহ করেছিলেন যে-মেয়েটিকে, সেও পশ্চিমের এক বড় শহরে মাঝুষ। বিবাহের বছর দুই পরে দম্পতির স্থানাগলো, তাঁরা বাজলার গ্রাম পরিদর্শন করতে বেরোবেন। গল্পে আর কবিতায় গ্রামের আকাশ, বাতাস, নদী, মাঠ,—এ সবের বর্ণনা তাঁদের পড়া ছিল। গ্রাম ছিল স্বপ্নের মতন।

একবার পুজোর সময় হঠাৎ একটা স্বয়েগ জুটে গেল। তাঁদের আফিসের এক মুছরির দেশ ছিল কোন্ এক জেলার কি এক গ্রামে। সেখানে যেতে হলে রেল-স্টেশন থেকে নেমে স্টিমার, তারপর গোকুর গাড়ী, তারপর আবার নৌকো। নৌকো গিয়ে গ্রামের ঘাটে লাগে। একটি আদর্শ পল্লীগ্রাম সন্দেহ নাই। নদীর ধারেই সেই মুছরির খড়ের চালা। নদীতে ভাঙ্গের ঢল নামলে চালাঘরের মেটে দাওয়ার কাছে জল উঠে আসে। দু'একখানা ঘর নদীর ভাঙনে তলিয়েও গেছে। সন্দীক ভুজলোক সেই খড়ের একখানা চালায় গিয়ে উঠলেন।

বেশি নয়, মাত্র সাত দিন ছিলুম—ভুজলোক বলতে লাগলেন, কিন্তু সেই সাত দিন ধ'রে সেই গ্রামের একটি মেয়ে বিভীষিকার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মেয়েটির বয়স বছর বোল-সতেরো। গ্রামের সমাজের কাছে সে ছিল হাসি আর কোতুক। মেয়েটার চেহারার বর্ণনা শুনুন।—কদাকার, কুৎসিত, ট্যারা, ভীষণ মোটা, একটু কুঁজে। গায়ের রং ঘন কালো, একটু খুঁড়িয়ে ইঠিতো। মুখে একটিও কথা বলতো না, কেবল ট্যারা চোখে নির্বাক নিগৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। কী বীভৎস, কী অস্তর্ভেদী তা'র দৃষ্টি। পরিপূর্ণ আহ্য, আর ঘোরন,—কিন্তু কী কুৎসিত। পরশে ছোট একখানা ঘঘলা কাপড়, গলা থেকে কোমর অবধি জড়ানো; গায়ে আমা নেই, মজ্জা

ନିବାରଣେ ଏମନ କିଛୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମେଲେ ନା । ମେଯେଟା ନତୁନ ମାଜୁଷ
ଆମାଦେର ଦେଖେ ଅହୋରାତ୍ର ଥାକେ ଆଶେ ପାଶେ । ଆମାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରାୟଇ ତାକେ
ଦେଖେ ଆତଙ୍କେ ଶିଉରେ ଉଠିଲେ । ତାକେ ଏକା ଦେଖିଲେ ମେଯେଟା ଏମନ କଟିନ-
ଭାବେ ଏଗିଯେ ସେତୋ, ସେଣ ଥୁନ କରବେ ! ଏକଦିନ ଖାବାର ସମୟ ହଠାତ୍ ମେଲେ
ସାମନେ ଦୀଡାତେଇ ସୁଣାଯ ଆମାଦେର ଖାବାର ତ୍ୟାଗ କରତେ ହଲୋ । ଶ୍ରୀ ଏକଦିନ
ବମି କରିଲେନ ତାକେ ଦେଖେ । କୌ ଯେ ଦେଖେ ଆମାଦେର କାହେ ଏମେ ମୁଖ ତୁଲେ,
ବୁଝିଲେ । ଏକଦିନ କିଛୁ ପଯସା ଦିଲେ ଗେଲୁମ, ମୁଖ ଫିରିଯେ ଚ'ଲେ ଗେଲ । ଆମା-
କାପଡ଼ ଦିଲେ ଗେଲୁମ, ସରେ ଦୀଡାଲୋ । ଖାବାର ଦିଲେ ଗେଲୁମ, ମୁଖେର କି ସେଣ
ଏକଟା ଶବ୍ଦ କ'ରେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଲ । ନିଷଳକ ଅଞ୍ଚ୍ଛି ଏକଟି କୁମାରୀ ମେଯେ,
ତା'ର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେର କାରୋ ଆସିଲି ନେଇ ; ତାରେ କୋଥାଓ ଆକର୍ଷଣ ଛିଲ ନା ।

କିନ୍ତୁ ଆମାର ଶ୍ରୀର ପ୍ରତି ତା'ର ଏହି ଭୟାନକ ଅନ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖେ ଆମି
ଭୟ ପେତୁମ । ଚାହନିଟା ଲୋଲୁପ, ଅଗ୍ନିଶାବୀ, ନିରଥକ । ଅମାବଶ୍ୱାର ରାତ୍ରେ
କରାଲୀ ମୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସେମନ ଭୟଭୀଷଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚେଯେ ଥାକେ, ତେମନି । ଆପନି
ଶୁନଲେ ବିଶ୍ଵିତ ହବେନ, ଏକଦିନ ଭୋରରାତ୍ରେ ଉଠିଲେ ଦରଜା ଖୁଲିଲେଇ ଦେଖି, ଗୁଗ୍ଲି
ଦୀଡିଯେ ।—ଇହା, ଗୁଗ୍ଲିଇ ତା'ର ନାମ । କେନ ମେ ସାରାରାତ ଛିଲ ଶୁଧାନେ
ଦୀଡିଯେ, ମହା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ରେଓ ଉତ୍ତର ପେଲୁମ ନା । ସାହସ କ'ରେ ତା'ର ପିଠେ ସମ୍ମହେ
ଏକବାର ହାତ ରାଖିଲୁମ,—କିନ୍ତୁ ଆପନି କାନ୍ଦାମାଥା ମହିବେର ପିଠେ ହାତ ଦିଯେଛେମ
କଥନୋ ? କୌ ମହନ ଠାଙ୍ଗା, ସେଣ କୋନ ସରୀଶ୍ଵରେ ଗା,—ଚିକନ, ପିଛଳ,
ଶୀତଳ । ଆମାର ହାତଥାନା ଆଡ଼ିଷ୍ଟ ଅବଶ ହେଁ ଏଲୋ ।

ବିଜୟା ଦଶମୀର ଗଭୀର ରାତ୍ରେ ଆମରା ଚାଲାଇରେ ଘୁମିଯେ । ସହସା କପାଳେର
କାହେ କାଲୋ ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ଜଞ୍ଜର ନିଃଶାସେ ଆମାର ଶ୍ରୀ ଚିଂକାର କ'ରେ
ଉଠିଲେ । ଧୂର କଷଲେ ଢାକା ସେଣ ବୁଝନ ଏକ ମାଂସପିଣ୍ଡ ଆମାଦେର ଶିଥରେ ।
ହେଟ ହେଁ ପଡ଼େଛେ । କୌ ଉଜ୍ଜଳ ଲୋଲୁପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୋଥ ! ଆମାଦେର
ଚିଂକାରେ ସବାଇ ଛୁଟି ଏଲୋ,—କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ଜାଲାର ଆଗେଇ ଗୁଗ୍ଲି ସେ କୋଥା
ହିସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଲୋ, ଦେଖିଲେ ପେଲୁମ ନା । ପେଲୁମ ଭୋର ବେଳାୟ । ଆମାଦେର
ଖାଟେର ତଳାୟ ମେ ଗା ଢାକା ଦିଯେ ଲୁକିଯେଛିଲ, ଭୋରେର ଦିକେ ଦରଜାର ଝାପ
ତୁଲେ ବେରିଯେ ଚ'ଲେ ଗେଲ ।

ସବାଇ ତାକେ ଦେଖେ କୌତୁକ ବୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ଶ୍ରୀର ପ୍ରତି ତାର ଏହି
ସର୍ବନାଶା ଆକର୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ରେ ଆମି ସେଣ ଆତକିତ ହେଁ ଉଠିଲୁମ । ମୁହରିର
ଅତ ଆତିଥେସତା ଆର ସେବାଷ୍ଟେର ମଧ୍ୟେ ଭାବତୁମ, କବେ ପାଲାବୋ । ଯିନେ

হোতো, মেয়েটা যেন তা'র কঠিন কদাকার আঙুলগুলো দিয়ে বগুজত্তর যতো আমাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে থেতে চায়। আমার স্ত্রী দিন হই থেকে যেন কেমন অস্থিবোধ করছিলেন। হঠাতে পূর্ণিমার দিন তিনি কেবলে আমার হাত ধ'রে বললেন, আজকেই ফিরে চলো, তোমার পায়ে পড়ি। আর একদিনো না, একদণ্ড নয়।

জামুকুল গাছের তলায় সঞ্চার সময় কি যেন একটা ছায়া দেখে তিনি কাপছিলেন। তাঁর অধীর কাঙ্গা দেখে আমি হতবাক। বুবলুম, গত কয়েকদিন থেকে তিনি যেন অসহ যন্ত্রণা সহ করছিলেন।

বেশ মনে পড়ছে কোজাগরী পূর্ণিমার আশ্চর্য অপরূপ রাত্রি। নদীর জলে-জলে ঝুপালি আগুন জলছে। কুলে কুলে ভরা কুটিল উজ্জল জল। ইয়া, এমনি স্বন্দর রাত। বাজলার গ্রাম দেখেছেন কখনো জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে? ঝুপালি জলের আকষ্ঠ গদগদ কাকলী শুনেছেন কখনো? কখনো দেখেছেন, আকাশ নেমে এসেছে নদীর জল-জ্যোৎস্নায় অবগাহন করুতে? সেদিনকার কোজাগরী ছিল সত্যই আশ্চর্য।

আমাদের বিদায় দেবার জন্য নদীর ধারে গ্রামের অনেকেই এসে দাঙ্গিয়েছিল। জিনিসপত্র নৌকোয় উঠলো। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত প্রাণ ভ'রে পান করব আমি আর আমার স্ত্রী,—মনে এই আনন্দ অবশ্যই ছিল। কিন্তু গ্রামের অতগুলি নর-নারীর মাঝখানে কুকুর বীভৎসা গুগ্লিকে না দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম বৈ কি। স্নেহ তাকে করিনি, ঘৃণাও ঠিক তাকে করিনি, তবে ভয় পেয়েছি বৈ কি তাকে দেখে। বেশ বুবলুম, প্রকৃতির এই স্বন্দর পরিবেশের মাঝখানে, এই দিগন্তব্যাপী কবিতার পটভূমিক্ষয় তাকে আসতে দেওয়া হয়নি, কেউ তাকে অগ্রজ সরিয়ে দিয়েছে। এবং আপনিও শুনে আশ্চর্য হবেন, একেবারে চ'লে যাবার আগে আমার স্ত্রী পলকের জন্য গুগ্লিকে দেখবেন, এই ছিল তাঁর আশা। অকে লোলুপতার কি বাস্তবিকই কোনো চৌমুক-শক্তি আছে, আপনি মনে করেন?

বললাম, তারপর?

তিনি বললেন, নৌকা ছাড়ার অস্তিম মুহূর্তেও গুগ্লি এসে পৌছতে পারলো না। আপনি হাসবেন না, আমি যেন কেমন একটা বিজ্ঞেদের ঘন বেদন। অস্তুত করছিলুম। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে সকলের কাছে বিদায়

নিলুম বটে, কিন্তু কিছু স্মেহ যেন রেখে গেলুম ওই জামকল-তলায়, ওই কাগজী লেবুর ডালের ছায়ায়, ওই গাব গাছের পাতায়-পাতায়। আমাদের নৌকো খরশ্বোতে নেমে ছুটে চললো দক্ষিণ পথের দিকে। গ্রাম ছাড়িয়ে চ'লে গেল।

আশ্বিনের নদীর ভরা জলে মোটা মোটা সাপ জলের ভিতর থেকে উঠে আছড়ে পড়ছিল। মাঝে মাঝে শুন্ধক ভেসে উঠে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। ওরাও যেন কোজাগরী জ্যোৎস্নার তৃষ্ণায় আকাশকে এক একবার লেহন ক'রে নিতে চায়। আরো কতরকম জানোয়ার থাকে জলে,—আমার জী সেই খরশ্বোতে 'ভাসা' দুরস্ত নৌকার ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন।

নৌকার দুই কোণে মাঝি আর দাঢ়ি বসেছিল। সহসা অর্কিতভাবে আমাদের নৌকো একবার দুলে উঠলো। চেয়ে দেখলুম, শ্বেতের সেই অন্তগৃঢ় কল-কোলাহলের ভিতর থেকে হঠাতে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার উঠে তার থাবা তুলে নৌকোর পাড় আঁকড়ে ধরলো। মুহূর্তে কী ঘটলো, ঠিক অনুধাবন করবার আগেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলুম, গুগলি! আপনি আশ্র্য হচ্ছেন, একটি গ্রাম-কুমারীর দুঃসাহস দেখে। নদীর তলা দিয়ে ডুবে-ডুবে সে আমাদের অনুসরণ করেছে, সতি কথা। কিন্তু সেই ঘটনা আমার জীবনে অভিনব। দেখলুম তার জলবরা এলোচুল বেয়ে নামছে কোজাগরী। পরণে তা'র কিছুই নেই। পিছিল সর্বাঙ্গ বেয়ে নামছে নদীর ধারা। চিক্কন কালো আর মশগ তা'র সর্বাঙ্গ। কিন্তু সেই জ্যোৎস্নালোকে কদাকারা যেন অপুর্ণ হয়ে উঠলো। আমাদের চোখে। চেয়ে দেখলুম, সেই উলঙ্গ বাঘিনীর জলবরা মুখে এক নধর মধুর হাসি,—যেন বাঙ্গলার গঙ্গামের আত্মার অপুর্ণ মূর্তি। তা'র স্বভাব, প্রকৃতি, তা'র কুরুপ ঘোবন, তা'র বিকলাঙ্গের লজ্জা, তা'র নিরাবরণ বৌভৎস মাংসস্তুপ, সমস্তটাই যেন ভরা জ্যোৎস্নার অবগাহনে অপুর্ণ সৌন্দর্যে স্বন্দর হয়ে উঠলো। সেই দৃশ্য জীবনে কোনদিন ভুলবো না, শ্বার।

উদ্গীব হ'য়ে বললাম, তারপর?

আমাদের আত্মস্হ হ'তে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। তারপর সকলে কী যে নিষ্ঠুর হয়ে উঠলুম, তা'র কথা বলতে গেলে আজো গাশিউরে উঠে। আমরা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলুম, কারণ, নৌকো উল্টে গেলে আমরা দুঃখনে নদীতে তলিয়ে যেতুম। সাতার ত জানতুম না! মাঝি আর দাঢ়ি চকিতে বিপদ উপলব্ধি ক'রে ভৈষণ কঢ়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আজো বুঝতে পারিনি,

মেঘেটা কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছিল, কীই বা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমা তাকে কেউ করলে না। দাঢ়ি তার দাঢ়ি তুলে নিয়ে সহসা নির্দয়ভাবে গুগ্লির মাথার উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত করলো। কী কঠিন নিষ্ঠুরতা, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। গুগ্লি আমার স্তুর হাতখানা আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু পারলো না। অবশ হয়ে জলের মধ্যে প'ড়ে গেল। বেশ জানি, সে আঘাতে বেছুইন দস্ত্যর মাথাও ফেটে যায়! সামান্য একটি মেয়ে কি বাঁচে? অসম্ভব! সমগ্র আকাশ প্লাবিত কোজাগরী সেই রাত্রে আমাদের চোখে রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠলো—স্পষ্টিত হ'য়ে কেবল ব'সে রাইলুম। পিছন দিকে নদীর প্রবাহ যতদূর দেখা যায়, গুগ্লিকে আর মাথা তুলতে দেখলুম না!

কল্কাতায় ফিরে স্তুর শয্যা নিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কেমন যেন সবুজের রং ধরেছিল, যেন গ্রামের ছায়া নামছে তাঁর দেহে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর কী অস্থিৎ! গুগ্লী তা'র অস্তিম পলকে আমার স্তুর হাতখানা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, সেজন্য স্তুর হাতে পাওয়া গিয়েছিল সামান্য একটু নথের আঁচড়। সেইটুকু আঁচড়ে তাঁর শরীর বিষাক্ত হয়েছিল, কল্কাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তারও একথা স্বীকার করেননি। কিন্তু তবু নীল হয়ে এলো স্তুর দেহ। একজন চিকিৎসক শেষকালে বলেছিলেন, আয়ু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। এক প্রকার চিক্ষা আছে, সে বস্তু মস্তিষ্ককে অধিকার করলে নাকি বিশেষ একক্রম বিষাক্ত লালাশ্বাব হ'য়ে রক্তকর্ণিকাগুলিকে অধিকার করে। তার ফলে শরীরের ভকে লাল, নীল, সবুজ, ধূসর—প্রভৃতি বর্ণের স্ফটি হয়। পাঞ্চাঙ্গ দেশের আদিম চিকিৎসাশাস্ত্রে নাকি এই জাতীয় রোগের একটা উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল।

এবং আপনি শুনে আশ্র্য হবেন—মৃত্যুর পরে আমার স্তুর চেহারা অনেকটা গুগ্লির মত হয়ে উঠেছিল। হয়ত সূক্ষ্ম কোন যোগাযোগ, হয়ত আমার চোখে ভুল, হয়ত বা স্ফটির নিগৃহ কোনো—

* * * *

মোরাদাবাদ টেশনে গভীর রাত্রে কখন একখানা ট্রেন এসে দাঢ়িয়েছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। ভজলোকের কথার প্রতি কান রেখে আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলুম

গাড়ীখানা ইইসল দিয়ে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইন্টার ক্লাসের দিকে

আমার চোখ পড়লো। ভজ্জলোক ইতিমধ্যে ক্রত গিয়ে গাড়ীতে উঠেছেন, বুরতে পারিনি। কিন্তু তাঁর পাশে একজন কুকুরা জ্ঞালোককে দেখে হঠাৎ বিস্মিত হলুম। এই জ্ঞালোকটিই পরের গাড়ীতে আসবে, এই কারণেই সন্তুষতঃ তাঁর উদ্বেগ ছিল।

চলন্ত গাড়ী থেকে হাস্তমুখে তিনি আমাকে নমস্কার জানালেন। আমি চেয়েছিলুম তাঁর সঙ্গীর দিকে। নারীটি কিছু বয়স্তা,—কিন্তু এমন কুকুরা সহসা চোখে পড়ে না। স্তুলাঙ্গ মাংসল, ছোট ছেট চোখ,—মুখখানা যেন মনে ভয় আনে। সন্তুষ ঘরের মেয়ে নয়, বেশ বোঝা যায়!

অপ্পায়

বছৰ আঢ়েক হোলো দিল্লীতে আমি চাকৱী কৱছি। কলকাতাৰ সঙ্গে
সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছৰে কলকাতায় এক আধিবার আসি, ঘুৰে
বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবাৰ ফিৰে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আৱ আসা
হয়ে উঠে না।

বছৰ তিনেক আগে ফরিদপুৰ থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—
ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমাৰ কপাল
ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছুদিন খণ্ডৰবাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও
আৱ থাকা চললো না। তোমাৰ ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে
গিয়েছিলেন, তাও খৱচ হয়ে গেল। আৱ দিন চলে না। তুমি আমাৰ
মায়াতো ভাই হলেও তোমাকে চিৱদিন সহোদৱ দাদাৰ মতন দেখে এসেছি।
ছেলেটাকে যেমন ক'ৱে হোক মাঝুষ ক'ৱে তুলতে না পাৱলে আমাৰ আৱ
দাড়াবাৰ ঠাই কোথাও থাকবে না। এদিকে ঘুৰেৰ জন্য সব জিনিসেৱ দাম
ভীৰণ বেড়ে গেছে। ছুটু পাস ক'ৱে চাকৱি খুঁজছে, এখনও কোথাও কিছু
স্মৃবিধে হয়নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলেৱ মাইনে দিতে না পাৱায় হাকুৱ
পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবাৰ কোম্পানীৱ কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে
গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'ৱে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে
অনেকটা সাহায্য হতে পাৱে। ইতি—

দিল্লীতে আমাৰ এই চাকৱিৱ খোজ প্ৰথম পিসেমশাই আমাকে দেন,
স্বতৰাং শোভনাৰ চিঠি পেয়ে স্বৰ্গত পিসেমশায়েৱ প্ৰতি আমাৰ সেই আন্তৱিক
কুতজ্জতটা হৃদয়াবেগেৱ সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি
টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোৱ ছেলে ষতদিন না
উপাৰ্জনক্ষম হয়, ততদিন প্ৰতি মাসে আমি তোৱ নামে পনেৱো টাকা
পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, ছুটু, হাকু—সকলেৱ সঙ্গেই আমাৰ
চিঠিপত্ৰে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পূজোৱ সময় এবং নতুন বছৰেৱ আৱলেও
আমি কিছু কিছু টাকা তাদেৱ দিতুম। তিন বছৰ এইভাৱেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঙ্গিয়েছে, অথবা শোভনারা কিভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পূর্বানু-পুর্ণ খোজ-খবর আমি 'নিইনি, দরকারও হয়নি। যাবধানে বোমার ভয়ে যথন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিষ-পত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটিছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিনি বছর পরে হঠাতে কলকাতায় ধাবার স্থায়োগ হোলো। এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা স্থায়োগ। সপ্তাহ তিনিকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন ছয়কের মধ্যে দেখাশোনা ক'রে ফিরবো। একটা কৌতুহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে করকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈকি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙালীপ্রধান ও আর একদিকে চলেছে যুক্ত সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর

বাবা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বাস্ত। দেশের সবাই
বলছে, দুর্ভিক্ষ ; গবর্ণমেন্ট বলেছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খান্ডাভাব। ছটোর
মধ্যে তফাং কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে
আমার কর্তব্যস্থাপনে গাভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনোদিকে মন
দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে টুমুর
সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাত দেখা হয়ে যেতেই কথাটা
আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল
আর বাঁ-হাতে ডোটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল।
দেখা হতেই সে থমকে দাঢ়ালো। বললুম, কিরে টুমু ?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার
অবসন্ন চোখ ছটো তুলে সে শান্তকর্ত্ত্বে বললে, কবে এলে ছোড়দা ?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে ?

খবর ?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি
মৃত্যুপথ্যাত্মী ঝঁঝ গাভীর মতো ছটো নিরীহ তার চোখ ; যেন এই শতাব্দীর
অপমানের ভাবে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি ?
কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে ? পঁচিশ বছর বয়স
হ্যনি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি ?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুমু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে
ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি
বুঝি ?

টুমু বললে, না, আফিস থেকে পাই কন্ট্রোলের দামে। চারজন লোক,
কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেবের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রাম্বা হবে।
তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাঞ্চ। বেশ আছো—আচ্ছা, চলি, যুক্ত
থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস ? তাৰা কি ফরিদপুরে নেই ?

না—ব'লে একটু থেমে টুমু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে
গুনতে চেয়ে না ছোড়দা !

কেন রে ? তাৰা থাকে কোথায় ?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ. নম্বরে। ইংসার্কেশন কি একবার। আসি তা হ'লে—এই ব'লে টুছু আবার চললো নির্বোধ ও তারবাহী পদ্ধতি মতো ক্লাস্ট পায়ে।

টুছুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্থরে যেরকম নিঙ্গৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কঢ়ি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, মুটু হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্ভিক্ষ, চাকরি দুর্ভিক্ষ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো। এই সম্পত্তি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুক্ত সরবরাহের কন্ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুমাখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত মুটুর মতো বালকও এই যুক্তকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুক্তে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেবো কি নেবো না এই তোলাপাড়ায় আর কাঙ্গের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব আনালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিঁকছিল না। আমার হোটেলের নৌচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কাম্মা শুনে বিনিস্ত দৃঃস্থলে এই ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গম্ভুক্ত কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্ম। একটা স্বয়েগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হলো না। মনে করেছিলুম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঢ়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভূবিমালের আড়ৎ। নৌচেকার উঠোনে গিয়ে দাঢ়িয়ে দেখি, নৌচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোগনড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে

বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি—চুম্বুর দেওয়া এই নম্বরটা ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞেস-পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গঙ্গোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে ঘাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাত ডাকলুম, মিহু?

মিহু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস্ আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখ? এ যে একবারে গোলকধাঁধাঁ! আয় নেমে আয়।

মিহু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! ব'লে তা'র হাত ধরলুম,—চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বল্ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একবারে ভুলেছিস্?

আমাকে দেখে উপর তলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিহুর ছোট হাতখানা অস্তিত্বে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তা'র ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিহু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে ঘান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তা'র কেমন ঘেন বন্ধ উদ্ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিহু—পরণে একখানা পাঁচলা সন্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের ক্লফ শীর্ণতা—কিন্তু এরই মধ্যে তাকণ্যের চিহ্ন এসেছে তা'র সর্বাঙ্গে। তা'র অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিশ্ব চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে ?—ভিতর থেকে নারীকষ্টে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্বীলোক
এসে দাঢ়ালো। বললে, ক'কে চান् ?

অপরিচিত স্বীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ,
পরণে নীল সাড়ি, আর হাতে কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্বীলোকের সংখ্যা
বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে ?—এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্বীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হাঙু।
হাসিমুখে বললুম, কি হাঙু, চিনতে পারিস্ ? তোর মা কোথায় ?

সে আমাকে চিনলো। কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আস্তন।
মা রঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায় ?

দিদি এখনি আসবে, বাইরে গেছে। আস্তন না আপনি ?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ীর বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি।
দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর-দুয়ারের কেমন ইতর
চেহারা দাঢ়ায়, এর আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামণিন
দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধি নাকে এলো,—এ-পাশে নর্দমা ও-পাশে
কুৎসিত কলতলা। একধারে ঝাঁটা, ভাঙা ইঁড়ি, কয়লা আর পোড়া
কাঠকুটোর ভিড় ! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে
একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুকাচারিণী মহিলারা
কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে
অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে
উঠে এলো।

রাম্ভার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিশ্বাসে দেখলাম,
তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন।
আমাকে দেখে বললেন, একি, মণিনাক যে ? কবে এলো ?

কিন্তু আমি নিমেবের জন্ত স্তুতি হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া
দেখে। পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্বান আহিক পূজা গৃহাঞ্চান,
দান-ধ্যান—এইসব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার
আসনে দেখে এসেছি। সংস্কার গুরুদের থান পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার
পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিনি

প্রবোধ সান্তালের গল্প-সংক্ষিপ্ত

বছরে ঠাঁর একি পরিষর্তন ! আমিষ রামাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে
চা খাচ্ছেন তিনি !

বললুম, পিসিমা প্রণাম করবো । পা ছুঁতে দেবেন ?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা কমাস হোলো
এসেছি, তোমাকে থবর দেওয়া হয়নি বটে । আর বাবা, আজকাল কে ক'র
থবর রাখে বলো । চারিদিকে হাহাকার উঠেছে !

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা
আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম...কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের
কোন খোজথবর নেই ।

থবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ !

পিসিমার কঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্ত আর অবহেলায় ভরা । একদিন
আমি ঠাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে
অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে থুশী হননি, এ ঠাঁর মুখ চোখ দেখেই বুৰতে
পারি ।

ইয়াগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্বীলোকটি হাসিমুখে
চাতালের ধারে এসে দাঢ়ালো । পিসিমা মুখ তুললেন । সে পুনরায় বললে,
তুমি বাজারে যাবে গা ? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্কা-তপ্সে
মাছ এসেছে—একেবারে ধড়ফড় করছে !

তা'র লালাসিঙ্গ বসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখধানা কেমন যেন
বিবর্ণ হয়ে এলো । তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা ।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে উৎস্থক্য না দেখে ঝানমুখে বিনোদবালা
সেখান থেকে স'রে গেল । পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি
আছে, নলিনাক্ষ ?

বিশেষ কিছু না !—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের
এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা ।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট
কিনা—বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন । আমার
পাকার কথায় ঠাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা
গেল না ।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা ?

সে আসছে এখনি, বোধ হয় ও-বাড়ি গেছে।

ইবৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয় ?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই ? তবে তেলটা, ছন্টা, মধ্যে মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায় ? কত বড়টি হয়েছে ?

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে ? শোভনা পারবে থাকতে ?

তা পারবে না কেন বলো ? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি ? নিজেদেরই ইঁড়ি চড়ে না কতদিন ! অস্থ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বার-চোদ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ করবো, নলিনাক্ষ ? ভিক্ষে কি করিনি ? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি!—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ !

অনেকটা যেন আর্তকষ্টে বললুম, পিসিমা, টুমুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। টুমুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঢ়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঢ়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীমু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঢ়ালো। বললে, মা, মা শুনছ ? এই নাও একটা আঁধুলি...হরিশবাবু দিল—

মীমুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুখালু। মুখখানা বাঙা, গলার আওয়াজটা উজ্জেবনায় কাপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে

বললে, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট
আনা দিতে পারে ।

পিসিমা অলুক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বাক্সার দিয়ে
বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে । বেঁটিয়ে মুখ ভেঙে
দেবো তোর ।

মীমু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল । মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ
থেকে স'রে গিয়ে সে অমুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমই ত' বলেছিলে !

হাক ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস, মীমু ? এখন
তোকে কে যেতে বলেছিল ? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না ?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড় হঠাত এসে পড়েছ, বাবা ।
এখন ভারি আতাস্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে ।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার উপর বসলুম ।
গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারংবার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত
স্বন্দর্পটা আমি কিছুতেই কোঝাতে পারবো না । আমি এই পরিবারে
মাঝুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম ।
অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহৃত একটা
লোক । যাই আমার পিসিমা ছিল, তাঁর ছিল, যাদের চিরদিন আপনার
জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের
সহবাসী, এরা সেই আগেকার সন্ধান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি !

মনে ছিল না জানালাটা খোলা । বৌবাজারের পথের একটা অংশ
এখান থেকে চোখে পড়ে । সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম,
বাস, মোটর, গুরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে
শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব । জঙ্গালের
বাল্কি ঘিরে ব'লে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কক্ষাল গোঁড়াচ্ছে
মৃত্যুর আশায়, জ্বীলোকদের অনাহৃত মাতৃবক্ষ অস্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের
মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে ।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হাক
আর মীমুর কানা—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাত প্রহার
করতে আরম্ভ করেছেন । উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো
অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্ম দিকে যেসব

বড়বেঞ্জের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, 'ওরা সেই ফাদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে আবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকঠির সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা ঝাঁকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস্ তোরা শুনি?

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জগ্নেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক শুদ্ধিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস্ কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিশ্বয়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যার বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধহয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঢ়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একথানা সঙ্গ পাড় ধূতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস্!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারাৰ টাকা নেওয়া বন্ধ কৱলি কেন রে ?
একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলেৰ জগ্নেই নিতুম তোমাৰ কাছে
হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমাৰ নয়, তাই নেওয়া বন্ধ
কৱেছি !

প্ৰশ্ন কৱলুম, তোদেৱ চলছে কেমন ক'ৰে ?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সে কথা
শুনতে চাও কেন ছোড়দা ?

চুপ ক'ৰে গেলুম। একথা শোনবাৰ অধিকাৰ আমাৰ নেই, খুঁচিয়ে
জানবাৰও দৱকাৰ নেই। বললুম, হুটু কোথায় ?

সে লোহাৰ কাৱথানায় চাকৱি কৱে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে
সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবাৰ নেশা কৱতে শিখেছে,
সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, হুটু অমন চমৎকাৰ ছেলে, সে এমন হয়েছে ? হাঙুৱ
পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি কৱে এখন ?

শোভনা নত মুখে বললে, এই বাস্তাৱ মোড়ে চায়েৰ দোকানে হাঙুৱ
কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবাৰ চুৱি ঘাওঁয়ায় ওৱ কাজ
গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবাৱ প্ৰশ্নটা এসে দাঢ়ালো শোভনাৰ ওপৱ। কিন্তু আমি
আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুৱিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপাৰ আমাৰ
ভালো লাগেনি, শোভা। মীহুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে
যখন তখন বাইৱে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়ীটায় নানা রকম লোক
থাকে, বুঝিস্ত।

বাইৱে জুতোৱ মস্মস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা
জামাকাপড় পৱা একটি লোক এক ঠোঁড়া খাবাৰ হাতে নিয়ে ভিতৱ্বে এল।
মাথায় অল্প টাক, খোচা খোচা দাঢ়ি-গেঁফ—লোকটিৱ বয়স বেশী নয়।
চাতালেৱ ওপৱ এসে দাঢ়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে ? এক
ঘটি জল দাও আমাৰ ঘৰে। আৱে কপাল, খাবাৱেৱ ঠোঁড়া হাতে দেখলে
আৱ বুক্ষে নেই। নেড়ি কুকুৱেৱ মতন পেছনে পেছনে আসে মেঘে-পুকুৰ-
গুলো কেঁদে কেঁদে। হো মেৱেই নেঘ বুঝি হাত খেকে। পচা আমেৱ
খোসা নৰ্দমা থেকে তুলে চুবছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলেৱ

ষটি, দাও। এ-ছর্তিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি ছুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল ইঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কানা,—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোথেকে—গেরস্তরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খনা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি। —বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাস্ত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে শোভন। বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন ইঙ্গুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্তু তা'র জন্যে আস্থাহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সাজ্জনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো কুকু ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখনা শির ওঠা, বক্তৃহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই ছর্তিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেথে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মজ্ঞাহিতার অগ্নিশূলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্ষলকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সাজ্জনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতুহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধৰংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টি'কে থাকতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক নিজেদের মান-সন্তুষ্টি বাঁচিয়ে—

মান-সন্তুষ্টি?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সন্তুষ্টি, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে

সবাই থাক হয়ে গেলুম ! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড় ? কোন্‌
মিথ্যেবাদী রাটিঘেছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না ? ছোড়দা, তুমি
কি বলতে চাও, যদি তিল তিল ক'রে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জালায়
ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আঘাতহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী
বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই
মান-সন্ত্রম বাঁচবে ? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে
নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই
কি মান-সন্ত্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো ? যাও, খোজ নাও,
ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরহ বাড়ীতে ঢুকে দেখে
এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জলে-পুড়ে গেল ঢুটি ভাতের জন্যে, কত
দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে
একথানি কাপড়ের জন্যে। অঙ্ককারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর
জড়িয়ে কত মেঘে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো ? বাসি আমানি ছুন গুলে
খেয়ে কত লাজুক মেঘে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ ? মান-সন্ত্রম ! মান-সন্ত্রম
নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা ?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই
মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু
কন্দোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা
তার কোন স্বিধে পাও না ?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তা'র
গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার ঝঝ হাসি বমির
বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে
উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত,
নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতুহল স্তুক হয়ে গেল।

পিপিমাৰ কাছে মার খেয়ে মৌমু ও হাঙ্ক এসে জানালার ধারে দাঢ়িয়ে
ডুকৱে ডুকৱে কাদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে,
কেন, কাদছিস কেন, শুনি ? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঢ়িয়েছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে
বললে, দিদি, মাসি মেরেছে শুদ্ধের। ও বাড়ীৰ হরিশবাবুৱা কাছ থেকে মৌমু
পঞ্চসা এনেছিল কিনা—হলু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঢ়িয়ে ঝক্কার দিয়ে বললে, মা ? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি ?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না ? কলকের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলক ঘোচাতে তুমি পারবে ?

পিসিমা চৌৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লস্বা লস্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জালা তোর কিসের লা ? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি ? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ ? পেটের ছেলেমেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে ?

শোভনা গর্জন ক'রে বললে, পেটের মেঘেরা যে তোমার পেটে অন্ধ জোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার ? মেরে মেরে মিহুটাৰ গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আকেল ? একেই ত' ওৱ ওই চেহারা, এৱ পৱ ঘৱ খৱচ চলবে কোথেকে ? লজ্জা নেই তোমার ?

তবে আমি হাটে ইঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই ব'লে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকঠো বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ ক'রে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল ? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই ?

অধিকতর উচ্চকঠো শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি ? মাস্টাৱকে কে এনে চুকিয়েছিল এই বাসায় ? হরিশ-যোগেনদেৱ কাছে কে পাঠিয়েছিল মীহুকে ? আমাকে কেৱাণীবাগানেৱ বাসায় কে পৌছে দিয়ে এসেছিল ? উত্তৱ দাও ? জবাব দাও ? হোটেলেৱ পাউরুটি আৱ হাড়েৱ টুকুৱো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হাকুকে ? শুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কাৱ জন্তে ?

মুখ সামলে কথা বলিসৃ, শোভা ?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাৰখানে এসে দাঢ়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মাৰমুখী মা ও মেয়েৱ এই অস্তুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আৱ শ্বিৰ থাকতে পাৱলুম না। উঠে বাইৱে এসে দাঢ়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্বান কৱতে যান। শোভা, তুই চুপ কৰ, ভাই। এৱকম অবস্থাৱ জন্তে কা'ৱ দোষ দিবি বল ? তোৱ, আমাৱ, পিসিমাৱ, হাক-মিহুৱ,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাষ্টাৱমশাই, হরিশেৱ দলেৱও কোন দোষ নেই ! কিন্তু

অপরাধ ঘানের, তা'রা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা ! শাকগে আমি
এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো !

শোভনা কেইনে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়ো !

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার !

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোল না বাবা,
নলিনাক্ষ ! কিছু মনে ক'রো না !

বিনোদবালা বললে, চলো, তের হয়েছে ! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরি হও
দিকি ? গলাবাজী করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার
চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্রলোকের ঘর, তাহলে
এমন ঝক্কমারি কাজে হাত দিতুম না !

অপমানিত মুখে পলকের জগ্নি বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি
ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর স্বড়জলোকের কদর্য-
কুলুষ কুকুশাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দীড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত-জোড়া
মূমূর্স আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকলুণ ঔদাসিণ্ণে এদের
এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অঙ্গচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত
উপবাসীর মর্মাণ্ডিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিম্নপায় ছৰ্ণীতির গুহার মধ্যে
ব'সে উৎপীড়িত মানবাঙ্গা অবমাননার অন্ত লেহন করছে, সেই সংহত
বিভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে ? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর
শাকসজ্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকম্বার মধ্যে আচারশীলা মাতৃকপিণী পিসিমা, লাজুক
একটি সত্ত-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগী শোভনা, চাপার কলির মতন
নিম্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হাঙ, ছুট, মীছু—এরা কি সেই তা'রা ? কেন একটি
স্তুতি পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নৌতিভূষ্ট হোলো ? কেন তাদের
মৃত্যুর আগে তাদের মহুয়ান্তের অপমৃত্যু ঘটলো এমন ক'রে ? কোন্ দয়াহীন
দশ্যতা এর জগ্নে দায়ী ?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে ধরতে পারি
বৈকি। অস্তত দিল্লী ঘাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে
যেতে পারিনে। স্বতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে শুরে-শুরে কিছু কিছু

খান্দসমগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশশত বেশী দামে চাল এবং পাঁচশত বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সম্ভ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত আবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্তায় কোনো গোরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খান্দসমগ্রীগুলোকে স্বৃণ্য মনে হচ্ছে। খান্দ আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে ব'লেই হয়ত খান্দের প্রতি এত স্বৃণ্য এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভজ্জীবনের নৌচের তলাকার লুকানো আশ্রয়ে, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না—আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচুত্যতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সকল আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনিকের মত খান্দসজ্জার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার উপাশ থেকে শোনা গেল, নারী-কঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নৌচের তলাটা নিঃসাড়—মৃত্যুপুরৌর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মীরু? হাঙ্ক?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মীরু, ও মীরু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মীরু ও-বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়বা। দৱজাটা খোল দেবি?

ছোড়দা ?—শোভনা তৎক্ষণাত দৱজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছ
এসে ব'সে পড়লো। অঙ্গসজ্জল কঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জালায় আমরা
নৱকৃতে নেমে এসেছি। তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি
চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললুম। বললুম, কাদিসনে, চুপ কর।
তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি ক'রে মরতে বসেছে।
কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি ক'রেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে
হবে, শোভা। শোন্, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে
তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ।

চাল-ডাল এনেছ ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে
উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাত্পন্নির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ
উল্লাস তার কঠস্বরের মধ্যে কাপতে লাগলো। রুক্ষখাসে সে বললে, তুমি
বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা ! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ
করতে পারবো না !—এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার
চিরদিনকার আদরের ভগী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটিলি রয়েছে, ওটা
আগে তুলে রাখ, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে
থাত্তসামগ্রীর কাছে দাঢ়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির
সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো।
বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে
সাড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল ? দোকান থেকে চাল-ডাল
এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার
আগে আমাদের বুঝি থাবার কিছু ছিল না ! মনে আছে ছোড়দা ?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে !

শোভনা করুণকঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে
শেষ হবে ? সবাই ষে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস
করতে হবে না ?

তার আর্তকষ্ঠ শুনে আমি চুপ ক'রে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকুর
হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায়

বললে, ফরিদপুরের সেই মন্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা ? ভাবোত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা টেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভাবে ভাবে তারা ঘরে তুলে আনছে ! মনে পড়ে ?

শোভনার স্বপ্নময় ঢুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না । কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি ।

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা ? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো । সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুধে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত ? নবাঞ্জির পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কাম্মায় ? বলতে পারো, তুমি ?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অঙ্ককারের দিকে ফিরে তাকালো । তারপর কম্পিত অধীরকষ্টে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক ব্রাত হয়ে গেছে । এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে' ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে । এবার তুমি যাও ছোড়দা !

এগুলো তুলে রাখ আগে সবাই মিলে ?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুণে গুণে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা । আলো ধরছি....তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না....লক্ষ্মীটি ছোড়দা...

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্বাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোচ্চ খেয়ে ভিতরে এসে দাঢ়ালো । একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি । চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার ।

লোকটার পরণে একটা ধাকি সাট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গম । আমি বললুম, কে তুমি ?

আমি কারখানার ভূত, স্তার ।—এই ব'লে হঠাত শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে ।

কথা কিছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছড়িয়ে নিল।

বটে!—লোকটি ভুঁক বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

কন্দখাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগলি!

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগ্গির? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা, দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই?.....দাঢ়াও, আজ খুন করবো—বঁটখানা.....

বলতে বলতে ছুটে সে বেঙ্গলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেঘেটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন? আসলে মেঘেটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারী খেয়ালী! তবে কি জানেন শ্বার, আমরা হচ্ছি ‘এসেন্সিয়াল্ সার্ভিসের’ লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্ষড় নিয়ে কাজ করি—মেঘমাঝুরের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে! এসব জানে ওই ‘আই-ই’ মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঙ্ডামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হাঙ্গ ছুটে এলো। লোকটি শাস্তকঠো বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা স্থানে পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুরুষায় নিকটবেগ কঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাৰ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘূম হবে না, বলে রাখলুম।—আচ্ছা, বেশ, কাল না হয় আড়াই সেৱ চাল'ই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোম ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুল-মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কান্দতে
লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষসে যুদ্ধ থামবে, তুমি
ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর
আর কতদিন বাকি ?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৎপিণ্ডি থেকে আবার
রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মাঝুব
থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা
পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি....

শোভনা কাঁচুক, সবাই কাঁচুক। আমি অসাড় ও অঙ্কের মতো
হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম।
অঙ্ককারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অঙ্ককার, অনন্ত
অঙ্ককার। কেবল মনে হলো, অঙ্কারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিষ্ঠেজ
হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে
পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধনি কান পেতে শুনছে !

শেষ

